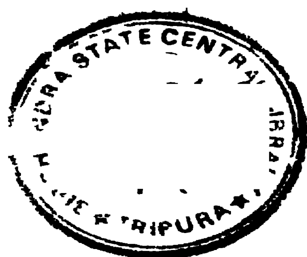
दाह

দাহ

সমরেশ বসু



দে'জ পাবলিশিং। কলিকাতা ৭০০০৭৩

DAHA
A Bengali Novel by SAMARESH BASU
Published by Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street Calcutta 700 073

প্রচ্ছদ : ধীরেন শাসমল

ISBN-81-7079-903-1

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দাহ

এটা ওর স্বাভাবিক অবস্থা কী না, ও নিজেও ঠিক জানে না যেন, এই রকম সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। দিনের আলো এখনও রয়েছে, জানালা দিয়ে সেই আলো পড়ন্ত বেলার মিয়নো আলো, ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। ঘরের মধ্যে একটা আবছায়া ভাব, ঘরের মধ্যে চার দেওয়ালের ঢাকা আছে বলে, এবং দরজাটাও বন্ধ তা-ই বাইরে এখনও যতটা উজ্জ্বল, ভিতরে ততটা না। একটা আবছা ভাব, ঘরের মধ্যে, দেওয়ালের রঙ সাদা তাই এই আবছা ভাবটা আছে, কোন ভারী রঙের হলে থাকত না, যে কারণে বোঝা যায় ঘরের কোণগুলো অনেক অস্পষ্ট, অন্ধকার অন্ধকার, খাটের নিচে—খাট না, চৌকির নিচেটা প্রায় কালো, কিছুই দেখা যায় না।

দেওয়ালে কোন ভারী রঙ থাকলে ঘরটা অনেক বেশি অন্ধকার লাগত, যেহেতু, বাইরের আলোতে দিনের আভাস মাত্র আছে, কিন্তু আকাশে কোন রঙ নেই, যেমন বেলা শেষের আলো হয়, লাল বা তার চেয়ে গাঢ় কিছু, কিছুই না, কারণ সম্ভবতঃ সূর্য যেদিকে অস্ত গিয়েছে বা যাচ্ছে, সেদিকে কোন মেঘ নেই, যার ওপ:র বেলা শেষের আলো কিছু খেলা দেখাতে পারত। একটা কিছু না হলে, না থাকলে, সূর্য কিসের ওপরেই বা খেলা দেখাবে। তাই, আকাশ-টাকে এখন, অনেকটা, আলগা হাতে, লেখা মুছে দেওয়া শেলেটের মত দেখাচ্ছে। তাঁতেই মনে হয়, একটু পরেই আকাশ কালো হয়ে উঠবে, রাত হবে। পাখীরা অধিকাংশ কাক, শহরের মিউনিসিপালিটির কনজারভেন্সি বিভাগ কেন এদের খাওয়ায় না, কে জানে, কারণ এরাই তো যত রাস্তাঘাটের ময়লা খেয়ে খেয়ে পরিষ্কার করে, শহরের কাক-ই বেশি, এবং শালিক কিছু এবং :চড়ুই, বড় দুবন্ত এই

ছোট পাখীগুলো, এখন সকলেই ঘর মুখো। জানালা দিয়ে তাদের বাসায় ফেরৎ যাবার, এদিক ওদিক ওড়া মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, আর সেই পাখীগুলো-ওগুলো পাখী কী না, তা-ই.বা কে জানে, অনেকটা উড়ন্ত চামচিকের মত দেখায়, আর মনে হয় ওরা এক ধরনের অন্ধ, আকাশচরা, সরু সরু পাখাওয়ালা, ছোট বড় মেশানো ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলা জীব, যেন পাখী না, তারা এখন ছায়া পড়া আকাশ ছেড়ে যেতে রাজী না। সবাই যখন ফিরে চলেছে, তখন এদের সময় হল ওড়বার, অথচ এরা রাত চরা না, কারণ ও কোনদিন এদের রাত্রে উড়তে দেখে নি। ও দেওয়ালে হেলান দিয়ে, ঘাড়টা কাত করে, মুখটাকে পাশ ফিরিয়ে, জানালার দিকেই চেয়ে আছে, যদি বা, এসব ও সত্যি দেখছে কী না, ও নিজেও ঠিক জানে না, অথচ ওর মনে পড়ে যাচ্ছে নীলিমা যেন একবার বলেছিল না কী মা-ই বলেছিল ওগুলো চাতক। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না, এমন সুন্দর যাদের নাম— চাতক—যেন কবিতার শব্দের মত, তাদের চেহারা, এত খারাপ দেখতে হবে কেন। ওদের কোনদিন বসা অবস্থায়, মাটিতে বা জলের ধারে বা গাছে বা ছাদের আলসেয় সানসেট, এ কোনদিন বসতে দেখা যায় না, কেবল উড়ছে, উড়ছে, একটু উঁচু দিকের আকাশে, যেখানে কাক বা শালিক বা চড়ুই সচরাচর ওঠে না, সেই রকম উঁচুতে উড়ছে, ঝাঁক বেঁধে, কখনও একলা না, উড়তে উড়তে, অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়, আবার ফিরে আসে, কী যে চায়, কিছু বোঝা যায় না। যেমন কাক বা চিল বা শালিক চড়ুই, সব পাখীরই একটা কারণ বোঝা যায়, খেতে বা খাবার সন্ধানে অথবা ঝগড়া করতে কিংবা পালাবার জন্যে ওড়ে, বসে ডাকে, সব সময়েই ব্যস্ত। এগুলো সে রকম না। এদের যেন কোন খেয়ালই নেই, আপন মনে, ঝাঁক বেঁধে উড়ছে, আকাশের চার পাশে কী যে খুঁজে বেড়ায়, কে জানে। জল নাকি। এত তাড়াতাড়ি, সবাই মিলে অনেকখানি জায়গা নিয়ে উড়তে থাকে, দেখলে মনে হয়, ওরা যেন কিছু খুঁজেই বেড়াচ্ছে, এবং একমাত্র এই কারণেই মনে হয়, ওরা বোধ হয় সত্যি

চাতক আকাশে আকাশে জল খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওদের এত তৃষ্ণা কিসের, এত হন্যে হয়ে ফেরা, যদি সত্যি চাতকের তৃষ্ণার কথাটা সত্যি হয়, যে কারণে, একজন জল চাইলে আর একজন না দিলে, তাকে শাপ দেয়, আর এক জন্মে সে চাতক হয়ে জন্মাবে। অর্থাৎ তখন সে বুঝবে তৃষ্ণা কী, কত কষ্টের, যন্ত্রণার, পুড়ে যাবার মত, জ্বলে যাবার মত এবং তখন সে চাতকের মত হা জল হা জল করে বেড়াবে। এই আকাশচরাগুলোর চাতক যাদের নাম আর এই যেতে যেতে যাওয়া বেলায় যারা উড়ছে, তাদের এত তাপ যন্ত্রণা কিসের, কেন জল পায় না। কোথায় এরা থাকে তাও কোনদিন জানা যায় না, দেখা যায় না। ওরা কি সেইসব মানুষ, যারা গত জন্মে, তৃষ্ণার্তকে জল দেয়নি। কে জানে, মানুষ মরলে সে সত্যি আবার জন্মায় কী না, কারণ মানুষ যদি পাখী হয়, তবে কুকুর বা বেড়ালেরাও পরে মানুষ হয়ে জন্মাতে পারে। কিন্তু এসব সত্যি কী না, ও জানে না।

এইসব কথা, অল্প ঝাপসা ভাবে ওর মনের ওপর দিয়ে যেন চলে যাচ্ছে অথচ ও ঠিক এক দৃষ্টে যে আকাশে ওদেরই দেখেছে, তা না। ওর চোখ দুটো অনেকটা অন্ধকার ঘরের আয়নার মত, তাতে বাইরের প্রায় শেষ হয়ে আসা আলোর ছায়া। সেই আলোয় যা কিছু চলছে, সবই ছায়া ফেলে ফেলে যাচ্ছে। দেওয়ালটা সাদা, তাই ” ক ওর জামাকাপড় খোলা সমস্ত শরীরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যেন ওকে কেউ গজাল দিয়ে দেওয়ালে পুঁতে রেখে দিয়েছে। ওই তো দেখা যাচ্ছে, ঘরের মেঝের এখানে ওখানে ওর জামা কাপড় ছড়ানো, বাইরের জামা আর ভিতরে পরবার হোসিয়ারির জামা যাকে অন্তর্বাস বলে। ওর ডান হাতটা ঝুলে আছে, বাঁ হাত দিয়ে যেন দেওয়াটাকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি, কিন্তু দেওয়ালের গায়ে বাড়িয়ে দেওয়ায় হাতটার থাবা খামচে ধরার ভঙ্গিতে রয়েছে, কোমরের কাছটা একটু ভেঙে পড়েছে যে কারণে, পা দুটোই দেওয়াল থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছে। ডান পা-টা অনেক বেশি সরে গিয়েছে,

বাঁ পা-টা একটু মোড়া, যেন শরীরটাকে দাঁড় করিয়ে রাখার চেষ্টায়। ও ঘামছে, কপাল, কানের পিঠ, গলা, বুকের মাঝখানটা, যেখান থেকে ঘামের দরানি নেমে সোজা ওর নাভির কাছে জমেছে, আর সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে, তলপেটের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা ভিজিয়ে দিচ্ছে, চুঁইয়ে চুঁইয়ে আরও নিচের অংশে নামছে। ওর মাজা মাজা রঙ—বিশেষ করে, কাঁধ বুক পেট উরত যেসব জায়গা অধিকাংশ সময় জামা কাপড়ে ঢাকা থাকে সেইসব জায়গাগুলোই মাজা মাজা ফরসা ফরসা দেখাচ্ছে, বাকি অংশ মুখ গলা কণ্ঠার কাছ থেকে বুকের ওপর দিকের কিছু অংশ অনেকটা কালো কালো ভাবের। যাকে হয় তো শ্যামবর্ণ বলে। ওর শরীরের কোথাও মেদ নেই, কিন্তু ওকে ঠিক রোগা বলা চলবে না। মাঝারি লম্বা শক্ত পেটানো পেটানো চেহারা। বেশ সুগঠিত শরীর। নাকের সামনের দিকটা একটু মোটা হলেও চোখাই চোখ দুটোতে একটু টান টান ভাব আছে। একটু লম্বা কিন্তু মুখটা দেখতে ভালই, ভাল মুখ যদি বা এখন ওর মুখটা এমনই দেখাচ্ছে হাসি বা রাগ না কান্না বা কষ্ট কিছুই ফুটে নেই। অথচ ওর চোখ মুখের ভাব অনেকটা বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত মানুষের মত অথবা একটা কষ্ট আর অসহায় অবস্থায় মানুষকে যেমন ভাবলেশহীন অবসন্ন দেখায়, সেইরকম ওর আধখোলা চোখ বাইরের আকাশে গিয়ে ঠেকে আছে, যেমন মন্দিরের গায়ে পাথরের মূর্তির চোখ স্থির কিন্তু অনিশ্চিত কোন জায়গায় দৃষ্টি ঠেকে থাকে সেই রকম। ও মৃত না জীবিতই, ওর মুখটা খানিকটা হা করা ওপরের সারির দাঁত কয়েকটা দেখা যাচ্ছে, ও হাঁপাচ্ছে, ঘামছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে নাকের পাটা কাঁপছে। বুকটা সেই তালে ওঠা নামা করছে, বিশেষ করে বাঁদিকের পাঁজরের শক্ত হাড়গুলো স্পষ্ট ফুটে উঠেছে এবং কাঁপছে। দেখে মনে হচ্ছে ও যেন বিশেষ ভাবে আহত হয়েছে, কোথাও কোনরকম একটা জোর ঘা লেগে, ছুরি বেঁধানো বা তীর বেঁধা আঘাতে এরকমভাবে দেওয়ালে আশ্রয় নিয়েছে, আস্তে আস্তে সামলে ওঠবার চেষ্টা করছে কিন্তু

পারছে না, বরং ক্রমাগত মরার মত আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। খুব একটা কঠিন মুহূর্তে মানুষ যেভাবে বাঁচে ও যেন ঠিক সেইভাবে রয়েছে।

একটু আগেই ও ঘরে ফিরেছে। মিনিট দশ পনের আগে ও যখন ফিরে এল, আগে পাখার সুইচটা খুলে দিয়ে আস্তে আস্তেই জামা-কাপড় খুলছিল, কারণ বড় গরম লাগছিল। তখনই ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, ওর মুখটা যেন কোন অস্থির কষ্টে শক্ত হয়ে আছে, ফুলে আছে, চোখ দুটো ফেটে পড়তে চাইছে এবং আস্তে আস্তে জামা-কাপড় খুলতে খুলতে হঠাৎ ও দাঁতে দাঁত চেপেছিল, যেন ভিতর থেকে, কিছু একটা বেরিয়ে আসাকে আটকাতে চেয়েছিল, এবং তখনই জোরে টানাটানি করে, গায়ের থেকে সব জামাকাপড় খুলে মেঝের এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল। স্যাণ্ডেল দুটো পায়ের থেকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। হাত দুটো মুঠো করে বুকের কাছে চেপে ধরেছিল, নিজেরই উরতে ঘষেছিল যেন একটা ভীষণ যন্ত্রণা কিছু সহ্য করছিল তারপরেই দেওয়ালে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়েছিল। তখন ওকে কী রকম ইনস্যানিটিক লাগছিল এবং এটা তো নিশ্চিত, ও খুব স্বাভাবিক অবস্থায় নেই অথচ ঠিক উন্মাদ বলেও মনে হচ্ছিল না। যেন একটা নিরুপায় অসহায় অবস্থা, রাগ—ঠিক রাগ ছিল কী না, বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু মুঠি পাকিয়ে যেরকম করছিল, তাতে মনে হচ্ছিল, একটা রাগও যেন সেই অবস্থার মধ্যে মিশেছিল। মাথার ওপরে পাখা ঘুরছিল, তথাপি ঘামছিল, এখনও ঘামছে! ওর ঠিক উল্টো দিকে না, একটু পাশে দেওয়ালে ঝোলানো একটা বড় আয়না, যেটাকে ড্রেসিং টেবিল বলা চলে না অথচ দেওয়ালে ঝোলানো আয়না হিসাবে আয়নাটা বড়ই, সেখানে ওর শরীরের অনেকখানি অংশ দেখা যাচ্ছে। আয়নাটা যে দেওয়ালে, সেখানে ছায়া ঘন আর ও যেখানে দাঁড়িয়ে সেই দেওয়ালের সাদা ঝলকটা আয়নায় ভেসে উঠেছে এবং ওর শরীরের অনেকখানি অংশ এমনভাবে দেখা যাচ্ছে, পুরনো দিনের ছবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়, নগ্ন, আহত অথচ ওকে পশুর মত দেখাচ্ছে না কারণ,

যেহেতু ওর কষ্ট নিতান্ত শারীরিক না, একটা রক্তাক্ত পশুকে যেমন দেখায়, বরং ওর ভাবলেশহীন মুখ, টানা টানা পাথরের মূর্তির মত চোখ, শরীরের মেদহীন শক্ত গঠন. কালো পাতলা দাড়ি, ঠোঁটের ওপরে গোঁফ এবং কপালের মাঝখান বরাবর সূচাগ্র তীরের মত চুল হঠাৎ কপালের দুপাশে গোল হয়ে ছড়িয়ে ওপর দিকে উঠেছে আর ঘন বড় বড় চুলগুলো কেশরের মত ঘাড় অবধি বেয়ে পড়েছে. সব মিলিয়ে ক্রুশে বেঁধা একটা মূর্তির কথা মনে পড়ে যায়, যদি বা সেই মূর্তি ওর মত একেবারে নগ্ন ছিল না, কোমরে এক টুকরো কাপড় জড়ানো, পুরুষাঙ্গ সুদ্ধ ঢাকা। অথচ ও যে এরকম একেবারে সব খুলে ফেলেছে, তাতেও ওকে দেখে একটা উলঙ্গ মানুষকে দেখলে যেমন মানুষের মনে বিতৃষ্ণার ভাব জাগে, চোখের দৃষ্টি লজ্জায় আর সংস্কারে যেন শিউরে ওঠে সেরকম লাগছে না। কারণ, বোধহয় ওর সব কিছুই স্বাভাবিক নির্বিকার যুবকের থাকে এবং একেবারেই ভারতীয়, ইউরোপের পাথরের মূর্তির পুরুষদের মত না।

কিন্তু ওর এ অবস্থাটা স্বাভাবিক না, ওর মনের অবস্থা যা স্বাভাবিক না বলে বলা চলে ও শান্ত নেই, কষ্ট যন্ত্রণা আর উত্তেজনায় ওর ভিতরটা এখন অশান্ত, যে সময়ে মানুষের সব কিছুই বাড়তি মনে হতে পারে। কঠোর তপস্যা বা কোন দারুণ মুহূর্তে যে সমস্ত কিছুর ওপরে চলে যেতে চায় এবং বাহ্য জগতের কোন কিছুকেই সত্যি বলে মনে করতে পারে না। জন্ম মৃত্যু বা মৈথুনের সময় ছাড়াও মানুষ কোন কোন সময় শরীরকে সমস্ত কিছুর থেকে বাইরে ছাড়িয়ে আনতে চায়, রাগে-দুঃখে-কষ্টে-আনন্দে-শোকে-অসুখে যা এত তীব্র যে, তখন নিজের তৈরি সমস্ত ব্যাপারগুলোকে অসহ্য বিশ্রী বলে মনে হয়। কিন্তু ওর নিজের ওসব কিছু মনে নেই, এসব কথা ভাবছেও না। ভাবতে পারছে না, কিছুই না, খুব জোরে একটা কিছু ঘুরলে যেমন স্থির দেখায়, ওর ভিতরটাও সেই রকম হয়ে আছে যেন, কেবল একটা ঝঙ্কারের মত কোথাও যেন গুন্‌গুন্‌নন্‌ন্‌ শব্দ হচ্ছে।

ও প্রথম যখন ঘরে এসে ঢুকেছিল, একটা সাধারণ অভ্যাসের মতই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পাখার সুইচ টিপে জামাটা খুলেছিল, তারপরে গেঞ্জিটা এবং গরম বেশি মনে হওয়ায় ট্রাউজারটা খুলে পায়জামা পরার কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু বাইরে থেকে ঘরে ঢোকার মুহূর্ত থেকেই ওর ভিতরটা যেন ফেটে পড়ছিল, একটা কীরকম কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে ও যেন নিঃশ্বাস আটকে রেখেছিল, আর ট্রাউজারের বোতাম না খুলেই একটানে খুলে ফেলেছিল, বাইক-এর একটা স্ট্র্যাপ জোরে টানার দরুন ছিঁড়ে গিয়েছিল, তারপরে কোনরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমটা মনে হয়েছিল, ও বুঝি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে, চৌকির বিছানার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখটা চেপে ধরবে, বেডকভারটা ভিজিয়ে কাঁদবে। কিন্তু সেসব কিছুই করে নি, বরং পড়ে যেতে পারে, এই ভয়ে শরীরটাকে দেওয়ালে চেপে খামচে ধরার চেষ্টা করেছিল। এখন সেই অবস্থা থেকে ওকে অনেকটা শান্ত আর স্থির দেখাচ্ছে। ওর চোখের সামনে মহেন্দ্রদার মুখটা একবার ভেসে উঠল।

কাক বা শালিক বা চড়ুই আর দেখা যাচ্ছে না জানালার আকাশে। সেই অন্ধের মত ঝাঁক বাঁধা, আকাশচরা জীবগুলোকে এখনও দেখা যাচ্ছে, জানালার অনেকটা কাছেই গোল হয়ে ঘুরছে আর কীরকম করে যেন ডাকছে, 'জল দাও জল দাও' বলে মনে হচ্ছে না, যেমন 'খোকা কোথা' পাখীর ডাক শুনলে সত্যি মনে হয় যেন পাখীটা কোন ঝোপের মধ্যে বসে একনাগাড়ে ডেকে চলেছে, 'খোকা কো-থা'। খোকা কো-থা'।...এদের ডাক সেরকম শোনাচ্ছে না, যদি সত্যি এগুলো চাতক হয়, আর জল খুঁজে খুঁজে চেয়ে চেয়ে ফেরে, বরং কেমন যেন সরু গলায়, অনেকে একসঙ্গে এমনভাবে ডেকে চলেছে, বাচ্চা ভিখিরি ছেলেমেয়েরা যেমন একসঙ্গে বলতে থাকে, 'একটা পয়সা দিন না, একটা নয়া দি· না', কিন্তু এটা ঠিক, এই পাখীগুলোর ডাকের মধ্যে সুখ নেই বা অনেকেই যেমন বলে, 'পাখীর ডাক মিষ্টি, সেরকম কিছুই না, একসঙ্গে অনেক গলার চিৎকারের মত

এরা ডাকছে, যেন সত্যিই কিছু চাইছে তা-ই মনে হয়, তাহলে এরাই বোধহয় চাতক, শাপগ্রস্ত পাপের দেনা শুধছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে এবং চাতক তো পাপী সেইজন্যই চেহারাগুলো সুন্দর না, ওদের ঠোঁট চোখ কিছুই দেখা যায় না। এখন ও নিজেই বুঝতে পারছে, পাখী-গুলোর কথা ওর মনের মধ্যে ঘুরছে, এবং ঝাঁকটা ঘুরতে ঘুরতে, ক্রমে আরও দূরে সরে গেল, আবার মহেন্দ্রদার মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল, বেশ চওড়া বড় মুখ, ফরসা রুক্ষ চুলগুলো বড় বড়, মোটা ভুরুর নিচে ছোট ছোট দুটো চোখ, কিন্তু সবই যেন দেখতে পায়, এক একজনের চোখ যেমন থাকে, ভীষণ সতর্ক, তাড়া-তাড়ি সব দিকে দেখতে পায়, সবাইকে দেখতে পায়. এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নেয় তখন কী করা উচিত। যেমন ওকে দেখে মহেন্দ্রদা করেছিল, এই তো, প্রায় ঘণ্টাখানেক আগেই। মহেন্দ্রদা যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিল, নিশ্চয়ই পার্টির বিষয়ে কোন কথা বা কোন রাজনীতির কথা, তাছাড়া মহেন্দ্রদা কী বলতে পারে, ও রকম দশ বারোজন লোক, তাকে ঘিরে দাঁড়াবেই বা কেন, কারণ মহেন্দ্রদা একজন রাজনৈতিক নেতা। তার পেশা, নেশা এবং কোন কিছুই রাজনীতি ছাড়া বিচার করে না। নিশ্চয়ই কিছু একটা বিষয়ে বুঝিযে বলছিল,. কিংবা কোন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল, সেইরকম ওর সঙ্গে মহেন্দ্রদার চোখাচোখি হয়েছিল। মহেন্দ্রদার চোখ খুব সাবধানী, সতর্ক, অথচ খুব যে একটা তীক্ষ্ণ—তীক্ষ্ণ অর্থাৎ বুদ্ধিতে জ্বলজ্বলে তা ঠিক না, চোখাচোখি হল অথচ মহেন্দ্রদার কথা থামে নি বা কয়েক মুহূর্ত ওর ওপর থেকে চোখ সরিয়েও নেয় নি, কিংবা চেনা মানুষ দেখে যেরকম একটু ভুরু কাঁপায়, মাথা নাড়ায় বা একটু হাসে, সেরকম কিছুই করেনি, চেনা মানুষ দূরের কথা, কাউকে দেখেই নি, কিছুই দেখে নি, এমনি অনায়াসে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই সকলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, যেন মহেন্দ্রদা দেখতে পায় নি, দেখতে পেলেও চিনতে পারে নি, অথবা মহেন্দ্রদার যা চরিত্র তাতে একথাও হয়ত মনে মনে

বলেছিল, 'দেখলেই বা চিনলেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে হবে, বা চেনার ভঙ্গি করতে হবে, এমন কী কথা আছে।'

আশীষ দাঁড়িয়েছিল এবং আশীষ ওকে দেখতে পায় নি, অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। আর মহেন্দ্রদা ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি একবার আশীষের মুখের দিকেও দেখে নিয়েছিল, কারণ আশীষও ওকে চেনে, তাই মহেন্দ্রদা সেই মুহূর্তে জেনে নিতে চাইছিল, আশীষ ওকে দেখেছে কী না। দেখে থাকলে ব্যাপারটা কী ভাবে নিচ্ছে, কারণ, আশীষ ওকে দেখলে, মহেন্দ্রদার সঙ্গে নিশ্চয়ই ওর বিষয়ে কোন কথা হত। কিন্তু আর কোন কথা হবে না, মহেন্দ্রদা কোন কথাই বলবে না। সমস্ত ব্যাপারটা—ব্যাপারটা এমন কিছুই না, ওকে দেখতে পাওয়া বা না পাওয়াটা কোন ব্যাপারই না। তবু মহেন্দ্রদাকে না দেখতে পাওয়া বা না চিনতে পারার মত ভাবটা করতে হয়েছিল যে, ওর বুকের মধ্যে তৎক্ষণাৎ কী রকম করে উঠেছিল। মহেন্দ্রদা—

দরজায় ঘা পড়ল, কে যেন দরজায় ঠক্‌ঠক্ শব্দ করছে, কতক্ষণ ধরে শব্দটা হচ্ছে, ও টের পায়নি, এখন কানে যেতেই, ওর চোখের তারা দুটো দরজার দিকে ফিরতে গিয়ে আয়নায় দৃষ্টি পড়ল, আর ও যেন হঠাৎ চমকে শিউরে উঠল। যেন চিনতে পারেনি, এমনি ভাবে, আয়নায় নিজের শরীরের অনেকখানি অংশের দিকে তাকাল। ওরকম একটা মূর্তি দেখে, শিউরে ওঠার মত, ওর গায়ে একটা ঝাঁকুনি লাগল যেন, তার পরেই যেন ইলেকট্রিকের শক খেয়েছে। এমনি ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটা হাত দিয়ে মুখ এবং অন্য হাত দিয়ে নিচের দিকটা ঢাকা দিল। যেন ভয়ে ও কীরকম হয়ে গিয়েছে। দরজায় ঠক্‌ঠক্ শব্দটা ইতিমধ্যে আরও জোরে বেজে উঠল, আরও ঘন ঘন।

॥ ২ ॥

ও নিজের মনেই বলে উঠল, 'ওটা আমি, আমি। উহু আমি—।
দরজায় আরও জোরে ঘা পড়তে লাগলে, আরও ঘন ঘন এবং একটা অচেনা স্বর যেন বহুদূর থেকে কী একটা নাম ধরে ডাকছে, কী বলছে, ও ঠিক বুঝতে পারছে না। ওর সমস্ত চেতনা জুড়ে এমন একটা ভয়, আতঙ্ক, শিরদাঁড়ার কাছে যেন একটি সাপ হিলহিল করে ওর মস্তিষ্কের মধ্যে উঠে যাচ্ছে, ও আবার মনে মনে বলে উঠল, 'সর্বনাশ, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, জামা কাপড় সব খুলে ফেলেছি, আমি—এখনও বুঝতে পারছি, হয়ত এখনও—দোহাই—'। দরজার শব্দটা এত জোরে বেজে উঠল এবার, মনে হল, হাতে দিয়ে না, কোন ভারী কিছু দিয়ে ঘা মারছে, এবং তাতেই দরজার দিকে তাকিয়ে একটা ভয় মেশানো উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

জবাবটা শোনবার আগেই ও ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দু হাতে ট্রাউজারটা তুলে নিল, অন্য কিছু না পরেই দু পায়ের মধ্যে গলিয়ে, জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে চোখ বুঁজে বোতাম লাগিয়ে নিল, এবং আবার দরজার দিকে তাকিয়ে, কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই দরজার বাইরে থেকে ঠিক ওর মতই, ভয় উত্তেজনা মেশানো গলা শোনা গেল, 'আমি, আমি নীলিমা।'

'নীলিমা?'

'হ্যাঁ'।

ও ততক্ষণে পা দিয়ে মেঝেয় ছড়ানো জামা গেঞ্জি বাইক, সবই ঠেলে দিতে আরম্ভ করেছে তক্তপোষের নিচে, আর মনে মনে বলল, 'এ যাত্রাটা বোধহয় বেঁচে গেলাম।' দু হাত দিয়ে মুখটা ঘষল, যেন মুখের ওপরের এই মুহূর্তের সমস্ত ছাপটা তুলে ফেলতে চাইছে, এবং এমন কী, যেন হাসতেও চাইল। দরজার কাছে গিয়ে, ছিটকিনিটা খুলে দিল, দরজার পাল্লা ধরে টান দিল। নীলিমা দাঁড়িয়ে রয়েছে,

ওর হাতে এক কাপ চা। চায়ের কাপ থেকে এখন আর ধোঁয়া উঠছে না। নীলিমার পাশেই, সতের আঠার বয়সের টুলু দাঁড়িয়েছিল, ওর হাতে একটা বড় লোহার কয়লা ভাঙার ডাণ্ডা। নীলিমার চোখে ভয় আর উত্তেজনা, সারা মুখে ঘাম জমেছে। ওর দিকে একবার দেখল, ওর ঘামে ভেজা, খালি পা, শুধু ট্রাউজার পরা চেহারাটা। এখন ওর ঢেউ তোলা রুক্ষ কালো দাড়িতেও কয়েক ফোঁটা ঘাম টলটল করছে। নীলিমার নাকের পাটা কাঁপছে, এইমাত্র যেন তার নিঃশ্বাস পড়তে আরম্ভ করেছে, আর টুলুর চোখে তেমন ভয়ের ছাপ নেই, একটা উত্তেজনা আর কৌতূহল যেন ফেটে পড়ছিল। ওকে দরজা খুলে দাঁড়াতে দেখেই টুলু যেন অবাক হয়ে তাকাল, ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, চোখ নামিয়ে নিল, এবং তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে, হাতের কয়লা ভাঙাটা নিয়ে চলে গেল। হয়ত ওকে নীলিমাই ভয় পেয়ে ডেকেছিল, বলেছিল, 'টুলু শিগ্‌গির একটা কিছু নিয়ে এসে দরজাটা ভাঙ, অনেকবার ডেকেও কোন সাড়া পাচ্ছি না।' এখন বোধহয় আর কেউ বাড়ি নেই, তা হলে, এত শব্দাশব্দিতে সকলেই ছুটে আসত।

নীলিমা বলল, 'তোমার চা এনেছি, বিকেলে তো খাওনি।'

ও মুখটাকে একেবারে অন্যরকম করে তুলতে চাইল, একটা হাসি হাসি ভাব, আসলে, চিন্তিত হয়ে পড়ছিল কী একটা মিথ্যা কথা বলা যায় খুব স্বাভাবিক, সহজ মিথ্যা কথা, কারণ সত্যি কথাটাই—সত্যি ব্যাপারটা, এমন অস্বাভাবিক, অদ্ভুত আর আজগুবি, ওর নিজের কাছেও এখন তা-ই মনে হচ্ছে। ও হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিল আর দেখল, নীলিমার চোখ দুটো ঘরের ভিতরে অবাক কৌতূহলে কিছু দেখতে চাইছে। চায়ের কাপটা নিয়ে ও বলল, 'হ্যাঁ বিকেলে তো চা খাইনি।' বলতে বলতেই ও ঘরের মধ্যে সরে এল, যাতে নীলিমা ঘরের মধ্যে আসতে পারে, দেখতে পারে, অদ্ভুত কিছুই না দেখতে পায়, কিন্তু কী একটা মিথ্যা কথা বলা যায়, কারণ, ঘরের মধ্যে ও কী করছিল যে একটা জবাব পর্যন্ত দিতে

পারছিল না, এর একটা সহজ কৈফিয়ত দরকার, যদি বা ও নিজেই তো জানে না, কী করছিল, কেন করছিল, বরং একটা ভয়ের শিউরোনি এখনও ভিতরে যেন থর থর করছে, নীলিমাকে কৈফিয়ত দিতেই হবে, তার কোন মানে নেই, তথাপি, একটা জিজ্ঞাসা তো থেকেই যাবে, যা ও চায় না। কোন জিজ্ঞাসা, কোন কৌতূহল, কিছুই যেন না থাকে, একটা খুব সহজ ব্যাপার ঘটছিল বা হচ্ছিল, এটাই বোঝাতে চায়, কিন্তু কী একটা মিথ্যা কথা বলা যায়, বেশ যুতসই একটা ভাল সুন্দর মিথ্যা কথা।

ও চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই লক্ষ্য করল, নীলিমা ওপরের দিকে দেখছে। সেটাও খুব খারাপ, কারণ নীলিমা নিশ্চয়ই সন্দেহ করছে, ও বোধহয় ওপরের বিমের সঙ্গে-কেন না কড়িকাঠ নেই, তাই বিমের সঙ্গে কোনরকমে দড়ি বেঁধে বা ফ্যানের আঙটার সঙ্গে কোনরকমে দড়ি ঝুলিয়ে, গলায় ফাঁস দিয়ে মরবার চেষ্টা করছিল। তাছাড়া, ও ভাবে নীলিমার ওপর দিকে তাকাবার কোন কারণ থাকতে পারে না। নীলিমা নিশ্চয়ই, কিছুক্ষণ আগে গা ধুয়ে একটু সাজগোজ করেছে, ওর চোখে নতুন লাগানো কাজল, ওপর পাতা দুটো দেখেই বোঝা যাবে, খুব মোটা করে না, ওপর পাতায় ও সরু করেই কাজল লাগায়, নিচের পাতায়' আর একটু কম, কোণের দিকে টেনে একটু বাঁকিয়ে দেয়। মুখে হালকা করে পাউডার মাখানো, ঘামে গলে পড়বার মত না। চুলগুলো বরাবরই—বরাবরই কী না জানা নেই, সামনের দিকে ছোট করে ছাঁটা, কপালের ওপর খানিকটা টেনে দেওয়া এক বিনুনি। কী একটা কাপড়, আজকাল যেমন সবাই পরে, ভাঁজ করতে হয় না, ধুলেই হয়, তার ওপরে ফুল লতাপাতা কী সব আঁকা, আর একটা কালো রঙের ছোট-জামা নীলিমার গায়ে। চোখ দুটো টানা, বড় বা ভাসা ভাসা না, টানা। নাকটা সরু আর টিকলো, ভুরু দুটো [illegible]। শরীরের ঝোঁকটা একটু মোটা হবার দিকে সুযোগ পেলেই কোনরকম একটা ঢল নামলেই ফুলে উঠবে, যেমন ছোট নদী, বেশ মানানসই লাগে। এখন নীলিমাকে মোটা' বলা যায় না, তবে



কোনরকম ঢল লাগলেই—ঢল তার মানে কী, বিয়ের মত কিছু নাকি। মেয়েদের বিয়ের পরে স্বাস্থ্য ভাল হলেই বলে, 'বিয়ের জল লেগেছে।' বিয়ের জলটা, সেটা আসলে কোন বস্তু কী না, ও ঠিক জানে না। তবে কেন যেন কথাটার সঙ্গে পুরুষের বীর্যের কথাটা মনে আসে, অথচ বিয়ে, একটা বিশেষ আনন্দ, বিশেষ সুখ মেয়ে পুরুষের, কোনরকম লুকোচুরি না করে, অবাধ মেলামেশা, শেষ পর্যন্ত একটা শারীরিক ব্যাপার বলেই তো মনে হয়, তবু হতে পারে, কথাটার মধ্যে অশরীরী কোন ইঙ্গিতও আছে। নীলিমার সম্পর্কে, সেরকম কিছু ভাববার নেই, কারণ ও জানে, যে হিসাবে, নীলিমার বিয়ের জল লেগেছে, কারণ সমীর খুব কাঁচা ছেলে না, যার সঙ্গে নীলিমার বিয়ে একরকম ঠিক ঠাকই আছে, সকলেই জানে সবখানেই ওরা একসঙ্গে বেড়াতে যায়, সিনেমা দেখতে যায়। এবং সমীরের 'প্রাকটিস' অপছন্দ না। আসলে ঢল লাগার কথাটা মনে এসে পড়ে, অন্যভাবে যেমন বিয়ে না করে বা বিয়ের আগে পুরুষের সঙ্গে না মিশলেও, অনেকে মোটা হয়ে যায়, যেন কোথায় একটা মস্ত বড় ঢলের মুখ আটকানো ছিল, হঠাৎ তা কয়েক বছরের মধ্যেই নেমে এসে সব ফাঁপিয়ে তুলল, সেরকম কিছু একটা।

নীলিমার বোধহয় সেরকম কিছু এখনই হবে না। ও দেখতে পাচ্ছে, নীলিমার কাজলপরা চোখে এখনও ভয়ের ভাবটা রয়েছে, যদিও ওর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠেছে, এবং এখন ওপর থেকে চোখ নামিয়ে, মেঝের দিকে তাকাচ্ছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। নীলিমা নিজেই বোধহয় জানে না, ওর চোখে এখন কৌতূহল ফুটে উঠেছে। ও ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সব চা টুকু শেষ করল। পাগল হওয়ার থেকে আত্মহত্যা নিশ্চয়ই অনেক ভাল। কিন্তু ও কোনটাই চায় না। নিজেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলা অবস্থায় ভাবতেই, ওর খুব কুৎসিত লাগছে, এবং কিছুক্ষণ আগের সেই উলঙ্গ একেবারে না জানা, যেন ভীষণ অন্ধকার মনের একটা ব্ল্যাকআউট অবস্থা সম্পর্কে, এখনও একটা থরথর ভাব রয়েছে, তবু মনে মনে না

হেসে পারল না। মনে মনে হাসে এবং একটা শব্দ করল, 'আ'। তারপর আস্তে গলা খাকরি দিল; কোণের টেবিলের ওপরে চায়ের কাপটা রেখে, পকেট থেকে সিগারেট বের করে পাখার বাতাসে অনায়াসেই জ্বালিয়ে দিল। হাতের পিছন দিয়ে চিবুক থেকে কয়েক ইঞ্চি নেমে আসা দাড়ি মুছল। মুখটা আবার মুছল। নীলিমা তখন জানালার কাছে। এখন যদি, নীলিমা মুখ নিচু করে, পাশ ফিরে তাকায়, তাহলে তক্তপোষের নিচে জামা এবং গেঞ্জি নিশ্চয় দেখতে পারে। আর তখনই অবাক হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে—একথা মনে হতেই, ও আবার কাশলো, যেন হাসতে গিয়ে কাশলো। নীলিমা ওর দিকে তাকালো। এইবার। একটা মিথ্যা কথা-বাইরে অন্ধকার জমছে, ঘরের মধ্যে আরও বেশি, ও চোখের কোণ দিয়ে একবার আলোর সুইচটার দিকে দেখে নিল। নীলিমা যেন ওখানে না যায়, আলোটা যেন না জ্বালে, ও শব্দ করল 'হুম!' অর্থাৎ এবার ও বলবে, কারণ, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, নীলিমার অস্পষ্ট আবছা লেগেছে বলেই, কোন কথা শোনবার আগে আলোটা জ্বালাতে চায়। ও আলোটা জ্বেলে দিল, ওর দিকে ফিরে বলে উঠল, 'অনেকদিন পরে—।' নীলিমা তাকাল। ও আবার হাসবার ভাব করল। এখন ওর মুখটা সত্যি, অন্যরকম দেখাচ্ছে, দেওয়ালে হেলান সেই মুখটা নেই। এখন যেন, খানিকটা লজ্জা পাওয়া ভাব, হাসিটাও সেইরকম। সিগারেটে একটা টান দিয়ে, নীলিমার দিকে তাকাতে গিয়েও, জ্বলন্ত সিগারেটটা চোখের সামনে তুলে বলল, 'অনেকদিন পরে হঠাৎ কী খেয়াল হল—।' কথাটা ঠিক শেষ করল না, একটা টান রয়ে গেল। হ্যাঁ, মিথ্যা কথাটা মোটামুটি ভাবে মনের মধ্যে এসে গিয়েছে।

নীলিমা জিজ্ঞেস করল, 'কী, বল তো। কখন থেকে দরজা ধাক্কাচ্ছি কোন সাড়া-শব্দ নেই। ভাবি যে কী হল, এই তো একটু আগে—।'

ও আবার, সেইরকম লজ্জা লজ্জা ভাব করে, সিগারেটে টান দিল, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, অল্প শব্দ করে একটু হাসল, ভাবছে

কথাটা ঠিক গুছিয়ে—মানে, যাতে নীলিমার বিশ্বাস হয়, সেইভাবে বলতে হবে। নীলিমা ভাবছিল, ও বুঝি জবাব দিতে যাচ্ছে, কিন্তু জবাবটা ঠিক না পেয়ে আবার বলল, 'কাশী আমাকে বলল, তুমি বাড়ি এসেছ, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে চা দেওয়া হয়েছে কী না। শুনলাম সেইমাত্রই এসেছ, মা তো বাড়িতে নেই, রোজ বিকেলের মতই কোথায় ঘুরতে বেরিয়ে গেছে, আমি তখন গা ধুয়ে বেরিয়েছি, কাশীকে বললাম চায়ের জলটা চাপিয়ে দিতে, কাপড় ছেড়ে এসে আমি তোমাকে চা করে দেব। সাত আট মিনিটের মধ্যেই কী হল, এসে দেখি দরজা বন্ধ। এত ধাক্কালাম, কোন সাড়া শব্দ নেই। এত ভয় পেয়ে গেলাম, টুলুটা তখুনি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিল, আমি বিচ্ছিরি একটা ভয়—।'

ওর চোখের সামনে, নিজেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলা অবস্থাটা ভেসে উঠল। সেই একই ব্যাপার, কেউ কারোর সম্পর্কে, ঠিক কথাটা ভাবে না বা ভাবতে পারে না। একজন যা ভাবছে বা করছে, যে কারণে করছে তার কোন কিছুই আর একজনের চোখে, ঠিক তার মতই দেখায় না, একেবারে ভিন্ন, অন্যরকম কিছু এবং এটাই বোধহয় মানুষের স্বাভাবিক ধারা, দেখা বা ভাবা বা করা সব কিছুই তার নিজের মধ্যে আবদ্ধ এবং সীমিত। নীলিমার 'বিচ্ছিরি একটা ভয়' ও গলায় দড়ি দিয়ে, বন্ধ ঘরের মধ্যে ঝুলে আছে অথবা কিছু খেয়ে টেয়ে বিছানায় বা মেঝেয় পড়ে আছে।

নীলিমা তখনও বলছে, ওর গলার স্বরটা সরু আর টান টান, এত বেশি টান টান, খুব কষে তার বাঁধা থাকলে, তারের যন্ত্রে যেমন শব্দ হয়, অনেকটা সেইরকম। যে কারণে রবিঠাকুরের গান নাকি ওর গলায় ভাল শোনায় না। রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে হলে নাকি বিশেষ একটা গলা চাই, যে গলায় কোনরকম তারল্য নেই— না, কথাটা ঠিক এভাবে বললে অন্যরকম শোনায়, নীলিমার গলার যারা প্রশংসা করে বা যাদের ভাল লাগে, যেমন সমীর। যে ওকে বিয়ে করবে, একরকম ঠিকঠাক, বলে, 'নীলিমার ভয়েসটা সেক্সি

ভয়েস।' সেকসি ভয়েস—সরাসরি অর্থটা কী, ও বোঝে না মানেটা বোধহয় এরকম, স্বরে যৌনতা সেটাই বা কী রকম ও বোঝে না, এবং যারা রবীন্দ্রনাথের গান করে তাদের স্বরে সেক্স নেই তা হলে। তবে এটা ঠিক, নীলিমার গলায় রবীন্দ্রনাথের গানের থেকে ঠুংরি বোধহয় ভাল শোনায়, তার চেয়ে বেশি বোধহয়, যার নাম আধুনিক এবং নিজের সম্পর্কে শুনে শুনে. নীলিমা নিজেও বোধহয় ওই ধরনের গান গাইতে ভালবাসে। ইংরেজী গানও, বিশেষ করে, আমেরিকান মডার্ন সব রেকর্ডগুলোই বোধহয় মুখস্থ, গাইতেও পারে ভাল। এখন ও গান করছে না, কিন্তু নীলিমার গলার স্বরটা কেমন অন্যমনস্ক উদ্বেগের একটা ভাব। না থেমেই বলে যাচ্ছে, তাতেও একটা বিশেষ সুর। 'আমি তো বলেই দিলাম টুলুকে, ও দরজা ভেঙে ফেলুক, আমার গায়ের মধ্যে কীরকম করছিল, আর টুলু ওই পুরনো কয়লাভাঙাটা দিয়ে দুটো ঘা মারতেই তুমি দরজা খুলে দিলে, নইলে—।'

'আসলে, কী বিচ্ছিরি, আসলে', বলতে বলতে ও আবার হাসল। নীলিমা ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ, কী বল তো।'

নীলিমা খুব চালাক নয়, নিশ্চয়ই ধরতে পারবে না, ভাবতে ভাবতে ও বলল, 'ব্যায়াম—মানে একসাইজ একটু আসন করেছিলাম, অনেকদিন পরে—।'

নীলিমা ওর কথাটা শেষ করতে দিল না, ঠোঁট দুটো ছুঁচলো করে, এই প্রথম লক্ষ্য পড়ল, নীলিমা ঠোঁটে রঙ মাখেনি হয়ত এখানে ওকে চা দিয়ে গিয়ে মাখতো, চোখ দুটো বড় করে ভীষণ অবাক হয়ে বলল, 'ও। তাই। বুঝেছি। হ্যাঁ, মনে পড়েছে তুমি তো আগে আসন করতে, পাঁচ বছর আগে—।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার খুব মনে আছে, সে সময়ে তো তুমি কথা বলতে না, আসন খুব কঠিন ব্যায়াম বলে শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কে খুব সাবধান থাকতে হয়, নইলে কিছু একটা গোলমাল হয়ে যেতে পারে, সেইজন্য। বাব্বা, সে আমার খুব মনে আছে, পাঁচ বছর আগে—।'

ও মনে মনে আবার উচ্চারণ করল, 'পাঁচ বছর আগে' এবং সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল, প্রায় হাসতে হাসতেই, 'হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে, কিন্তু অনেকদিন পরে হঠাৎ—।'

এই ঘরেই পাঁচ বছর আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে, ওর বুকের কাছে চাপ লেগে গলার কাছে কথা আটকে যেতে চাইছে যেন। সিগারেটে টান দিতে গিয়ে বুঝল, ভিতরে ধোঁয়া নেবার উপায়ও নেই, আটকে যাচ্ছে।

॥ ৩ ॥

নীলিমার চোখ মুখ থেকে ভয়ের ভাব একেবারে কেটে যাচ্ছে, যদি বা উত্তেজনার ছাপটা কাটতে চাইছে না। কিন্তু এখন উত্তেজনাটা অন্য কারণে, হাসিতে ঝকঝকিয়ে ওঠা একটা খুশির উত্তেজনা, একটা খুশি মেশানো কৌতূহল। বলল, 'আমি কী করে জানব বল, তুমি যে দরজা বন্ধ করে আসন করছ, একথা আমার মাথায়ই আসেনি। কতকাল আগের কথা।' বলতে বলতে নীলিমার চোখে 'কতকাল' আগের ছায়া পড়ল, অথচ, সেই অনেকদিন আগের ছায়া নিয়েই ওর দিকে তাকাল। ওর খালি গায়ের দিকে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত, সমস্ত শরীরের দিকে, ও আবার মনে মনে ভয় পেল, পাঁচ বছর আগের কথাটা শুনে হয় তো ওর মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে। নীলিমার হিসাবটা ঠিক না, পাঁচ বছরের বেশি, আরও কয়েক মাস—মাস ছয়েক হবে বোধহয়। এই ঘরে ও দরজা বন্ধ করে আসন করত। পাঁচ বছর এবং আরও কয়েক মাস বেশি আগে, আর করেনি, সেইজন্যই ওর বুকের কাছে, নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে না। আটকে যাচ্ছে, পাঁচ বছর শব্দটা শুনে, পাঁচ বছর। এই শব্দটার সঙ্গে, অনেক কথা, অনেক ঘটনা আর অনেক মানুষের কথা জড়িয়ে আছে, যা এক মুহূর্তেই, একসঙ্গে সব কিছু দলা পাকিয়ে, সমস্ত বর্তমানকে

ডুবিয়ে আড়াল করে দিতে চায়, এমন-কি, এই মুহূর্তের, শারীরিক অবস্থাকেও ছাপিয়ে উঠতে চায়, যে কারণে ওর মনে হয়, গলার স্বর পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু সেটা আর একটা বাজে ব্যাপার হবে। যা ও চায় না, নীলিমা বা কেউ কোনরকম ওর বিষয়ে বিশেষ কিছু ভাববে, একটু দুঃখ পাওয়া বা ছলছল চোখে নিঃশ্বাস ফেলা বা ভয় পাওয়া, এসব কিছুই ও চায় না, যে কারণে একটা সার্থক বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যা কথা ও বলেছে। ও কয়েকবার জোরে জোরে কাশল, সিগারেটে টান দিয়ে তৎক্ষণাৎ ধোঁয়া ছাড়ল, ভিতরে নিতে পারল না, এবং হাসি হাসি ভাব করেই বলল, 'তা তো সত্যি, কী করে জানা যাবে। হঠাৎ মনে হল, অনেকদিন পরে, আজ একটু আসন করি।'

নীলিমা ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'খুব ভাল তো। তুমি এখন থেকে রোজ কর না কেন।'

ও দেখল, নীলিমার চোখে এমন একটা আলো ফুটে উঠেছে, যেন একটা নতুন আশার মত। নীলিমা কী ভাবছে, তা খানিকটা বুঝতে পারছে। নীলিমা ভাবছে, 'যাক, ও তাহলে আস্তে আস্তে নর্মাল হয়ে উঠছে,' যে কারণে নীলিমা ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল, 'খুব ভাল তো' অর্থাৎ 'এই তো চাই, এই তো আশার কথা, তুমি আবার আগের মত আসন করতে চাইছ। তার মানে, 'তুমি ভাল হয়ে উঠছ।' শুধু নীলিমা না, সবাই ভাবে, ও খুব অস্বাভাবিক। ও এমন একটা অবস্থায় আছে, কারোর সঙ্গেই মেলে না। সেইজন্যই, ও অস্বাভাবিক এবং আর সকলেই স্বাভাবিক। মানুষের এটাই বোধহয় সাধারণ নিয়ম, চিন্তা ভাবনার ছক। অবিশ্যি, এতে ওর কিছুই যাচ্ছে আসছে না, যাবে আসবেও না, তথাপি, নীলিমা এটা বুঝে নিয়েছে, ও একটা মার খাওয়া অসহায় পশুর মত অস্বাভাবিক, ও কামড়ে দেবে, না দাপাদাপি করবে, কিছুরই ঠিক নেই, ওকে কোন রকমেই বিশ্বাস করা যায় না। আর সবাই যেমন, একটা নিয়মের মধ্যে দিয়ে চলছে, যার যা কাজ আছে, কাজ করছে, খাচ্ছে, পরছে,

সিনেমা দেখছে, বেড়াতে যাচ্ছে, ঝগড়া বিবাদ করছে, প্রেম করছে. বা ঈর্ষায় ভুগছে, ও তার মধ্যে নেই। ও যদি আগের মত হয়ে যায় আবার, নীলিমার মত, সকলের মত, তাহলেই ভাল, যদি বা ওর নিজের কখনও এসব মনে হয় না। নীলিমার কাছে স্বাভাবিক জীবন হল, একটু পরেই সমীর আসবে বা টেলিফোন করবে, তার-পরে ওরা দুজনেই বাইরে কোথাও যাবে। বাইরে বাইরে ঘোরাঘুরি করা ছাড়া, কোথাও গিয়ে বসা কথা বলা ছাড়া, ওদের অন্য কোন বিশেষ জায়গা নেই। অবিশ্যি, একেবারে নেই তা বলা যায় না, সমীরের কোন কোন বন্ধু মেসে থাকে, বিবাহিত বন্ধুদের ফ্ল্যাটেও যেতে পারে বা সমীরের হাতে যদি টাকা থাকে, তবে কোন হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটাতে পারে। বন্ধুদের মেসের ঘর বা ফ্ল্যাটের থেকে হোটেলের ঘর অনেক সুবিধা, কোন অবলিগেশন নেই। এক যুবক, এক যুবতীর প্রাইভেসি বলে একটা জিনিস তো আছে। ওদের যদি প্রেম থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই একটা আলাদা ঘর থাকা দরকার। সেখানে শুধু তারা দুজনে একত্র হতে পারে। সমীরের এটা প্র্যাকটিস, নিয়মিত, প্রায় আট বছর ধরে, নীলিমার সঙ্গে কোথাও নিরিবিলিতে কয়েক ঘণ্টা কাটানো। নীলিমার বয়স এখন কত? ছাব্বিশ—হ্যাঁ, এই রকমই, এখন হয় তো নীলিমারই এটা প্র্যাকটিস, খাবার ঘণ্টা শোনা কয়েদীদের মত, ঠিক খাবারের সময় আ-তু-ডাক শোনা কুকুরের লালায় জিভ ভিজে ওঠার মত, সমীর নীলিমার একই অবস্থা।···কিন্তু না, এভাবে চুপ করে থাকা, আর একটা বাজে ব্যাপার, নীলিমা অবাক হতে পারে, কিংবা ভয়ও পেতে পারে, ও তো নীলিমার চোখে সমীরের মত স্বাভাবিক না, তা-ই মুখ তুলে, একটু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, এখন থেকে ভাবছি রোজই একটু আসন করব।'

নীলিমা জবাব দেওয়ার জন্য মুখ তুলে, ঠোঁট খুলবার আগেই, ঘরের বাইরে, কার যেন গলার শব্দ শোনা গেল। নীলিমা তৎক্ষণাৎ অন্যমনস্ক হয়ে উৎকর্ণ হল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, 'তোমার

চা-টা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছল, আর একবার করে নিয়ে আসি।' বলতে বলতে ঘরের বাইরে চলে গেল, একবার জিজ্ঞেস করল না, ওর আর চা চাই কী না। আসলে, গলার স্বরটা কার, সমীর এল না কি, এ চিন্তাটা নীলিমার মাথায় এমন বিঁধে আছে, আর কিছুই ভাবতেই পারছে না। চায়ের কথাটা একটা নিতান্ত ছলনা কী না, সেটাও ওর মাথায় নেই, 'অনেকদিন পরে আসন করছিলাম' এইরকম একটি নিটোল বিশ্বাসযোগ্য কথাই ও বলে গেল, এবং এক মিনিট যেতে না যেতেই আবার ফিরে এল, বলল, 'কাশীকে চায়ের জল চাপিয়ে দিতে বললাম।'

ও বলল, 'আর চা খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'কিন্তু চা তো তোমার খাওয়াই হল না।'

ওর মুখের মধ্যেটা ভিজে উঠে, একটা থুথুর দলা পাকিয়ে উঠছে। আশপাশে ফেলার জায়গা নেই তাই গিলে ফেলতে হল। সমীব নিশ্চয়ই আসেনি, তা-ই নীলিমা আবার চা খাওয়াতে চাইছে। কিন্তু সমস্ত মুখের ভিতরটা এমন বিশ্রী হয়ে আছে, একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাব, একটু আগেই ঠাণ্ডা চায়েরই স্বাদ, কিংবা নীলিমার চা খেতে বলার মতই মিষ্টি অথচ যা তেতোর চেয়েও কদর্য, যে কারণে ওর মুখে থুথু জমে উঠেছিল। নীলিমা কি সত্যি ওকে চা খাওয়াবার জন্য খুব ব্যস্ত অবিশ্যি, একটা অঘটনের কল্পনায় ভয়ে ও উত্তেজনায়, নীলিমা কেমন হয়ে গিয়েছিল, সেটা ভালবাসা নাকি। নাকি টুলুর কৌতুহলিত উত্তেজনার মতই, তারপরে ওকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে না দেখে একটা হতাশার মত। নীলিমা এত স্বাভাবিক—নীলিমারই মতে, ওকে বলা যায় না, এ ঘর থেকে এখন ও চলে যাক, চায়েব দবকার নেই, ওর এখন একলা থাকতে ইচ্ছা করছে। বলল. 'না, চা খাব না আর, সমীর আসবে নাকি।'

নীলিমা যেন আশা-ই করতে পারেনি, ও হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করবে। নীলিমা হঠাৎ যেন অবাক হল, তেমনি অস্বস্তির ভাবও দেখা দিল। এবং তারপরেই মুখের এমন একটা ভাব করল, যেন

সমীরের কথাটা ওর মনেই ছিল না। ঠোঁট উল্টে একটা নির্বিকার ভঙ্গি করে বলল, 'কী জানি, বলেনি তো কিছু' নীলিমা কি কখনও কখনও সমীরের সঙ্গেও এভাবে কথা বলে, কোন কথা লুকোবার জন্য এমন মিথ্যা অথচ বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে। বোধহয়, বলতে হয়। সব মানুষকেই এরকম ধরনের কথাবার্তা কিছু বলতে হয়, এরকম ভঙ্গি করতে হয়, অদরকারেই। সমীর আসবেই অথবা ডাকবেই, জেনেও, ও যেমন অদরকারেই জিজ্ঞেস করল, তেমনি অদরকারেই নীলিমা একটা নির্বিকার ভঙ্গি করল। এর মধ্যে আবার জানা-জানির কী আছে। তবু একটা কী আছে সব সময়ে, সব বিষয়ে, সোজাসুজি, সরাসরি হওয়া যায় না। টেলিফোন বেজে উঠল অন্য ঘরে। নীলিমা আবার অন্যমনস্ক হয়ে উঠল, কান পেতে আছে, বোঝা যাচ্ছে, কতক্ষণে কাশী টেলিফোনটা ধরে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রিং বন্ধ হল। কাশীর অস্পষ্ট গলা শোনা গেল এবং আবার কয়েক সেকেণ্ডের পরেই, কাশী এ ঘরের সামনে এসে বলল, 'দিদি, আপনার টেলিফোন।' 'কে' একথা জিজ্ঞেস না করেই, নীলিমা 'ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেল, আর কাশী তখনই আবার বলে উঠল, 'আপনার শাড়িগুলো সব ইস্তিরি করে দিইচি।' নীলিমা সেকথার কোন জবাব দিল না, কাশীকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। কাশীর সঙ্গে ওর একবার চোখাচোখি হল। কাশী চোখ নামিয়ে চলে গেল, অনেকটা টুলুর মতই কাশীর চোখে কৌতূহল, কিন্তু চোখে চোখ রাখতে চায় না। তা না রাখুক, কিন্তু, ওর হঠাৎ মনে হল, কাশী শাড়ি ইস্তিরির কথা বলল কেন। তার তো বলা উচিত ছিল, 'চায়ের জল ফুটে গেছে' কারণ নীলিমা দ্বিতীয়বার এ ঘরে এসে বলেছিল, কাশীকে চায়ের জল চাপাতে বলে এসেছে। বলেনি। নীলিমা আসলে, তাড়াতাড়ি সমীর এসেছে কী না জানবার জন্য ছুটে গিয়েছিল, আর একবার চা করে নিয়ে আসার কথা বলে। তারপরে ফিরে এসে, একটা কথার কথা বলে বলেছিল, 'কাশীকে চায়ের জল চাপাতে বলে এসেছি' এবং ও যদি বলত, চা খাবে, তাহলে নীলিমাকে

আবার ছুটতে হত। প্রথমে নীলিমা কেন চা নিয়ে এসেছিল, প্রায়ই বিকেলের চা, সকালের চা কেন নিয়ে আসে। কাশীই তো আনতে পারে, কাশী চাকর, তবু নীলিমা নিয়ে আসে, তার কারণ বোধহয়, মন ছাড়া জন্তুর মত, ভাল কথায় হৃদয়হীন করুণা। 'আহা, ওকে চা-টা না হয় আমিই দিয়ে আসব, একটু চা দিয়ে আসা ছাড়া তো কিছু নয়, তাতে মনটা একটু ভাল থাকবে, একটু ভাল লাগবে' এই-রকম একটা ভাব, যেটার সঙ্গে মন বা ইচ্ছার কোন যোগাযোগই নেই, নিজের মন থেকে একটা যুক্তি তৈরি করে নেওয়া, একটা স্বভাব মায়া মমতা দেখানো। ও অবিশ্যি জানে না, সব মেয়েরই এরকম একটা করুণাময়ী সাজবার ইচ্ছা থাকে কী না, ও অনেকেরই এরকম দেখেছে। তখন ওদের গলার স্বর পর্যন্ত বদলে যায়, যেন মনে মনে একটা ভারী তৃপ্তি বোধ করে। হয়ত, এটাই স্বাভাবিক, যদি বা সংসারে করুণাময়ী যাদের বলে, তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। ও তা ভাবে না, কিন্তু তারা সম্ভবত নীলিমাদের মত না। তারা কেমন, কে জানে, এবং শুধু শুধু কেউ কেন করুণাময়ী হবে, কাকেই বা সে করুণা দেখাবে বা করতে চায়, তা ও বোঝে না। এটাই হয়ত স্বাভাবিক, যেমন নীলিমা ওর জীবনের সমস্ত ব্যাপারটাকে, প্রতি-দিনটাকে খুব স্বাভাবিক মনে করছে, বা কিছুই করছে, সবই, এবং এখন এই টেলিফোনের পরে, নিশ্চয়ই সাজতে গুজতে আরম্ভ করেছে। ও যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, সিল্ক বা সিনথেটিক, যা হোক একটা শাড়ি জামা নীলিমা বেছে নিচ্ছে পরবার জন্য, কারণ কুঁচকে যায়, দলা মোচড়ার দাগ থাকে, এমন শাড়ি জামা পরবে না এখন, সমীরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে তো তা-ই। ওদের প্রেম, ওদের ভালবাসাবাসি আছে। তাই, ওরা এখন গিয়ে কোথাও নিরি-বিলি একটা ঘরে দেখা করবে, ভালবাসাবাসি করবে, তাতে জামা-কাপড় দলে মুচড়ে যেতে পারে। এখন কীভাবে নীলিমা আর সমীর স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস করে, ও জানে না—অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণকে চালিয়ে নিয়ে যায়। সমীর তো আবার ওরও বন্ধু, নীলিমা ওর

বোন, বছর দুয়েকের ছোট হবে হয়ত। সমীরের কাছ থেকেই প্রথম ও শুনেছিল, মেয়েদের সঙ্গে মিশতে হলে, 'পিরিয়ড' ব্যাপারটা কী। সমীর বলেছিল, আঠার উনিশ বছর বয়সেই পিরিয়ড মেইণ্টেন বিষয়টা ওর বৌদির কাছে নাকি শিখেছিল, আর ওকেও বুঝিয়ে দিয়েছিল, যদিবা বৌদির সঙ্গে সমীরের কোনরকম শরীরের সম্পর্ক ছিল না বলেই বলেছিল, নিতান্ত বন্ধু হিসাবেই, বৌদি ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়েছিল এবং একথা স্বীকার করতেই হবে, সমীর এ বিষয়ে হানড্রেড পার্সেণ্ট সাকসেসফুল। সমীরের একটা অহঙ্কার, ও কখনও কোনরকম কণ্ট্রাসেপটিভ বা কন্ ব্যবহার করেনি; অথচ আজ পর্যন্ত নীলিমার একবারও কন্‌সেপশন হয়নি। সমীর নীলিমার এরকম সম্পর্কের কথা অবিশ্যি সমীর কোনদিন তাকে বলেনি। কিন্তু এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না, সমীর নীলিমার সম্পর্ক কী। সমীরের কথা শুনলেই বোঝা যায়, সেকস্ ওর কাছে খুব সহজ আর স্বাভাবিক ব্যাপার, এবং এটাকে বাদ দিয়ে ও চলে না, চলতে চায় না। সমীরের অভিজ্ঞতা, আর রোজ—প্রায রোজ-ই বলতে হবে, সন্ধ্যার একটা সময়ে নীলিমার সঙ্গে নিরিবিলিতে কোথাও দেখা করা, ব্যাপারটা খুব সোজা, একটা স্বভাবগত অভ্যাসের মত। সারাদিন ওদের দেখা হয় না, এখন হবে, নিশ্চয়ই একথা সত্যি না, রোজ রোজ সন্ধ্যাবলার জন্যই ওরা দুজনে বেঁচে থাকে। দুজনে কেন এখনও বিয়ে করছে না, কে জানে, কার দিকে বাধা, বা কোন বাধা সত্যি আছে কীনা, তাও ও জানে না। সমীর তো এখন যা হোক, মোটামুটি একটা ভাল চাকরিই করে, আর সকলেই জানে, এটা একটা 'ঘোষিত' ব্যাপার, সমীর-নীলিমার বিয়ে হবে। কিন্তু আট বছর তো হল, কারোরই যেন কোন মাথাব্যথা নেই, মায়ের না, বাবার না, টুলু—টুলুর আর কী-ই বা মাথাব্যথা থাকতে পারে দিদির বিয়ের ব্যাপারে। টুলু নকশালাইট, কথাটা এরকমভাবেই সবাই বলে। নকশাল বাড়ির কৃষক বিদ্রোহের থেকে এর জন্ম, যারা সাংবিধানিক কোন আন্দোলন, নির্বাচন ইত্যাদিতে

আস্থা রাখে না, 'রাইফেল-ই শক্তির উৎস' 'কৃষক বিপ্লবই মুক্তির পথ' ওদের শ্লোগান।

পাঁচ বছরের মধ্যে, অনেক কিছুই ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। খবরের কাগজে কিছু কিছু খবর ও জানতে পেরেছে, কয়েকদিন হল, চোখের সামনে সমস্ত কিছু দেখছে, দেখছে, কিন্তু আগের মত, সমস্ত কিছুর সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। টুলু নিজে কিছুই বলেনি, নীলিমা বলেছে, টুলু আজকাল নকশালবাড়ি করছে। টুলুর এখন ডিগ্রি কোর্স-এর প্রথম বছর, কলেজে ওদের দল নাকি বেশ ভারী, নীলিমা বলেছে। টুলুর স্বাস্থ্যটা খুব সুন্দর হয়েছে, দেখতেও বেশ সুন্দর হয়েছে। বোধহয় দু-একবার গোঁফ-দাড়ি কামাবার পর, আর কামায়নি, নরম পাতলা ছোট একটু লালছে গোঁফ-দাড়িতে, টুলুকে বেশ দেখায়। ওর মত এখনও, এতটা ঘন গোঁফ-দাড়ি হয়নি, হলে টুলুকে কেমন দেখাবে, কে জানে, নীলিমা বলেছে, 'টুলু ওর চেহারাটা চেগুয়েভারা না করে ছাড়বে না।' ও এখনও চেগুয়েভারা সম্পর্কে কিছুই জানে না, কিছুই পড়েনি, পাঁচ বছর আগে নামটা শুনেছে বলে মনে পড়ে না। কাস্ত্রোর নামটা ওর জানা আছে, নামের থেকে বেশি কিছুই জানা আছে। অবিশ্যি নীলিমা বিদ্রূপ করে কিছু বলেনি। যেন ভালবেসে, একটু স্নেহ করে হেসেই বলেছিল। যাই হোক, টুলুকে দেখে ওর খুব ভাল লেগেছিল। টুলুও তা হলে রাজনীতি করছে। টুলু এখন নকশালাইট, কিন্তু ওর সঙ্গে টুলু যেন ঠিক সহজভাবে কথা বলতে পারে না। পারে না, বা চায় না, সেটা এখনও ঠিক করে বলা যায় না। পাঁচ বছর পরে, ও যখন প্রথম টুলুকে দেখল, এই তো কয়েকদিন আগে, বাবা মা নীলিমা, সকলের সঙ্গে কথা বলার পর, টুলু আর ও যখন ঘরে একলা, তখন জিজ্ঞেস করল, 'কীরে টুলু কেমন আছিস।'

টুলু ওর দিকে সোজাসুজি চোখ তুলে তাকাতে চাইছিল না যেন, অথচ একটা কৌতূহল ছিল, তা-ই বারে বারে-ই চোখ তুলে ওকে দেখছিল। যেন অচেনা অদ্ভুত কাউকে দেখছে।

ও যখন জিজ্ঞেস করল, তখন টুলু মুখটা নিচু করে জবাব দিল, 'ভাল'।

টুলুর ভাব-ভঙ্গি দেখে, ওর মনটা কেমন যেন একটু সিঁটিয়ে সিঁটিযে যাচ্ছিল। টুলুর বোধহয় ওকে ভাল লাগছে না, তা-ই জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে বোধহয় তোর ভাল লাগছে না, না ?'

টুলু যেন একটু লজ্জা পেল, ওর ফরসা মুখের রঙটা একটু লালচে হল, একবার চোখ তুলে তাকাল এবং হাসল, বলল, 'বাহ ভাল লাগবে না কেন।'

'কথা বলছিস না।'

'কী বলব।'

টুলুর যে অস্বস্তি হচ্ছে, বোঝা গেল। ও কথার প্রসঙ্গ বদলাল, 'তুই তা হলে এখন কলেজে পড়ছিস। এটা তো—।'

'ফার্স্ট ইয়ার, পার্ট ওয়ান দিয়েছি, রেজাল্ট বেরবে।'

'সায়ান্স ?'

'কেমেস্ট্রি—অনার্স।'

সেই সময়েই মেয়েটি এল, কী যেন নাম, নীলিমা বলেছিল নামটা, এখন মনে পড়ছে না। দেখতে তেমন ভাল না, কিন্তু সব মিলিয়ে দেখতে বেশ ভালই লাগল, টুলুর সমবয়সীই হবে, কিংবা এক আধ বছরের কম বেশি। খুব বড় করে কাঁধ কাটা, স্লিভ্‌লেস্ জামা, পেটের সবটাই প্রায় খোলা, একেবারে নাভির নিচে শায়া শাড়ির বন্ধনী, কচি আম পাতার মত শ্যামলা শ্যামলা রঙ, আবাঁধা খোলা রুক্ষু চুল, কিছু নেই হাতে ঘড়ি ছাড়া। চোখ মুখ এমন কিছুই না, ভেঙে ভেঙে আলাদা করে বলার মত অথচ সব মিলিয়ে, বাসন্তী রঙের জামা কাপড়ে হাতের ব্যাগের দোলানিতে হাসিতে, একটা ঝলক আছে। এসেই ডাক দিল, 'এই টুলু, যাবে না ?' টুলু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'হ্যাঁ চল। ওরা কোথায়।' 'বাইরে আছে।' মেয়েটির দৃষ্টি তখন ওর ওপর পড়েছে, একটা আলগা আলগা কৌতুহল মেয়েটির চোখে, কিন্তু টুলু কোনরকম আলাপ করিয়ে দিল না

বা ওর সঙ্গে আর কোন কথাই বলল না, তবু যেন কয়েক সেকেণ্ডের জন্য টুলুকে কী রকম একটু অসাব্যস্ত মনে হল, তারপরে পিছন ফিরে বলল, 'চল।' ও চুপ করে বসে রইল, ওরা বেরিয়ে গেল, কিন্তু ওর ভিতরটা যেন হঠাৎ আলো নিভিয়ে দেবার মত অন্ধকার হয়ে গেল।…'কাশী আমি বেরচ্ছি, মাকে বলো।' নীলিমার গলার স্বর শোনা গেল। নীলিমা বেরিয়ে যাচ্ছে, সমীরের কাছে যাচ্ছে।

॥ ৪ ॥

কিন্তু ওর চোখে এখনও টুলুর সেই চলে যাওয়ার ছবিটাই ভাসছে, এবং এখনও ওর ভিতরটা যেন সেইরকমই অন্ধকার হয়ে আসছে। টুলুর কাছে, ও যেন অচেনা অদ্ভুত একটা লোক। টুলু যেন ভুলেই গিয়েছে বা জানেই না যে, এ লোকটা ওর দাদা। কাছাকাছি হলেই এমন ভাবে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। পরিষ্কার বোঝা যায়, কথা বলতে চায় না, চোখাচোখি করতে চায় না। চোখে চোখ পড়লেই, চোখ সরিয়ে নেয়, যেন দেখতে পায়নি, অথচ টুলু তো ওর পিঠোপিঠি ভাই না, অনেক ছোট, প্রায় দশ বছরের, যে কারণে, ছেলেবেলায় টুলুর সঙ্গে, খাবার বা খেলনা নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি কাঁদাকাঁদি খুনসুটি করতে হয়নি, বরং অনেক ছোট বলে, ও ঠিক দাদার মত ওকে ভালবেসেছে, কোলে করেছে, আদর করেছে, টফি খেলনা এনে দিয়েছে। টুলু অনেক ছোট, তা-ই টুলু যদি ওর সঙ্গে, এই রকম ব্যবহার করে, দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া, অচেনা ভাব, যেন ও দাদা নয় আর কেউ, অন্য একটা লোক, তা হলে টুলুকে কাছে ডেকে সোজাসুজি কিছু বলা যায় না, অর্থাৎ কোন বিষয় পরিষ্কার করে, আলোচনা করা যায় না, যেটা দরকার হলে নীলিমার সঙ্গে সম্ভব। অবিশ্যি কে জানে, নীলিমা যদি এই রকম করত, তা হলে সোজাসুজি কথা বা আলোচনা করা যেত কী না। নীলিমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, ছাব্বিশ, এবং নীলিমা একজন মেয়ে, তা-ই ভিতরে যাই থাক, সে কথা না

বলে পারে না, কিন্তু ও জানে, কথা, নিতান্তই কথার কথা, নীলিমাও ওর কাছাকাছি নেই, কোন যোগাযোগ নেই, অনেক দূরে বিচ্ছিন্ন এবং অচেনা-ই, তবু নীলিমা কথা বলে, চা দিতে আসে, একটা স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে চায়। টুলু ছেলে, আঠার বছর বয়স, সহজ অথচ শক্ত যার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না, সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই আড়ষ্ট, আপন হওয়ার বা ঘনিষ্ঠ হওয়ার মেকি চেষ্টা নেই। টুলু যে ওর উপর রেগে আছে, এমন মনে হয় না বা কোনরকম বিদ্বেষে যে কাছে আসতে চায় না, কথা বলতে চায় না, তাও না। ওকে টুলু কিছুই বোঝে না, ওর কথা টুলু ভাবে না, ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন না, কেবল মাত্র সামনে এলে, দেখা হলেই ওর কথা মনে পড়ে যায়, বা বাড়িতে কেউ ওর কথা বললে, কিংবা বাইরে ওর সম্পর্কে কোন আলোচনা হলে, ওর কথা টুলুর মনে পড়ে এবং মুহূর্তে টুলু হয় তো কিছু ভাবে। তা ছাড়া, ও টুলুর জগতে নেই। পাড়ায় টুলুদের কয়েকজনের একটা দল আছে। পাড়ার স্টেশনারি দোকানের পাশে, একটা বাড়ির রকে মাঝে মাঝে ওরা আড্ডা দেয়। এর মধ্যে দু দিন, বিকালের দিকে বাড়ি থেকে বেরোবার পথে, ও টুলুদের দেখেছে। ওকে দেখলেই টুলু আর টুলুর বন্ধুরা কথা থামিয়ে দেয়, চুপ করে থাকে এবং টুলু চোখ নামিয়ে নেয়, বাকীরা ওর দিকে হা করে চেয়ে থাকে। এমন ভাবে চেয়ে থাকে যে, ও আর তাকাতে পারে না, তাড়াতাড়ি চলে যায়, পাড়ারই ছেলে সব, মুখ সকলেরই প্রায় চেনা, পাঁচ বছরের মধ্যে, হয়ত দু একটি নতুন মুখ এসেছে, নতুন ভাড়াটেরা এসেছে, তাছাড়া প্রায় সব মুখই চেনা, ভাল করে তাকিয়ে দেখলে হয়ত নামগুলো মনে পড়ে যাবে। ওরা টুলুর মত চোখ সরিয়ে নেয় না, বরং একটা কৌতূহলের সঙ্গে, ঠোঁটের কোণ যেন বেঁকে থাকে, বিদ্রূপের ভাব। অথবা বিদ্রূপ না, রাগে কট কট করে চেয়ে থাকে, হয়ত, বলে, 'শালা, একখানি চিজ'। ও চলে যাওয়ার পরে, নিশ্চয়ই টুলুর বন্ধুরা ওর সম্পর্কে কথা বলেছে, টুলুকে হয়ত কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, জবাবে

টুলু কী বলেছে, কে জানে। টুলুর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, কিছু বলতে চায় না, বিরক্ত হয়, এড়িয়ে যেতে চায়, হয়ত এইটুকু বলে, 'ওর বিষয়ে আমি কিছু জানি না, আমাকে জিজ্ঞেস করিস না।' কিন্তু সেই মেয়েটি, টুলুর সেই বন্ধু, যে, প্রথম দিন এসে টুলুকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, এবং ওর দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল, যেন অদ্ভুত কিছু দেখছে। মেয়েটি যেন ওকে দেখতেই চেয়েছিল, তার মানে, নিশ্চয়ই কিছু শুনেছিল টুলুর কাছে। প্রথম দিন যেমন একটা অচেনা আলগা আলগা কৌতুহল ছিল, পরশু দিন তা ছিল না। পরশু দিন, একটা বিশেষ কৌতুহল নিয়েই যেন ওকে দেখতে এসে-ছিল। মেয়েটির চাউনি দেখে, তা-ই মনে হয়েছিল। টুলু কী বলে-ছিল ওর বন্ধুকে, কীভাবে বলেছিল, কে জানে। তবে এটা ঠিক, টুলু ওকে দেখলে, শুধু একটা কথাই ভাবে। একটা বিষয় একটা ঘটনাই টুলুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যে ঘটনার সঙ্গে টুলুর জীবনের বা মনের কোন যোগাযোগ নেই। অনেক দূরের থেকে ছাখে এবং সম্ভবত একটা বিতৃষ্ণা বোধ করে, এবং ওর চারপাশে যারা আসে, সকলেরই মনের ভাব কম বেশি টুলুর মতই। এ কথা, মনে হলেই ওর ভিতরটা, আলো নিভিয়ে দেওয়ার মত, অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে, অন্ধকার-অন্ধকার যে-অন্ধকার ওকে কিছুক্ষণ আগে, কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল, নিজেও মনে করতে পারেনা। কেবল নিজেকে দেখেছিল, দেওয়ালের গায়, সমস্ত জামা কাপড় খুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর একবার ওর শিরদাঁড়ার কাছে যেন কেমন শিরশির করে উঠল, 'আমি পাগল হতে চাই না, কী জঘন্য'। ···বিকালে মহেন্দ্রদা তখন ওকে দেখল অথচ যেন দেখতে পেল না, বা চিনতে পারল না। ও ভেবেছিল, মহেন্দ্রদা হয়ত ওকে ডাকবে, ও তো মহেন্দ্রদার খুব বিশ্বাসী আর প্রিয় ছিল, পার্টির সমস্ত কাজেই, ওর ডাক পড়ত, এমন কি সেই পার্টি যখন দুটো হয় নি, এখন যেমন যেমন হয়েছে সেই তখন, ও যখন ক্লাস ফাইভ-এ পড়ত, পার্টি যখন বে-আইনী হয়ে গিয়েছিল, মহেন্দ্রদা যখন

আণ্ডার গ্রাউণ্ডে, ওর এগার বছর বয়সে, তখনও ও কয়েকবার খবরাখবরের কাজ করেছে। ওকে কেউ সন্দেহই করেনি। আজ বিকালে ও ভেবেছিল, মহেন্দ্রদা, ভারিক্কি গম্ভীর ভাবে, এমন কি শাসনের ভঙ্গিতে যা বিদ্রূপ করেও দু-চারটে কথা বলবে, সেটাকে ও খুব স্বাভাবিক মনে করত, নিশ্চয় প্রতিবাদ করত না, মাথা নিচু করেই থাকত। কিন্তু মহেন্দ্রদা ওকে দেখল, কথা বলতে বলতে তাকিয়ে রইল, আসলে গোঁফ দাড়ির জন্য, প্রথমটা বোধহয় চিনতে পারেনি। যখন চিনতে পারল, তখন অনায়াসে চোখ সরিয়ে নিল, কেমন যেন চালাকি চালাকি ভাব, যেটা মহেন্দ্রদার সম্পর্কে ভাবা যায় না, কারণ ওর সঙ্গে এইটুকু চালাকির কী প্রয়োজন। মহেন্দ্রদা, মহেন্দ্রদা-ই, ও তো একটা তুচ্ছ জেলে সেই তুলনায়। আসলে, মহেন্দ্রদা, স্থির করে উঠতে পারেনি, ওর সঙ্গে কথা বলা উচিত কী না, কেন না, কথা বললে যদি কেউ কিছু মনে করে, যদি সমালোচনা করে। কারণ মহেন্দ্রদা তো একজন নেতা, সাধারণ মানুষের ইচ্ছা তাকে মেনে চলতে হয়, বা সাধারণ মানুষের কথা সব সময় মনে রেখে সব কাজ করতে হয়। সেইজন্যই বোধহয় আশীষের দিকে একবার মহেন্দ্রদা তাকিয়েছিল, যদি আশীষ ওকে দেখতে পায়, তা হলে কী ঘটে, তা দেখবার জন্য। আশীষ কথা বলে কী না, বা মুখ ঘুরিয়ে নেয় কী না, তবু আশীষ একজন সাধারণ কর্মী, তার দায়িত্ব কম, কিন্তু মহেন্দ্রদা নিজে সে দায়িত্ব নিতে চায় নি, যা হয়, তা আশীষের ওপর দিয়েই হয়ে যাক, অর্থাৎ আশীষ যদি ওকে দেখে কথা বলত, তা হলে মহেন্দ্রদাও বলত, না বললে, মহেন্দ্রদাও না। মহেন্দ্রদা লোক খারাপ না, বরং অনেক বেশি ভাল, আজ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কেউ একটি বাজে কথা বলতে পারেনি। এ অঞ্চলে, মহেন্দ্রদা পার্টির সব থেকে পুরনো মানুষ, ব্রিটিশ আমলে, পার্টি যখন নিষিদ্ধ ছিল, তখন থেকে পার্টিকে তৈরি করেছে এ অঞ্চলে, বিয়ে করেনি, পঞ্চাশ বছর পার করে একটি মাত্র নেশা করতে শিখেছে, সিগারেট। এ অঞ্চলে ছাত্রদের

একচ্ছত্র নেতা ছিল মধ্যবিত্তদের সকলেব প্রিয়, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও সক্রিয় অবাঙালী শ্রমিকদের 'মাহীন্দর দাদা', এখন কী বকম আছে, কারণ সাতষট্টিব নির্বাচনেও মহেন্দ্রদা একশ তিন ভোটে জিতেছিল। তখনই কাগজ পড়ে, ও জানতে পেরেছিল, মহেন্দ্রদা সি পি আই এম অর্থাৎ মার্কসিস্ট পার্টির নেতা। সি পি আই দাঁড় করিয়েছিল শক্তিদাকে, যেন ভাবাই যায় না, মহেন্দ্রদা, শক্তিদা, যারা একই পার্টির মধ্যে ছিল, তারা ভাগাভাগি হয়ে গিয়ে, আবার নির্বাচনে লড়াই করবে। কংগ্রেসের ছিল দিগিন্দ্র পাল, একজন ব্যবসায়ী, ত্রি-মুখী অভিযানে, মহেন্দ্রদা-ই জিতেছিল এবং সম্ভবত: মাত্র একশ তিন ভোটে জেতার কারণ, নিজেদের ভোট ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল, হিসাবে দ্বিতীয় স্থান ছিল কংগ্রেসের। শক্তিদার সব থেকে কম। আর টুলু এখন নকশালাইট, এদের কারোর সঙ্গেই ওরা নেই, সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের কথা ওরা বলছে, এবং আবার নির্বাচন আসছে, যে নির্বাচনকে ওরা বয়কট করার কথা বলছে। ওরা ছাড়া, সবাই নির্বাচনের পক্ষে, আব ধর্মবীর এখন দেশের একচ্ছত্র অধিপতি। সাতষট্টির যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করে, রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজের শাসন কায়েম করেছেন, গভর্নর ধর্মবীর তাঁর প্রতিনিধি, ধর্মবীব আসলে ধর্মবীর তো আসল সংস্কৃত উচ্চারণ, তথাপি ধরমবীর কেন, ও বোঝে না, বাংলায় ব্রহ্মনারায়ণকে : গ্রাম্য উচ্চারণে বেহ্মনারায়ণ বলাব মতই লাগে। যাই হোক, ছবি-টবি দেখে, ভদ্রলোককে ওর খুব অদ্ভুত লাগে, অনেকটা যেন স্পাই স্টোরির নায়কের মত। না, ঠিক স্পাই স্টোরি বলা যাবে না, একজন লড়িয়ে ডুবুরির মত, গভীর জলের তলায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে এক এক প্রস্থ লড়ে, আবাব ভেসে উঠছেন, শ্রান্ত অবসন্ন, কিন্তু খানিকটা দম নিয়ে, একটা ধারালো ছুরি মুখে নিয়ে আবার ডুব, আবার লড়াই-লড়াই-লড়াই, আবার ভেসে ওঠা, অথচ ভেসে থাকবার উপায় নেই, যোদ্ধা যুদ্ধে লিপ্ত। কেন যে ওর এরকম মনে হয়, ও তা জানে না, এবং ধরমবীরের ছবি দেখলে, মনে হয়, গভীর

জলের তলায় একটা কী রকম রহস্যের ছাপ, ভদ্রলোকের মুখে লেগে রয়েছে।

এ সবই ওর কাছে নতুন, গভর্নর একচ্ছত্র, রাষ্ট্রপতির শাসন, অজয় মুখার্জির কংগ্রেস ত্যাগ, প্রফুল্ল ঘোষ কয়েক সপ্তাহের চীফ মিনিস্টার, আর পার্লামেন্টের চেহারাটা কী রকম অদ্ভুত বদলে গিয়েছে, সেখানে জনসঙ্ঘের এখন সেকেণ্ড মেজরিটি। তারপরেই কমিউনিস্ট। কংগ্রেস কি গন উইথ দ্য উইণ্ড-এর দিকে না কি, সেই-রকমই তো মনে হচ্ছে। জনসঙ্ঘের কথা মনে হলেই, ওর চোখের সামনে, বড় বড় গোঁফওয়ালা কর্নেল মেজর ক্যাপটেনদের ছবি ভেসে ওঠে। শেষটায় হয়ত দেখা যাবে, সারা ভারতবর্ষে জনসঙ্ঘ কমিউনিস্ট মুখোমুখি, বাদবাকিরা সব দুয়ের মধ্যে মিশে গিয়েছে, এবং মহেন্দ্রদা কি কখনও নেতা থাকবে, যে কারণে মহেন্দ্রদা এত ভাল মানুষ, এবং সতর্ক, সামান্য কোন রকম বিরুদ্ধ সমালোচনাকেই এড়িয়ে চলতে চায়। স্বাভাবিক। কিন্তু ও তো পার্টিগত কোন কারণে অপরাধ করেনি, পার্টির মেম্বারও ছিল না, তথাপি মহেন্দ্রদা ওর সঙ্গে কথা বলেনি, আসলে, সকলেই নিজের বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত, যদি বা সকলেই সকলের সঙ্গে আছে, তথাপি সকলেই আলাদা, নিজের নিজের ব্যাপারগুলো নিয়ে, সবাই যেন লড়তে ব্যস্ত, যে ভাবেই হোক, মহেন্দ্রদাও তা-ই কিন্তু তখনই ওর ভিতরে যেন অন্ধকার ছেয়ে আসছিল, মনে হয়েছিল ও আর এগিয়ে যে‌তে পারবে না, পা দুটো যেন কেউ টেনে ধরেছে। তবু ও থেমে থাকতে পারে নি, বরং আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একটা কষ্ট আর ভয় যেন ওকে চেপে ধরেছিল, এবং অনেকদিনের পুরনো অস্পষ্ট ঘটনা মনে পড়ছিল। তখনও বিকালের রোদ রাস্তায়, গাছের মাথায়, আর ছায়াগুলো লম্বা লম্বা, লোকজনের ভিড় মন্দ না, তা সত্ত্বেও শালিক কাকগুলো প্রায় মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছিল। ও কারোর দিকেই ফিরে তাকাচ্ছিল না, কেবল একটা কথাই মনে মনে বলছিল, 'কী করব, বুঝতে পারছি না।' অথচ মনে হচ্ছিল, আসল

ব্যাপারটাই বাকি থেকে যাচ্ছে, যা করবার, যা করতে হবে, তার বেশি এসব কিছুই না, এই মহেন্দ্রদা, টুলু, নীলিমা, এ সবই হয়ত আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

এই সময়েই ওর চোখে পড়েছিল নন্দিতাকে ফলের দোকানের সামনে। এক নজরেই চিনতে পেরেছিল, যদি বা, নন্দিতা অনেক মোটা হয়ে গিয়েছে। যে ঝোঁকটা নীলিমার আছে, নন্দিতা তাই পুরোপুরি হয়ে গিয়েছে। নন্দিতাও লম্বায় নীলিমার মতই প্রায়, তার জন্যে রীতিমত বেঢপ তার ওপরের বুক দুটোকে এত ঠেলে তুলেছে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক না অর্থাৎ অনেক বড় মোটা আর গড়িয়ে পড়া বুক, অত্যন্ত শক্ত করে বাঁধতে হয়েছে বিয়াল্লিশকে ছত্রিশ দিয়ে বাঁধার মত, পিঠটা কি নন্দিতার কেটে যাচ্ছিল না। অবিশ্যি নন্দিতাকে থলথলে মোটা দেখাচ্ছিল না, যেন বেশ শক্ত পেটা পেটা, তা-ই মোটার ওপরেই ও যেন বেশ সহজ আর হালকা, শরীরটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে, প্রকাণ্ড কোমরটাও দুলছিল, যেন নন্দিতা খেলছিল আর সামনের দিকে, পেস্তা বাদাম ইত্যাদির বড় বড় জাবের গায়ে, ওর তলপেটে নিচেটা তালে তালে লাগছিল এবং সুতোয় ঝোলানো, সুন্দর পুষ্ট লাল আপেল, প্রায় ওর বুকের কাছেই দুলছিল, যা প্রায় ভাবাই যায় না। নন্দিতা যে সারা শরীরটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে যেন হাই বেঞ্চের সামনে ইস্কুলের মেয়েরা দুলে দুলে পড়া বলে সেইরকম করে হেসে হেসে কথা বলছিল, তাতে ওকে কী রকম দেখাচ্ছে, একবারও কি ভাবছিল না। অবিশ্যি ভাববেই যদি ওরকম করবে কেন, ওটা একটা পা দোলানো অভ্যাসের মত। রাস্তার লোকদের চোখেও যে ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত ঠেকছে, তা মনে হচ্ছিল না। খোঁপাটা নন্দিতার মস্ত বড় মাঝখানে সিঁথেয় সিঁদুর তাতে খুব আশ্চর্যের কিছু না, এতদিন সিঁদুর যা পরা থাকলেই আশ্চর্য হতে হত। নন্দিতার খাঁটি বিয়ের জল লেগেছে যেন। কালো রঙের খাটো পেট খোলা জামা, সোনালি ডোরাকাটা লাল পাড় শাড়ি, মুখ চোখ মন্দ না, তবে মোটা ঠোঁটের কোণ দুটো ওর বরাবরই শক্ত

ভিতরে ভিতরে ওর যে একটা জেদ আছে, ঠোঁটের দু'পাশের শক্ত ভাঁজ দেখলে তাই মনে হয়। মাঝে মাঝে নন্দিতা এদিকে ওদিকেও মুখ ফেরাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল, ওর পাশে যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না। তারপরে হঠাৎ নন্দিতা ঝুঁকে পড়ে কলার ছড়ায় হাত দিয়েছিল, সেই সময়েই ধীরেনবাবুকে ও দেখতে পেয়েছিল। প্রায় নন্দিতার মতই মাথায়, নন্দিতার তিন ভাগের এক ভাগ প্রস্থে। ধীরেনবাবুর কোলে একটি রোগাটে ছেলে, ধীরেনবাবুর ধাঁচেই, তার মানে নন্দিতার স্বামী এবং পুত্র। ধীরেন-বাবু ইস্কুল মাস্টার, নন্দিতার সঙ্গে নাকি ভদ্রলোকের প্রেম, এরকম একটা কথাও অনেকদিন আগে শুনেছিল। আজ তো সামনা-সামনি দেখেছিল, এবং তখনই ওর মনে পড়ে গিয়েছিল নন্দিতারই বন্ধু সুমতি একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল 'নন্দিতা আর ধীরেনবাবু' ভাবলেই মনে হয়, ক্যানাডিয়ান এঞ্জিনের বাঙালী ড্রাইভার সুমতি এরকম অদ্ভুত মজার মজার কথা বলতে পারত। বাঙালী ড্রাইভার বলতে রোগা আর ছোটখাটো পুরুষই বোঝাতে চেয়েছিল এবং আরও কিছু বোঝাতে চেয়েছিল, আরও অনেক কথা বলেছিল, বিশেষ করে ওকেই. কারণ—না, সে সব কথা ভাবতে ভাল লাগছিল না। নন্দিতা, সুমতি, ও এবং আরও অনেকে ওরা সমবয়সী ছিল। ও ভেবেছিল নন্দিতা ওকে দেখতে পাবে না; হয়ত। ও ''চে কথা বলতে যাবে কী না। বুঝতে পারছিল না, যদি বা একটা ভয় এবং অস্পষ্টতা ছিলই, তবু ইচ্ছা করছিল, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর মনে হয়েছিল, নন্দিতা চোখের কোণ দিয়ে ওকেই যেন দেখছে। ও দাঁড়াবে কী না ভাবছিল, নন্দিতা ব্যাগ থেকে পয়সা বের করছিল, ও আস্তে আস্তে চলছিল, দাঁড়াতে পারছিল না, নন্দিতা ঘাড় না ফিরিয়েই, তখনও দেখছিল চোখের কোণ দিয়ে। প্রথমে বাঁ দিক থেকে, তার-পরে ডান দিক থেকে। আর কিছু বোঝবার ছিল না, ও চলা না থামিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, যেন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে ও দেখছিল, সতের বছরের নন্দিতা

ওর সামনে একেবারে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে, ওকে জিভ ভেংচে দিচ্ছে।

॥ ৫ ॥

এই নন্দিতা, সেই নন্দিতা, ঠিক যেন মহেন্দ্রদার মতই মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিল—না, মহেন্দ্রদার মত মুখ ফিরিয়ে নেয় নি, চকিতে ওকে দেখে নিয়েছিল, কখন, ও তা ভাল করে টেরই পায় নি। কিন্তু নন্দিতার চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে থাকা দেখেই ও বুঝতে পেরেছিল। নন্দিতা দেখতে পেয়েছে, তবে মহেন্দ্রদার মত অনায়াসে না দেখতে পাওয়া বা না চিনতে পারার ভঙ্গিতে, চোখ তুলে নিতে পারে নি। নন্দিতার মুখটা শক্ত হয়ে উঠেছিল, ঠোঁটের কোণ দুটো টেপা আর শক্ত হয়ে উঠেছিল। ভাবটা যে রাগের বা ঘৃণার, তা না, বরং যেন আক্রান্ত হওয়ার আগেই, একটা ঘাড় বাঁকানো সাবধানতা, একটা পশু লড়বার আগে যেমন মাথা নুইয়ে, শিং তাক করে। ধুলায় পা ঘষে, আসলে সেটা একটা ভয়ের এবং বাধা দেবারই ভাব। সেইরকম। নন্দিতা যেন মনে মনে বলছিল, 'সর্বনাশ, সেই ভয়ঙ্করটা, কিন্তু ওকে আমি চিনি না, চিনতে চাই না, আমার সঙ্গে যদি কথা বলতে আসে। তাহলে আমি যাচ্ছেতাই, অপমান করব।'… নন্দিতার মুখের পাশ, চোখের কোণের চাউনি দেখেই মনের ভাবটা বুঝতে পেরেছিল। আর ওর ভিতরটা অন্ধকার হয়ে এসেছিল এবং সেই অন্ধকারে, সতের বছরের নন্দিতার সেই চেহারাটাই, প্রথমে ওর চোখে ভেসে উঠেছিল কেন না, ভাবা যায় না, এই সেই নন্দিতা, যে ওর সামনে, একেবারে উলঙ্গ হয়ে ওকে জিভ ভেংচে, দেখেছিল, আর ও কী রকম হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন ঠিক বুঝতে পারে নি। ওর সেই সতের বছর বয়সে, যেন বুঝতে পারে নি। ও ঠিক কী দেখেছে, কিংবা যা দেখেছে, তা সত্যিই কী না। সতের বছর বয়সে, তখনও পর্যন্ত ওরকম কিছু দেখে নি, ভাবে নি, তা-ই

নিমেষের মধ্যে, ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা ও ঠিক বুঝতে পারছিল না, নন্দিতা তখন দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রায় এগার বছর আগের কথা, সুমতিরা যা-ই বলুক, নন্দিতা তখনও ঠিক ক্যানাডিয়ান এঞ্জিন হয়ে উঠে নি। এখন যে-রকম হয়ে উঠেছে, সত্যি ক্যানাডিয়ান এঞ্জিনের মত প্রকাণ্ড হয়ত শব্দেতেও, ক্যানাডিয়ান এঞ্জিনের দানবের গর্জনের মত হুইসল বেরয়। তবে, মোটা ছিল নন্দিতা, সকলের থেকে অনেক বেশি। তবু তখন বয়স্ কম, মোটা হলেও। একটু অন্যরকম ভাব ছিল, এবং ভালবাসাবাসি কী, ও তা জানত না, তথাপি, ও আর নন্দিতা যে-ভাবে মেলামেশা করত, সে ভাবটাকে ও প্রেম মনে করত। নন্দিতার সঙ্গেই কেন অমন হয়েছিল, ও ঠিক তা জানত না, বা বুঝত না। যেমন আজও জানে না, নন্দিতার নাম কেন নন্দিতা রাখা হয়েছিল। শুধু এইটুকু বোঝা যেত, নন্দিতা ওর কাছে একটু অন্যরকম ছিল। তা-ই বা কেন, ওর কাছে বলে না, নন্দিতা এমনিতেই যেন একটু অন্যরকম ছিল। সেটা কী রকম, কীভাবে বোঝানো যায়, এই যেমন, মোটা শরীরটাকে একটু দুলিয়ে দুলিয়ে চলা যাতে ওর সমস্ত শরীরটাই বুক, পাছা, বিশেষ করে পাছার পিছন দিক, এত বড় ছিল, সেই সঙ্গে একটু মোটা ঠোঁট, যে ঠোঁটে ও গোলাপী রঙের লিপস্টিক মাখত, কিন্তু ফরসা মুখে, খুব একটা রঙ-টঙ মাখত না, বেশ একটা তেলতেলে ভাব ছিল ফরসা রঙের শরীরে, হাতে পায়ে মুখে, সব কিছুই যেন বড় বেশি করে চোখে পড়ত। অবিশ্যি এখনকার মত পেটটা এত বড় ছিল না, ভুঁড়ি যাকে বলে, যেন ভুঁড়ির ওপরেই বুকের পিণ্ড দুটো থপাস্ করে পড়তে গিয়ে, হঠাৎ একটা ঠেকো দিয়ে উঁচু করে তোলা হয়েছে। সতের বছর বয়সে, ভুঁড়ি না থাকায়, বুক দুটো তখন অনেকটা 'স্তন' শব্দের মতই— একটু বড় বড় হলেও, সুন্দর ছিল। অন্য মেয়েদের সঙ্গে তফাত, ও ঠোঁট দুটো সব সময়েই কী রকম ফলো ফুলো করে রাখত, আর সব সময়েই যেন, একটা কী রকম হাসি হাসত, সেই সময়ে সেই সতের বছর বয়সে যখন নন্দিতা কলেজে সবে ভর্তি হয়েছে।

মাত্র ক'য়েক মাস, সেই সময়েই ওই ধরনের ভাবগুলো বেড়েছিল। কী রকম—একরকম হাসত যেন সব সময়ই একটু লজ্জা পাচ্ছে, খুশি হচ্ছে সোজা চোখে না, একটু ভুরু বাঁকিয়ে চোখের কোণে চেয়ে চেয়ে হাসত, তারপরে লাল মোটা বড় জিভটা একটুখানি বের করে, চোখগুলো কুঁচকে ভেংচে উঠত। জিভ ভেংচানোটা নন্দিতার ম্যানিয়া ছিল কিনা, ও জানে না, তবে, তাকিয়ে হেসে, জিভ ভেংচানোটা, একটা অবধারিত ব্যাপার ছিল। ফুলো ফুলো ফরসা গালে ফুলো ফুলো ঠোঁটে, ওই রকম জিভই যেন মানানসই ছিল। এবং অন্যদের থেকে নন্দিতার জিভ অনেক বেশি লাল মোটা আর বড় মনে হত, এবং ওই ঠোঁটের ভিতরে অনেক খাবার একসঙ্গে পুরে দিয়ে, একটুও মুখ না খুলে খেতে পারত। বেশ একটা কপকপিয়ে খাওয়ার ভঙ্গি ছিল। তারপরে জিভ বের করে ঠোঁটের ওপরে নিচে চেটে পরিষ্কার করে ফেলত। নন্দিতা বেশ খেতে পারত, খেতে ভালবাসত, এবং অন্যান্য মেয়ে কোনরকম হাসি ঠাট্টার সময় হেসে বিরক্ত হয়ে, যেমন ধমক দেয় বা ঝেঁজে ওঠে নন্দিতা সেখানে হাত চালাত। নন্দিতা মারতে ভালবাসত, তারচেয়ে বেশি, ঘাড়ে গালে পিঠে চিমটি কেটে দিতে ভালবাসত, চুল টেনে দিতে ভালবাসত। এবং ঘাড়ের ওপর পড়তে ভালবাসত। অবিশ্যি, সকলের সঙ্গেই সেরকম করত কী না ও জানে না, ওর সঙ্গে করত। এবং এমন কিছু কথা বলত, যা থেকে মনে হত, নন্দিতার সঙ্গে ওর প্রেম হয়েছে। যেমন বলত, 'তোমাকে ছাড়া, কোন ছেলেকে আমার একটুও ভাল লাগে না' বা 'আজ বিকেলে চুপিচুপি কোথাও বেড়াতে যাবে?' অথবা 'আমাকে তোমার ভাল লাগে?' কিংবা 'ঠিক বেলা তিনটেয়, তুমি আর আমি টেলিফোনে কথা বলব, কেমন। তুমি তখন টেলিফোনের কাছে থেক।' ······এমনি সব কথা, এবং তার সঙ্গে আরও কিছু ভাবভঙ্গি যেগুলো ও তখন ভাল বুঝত না, পরে বুঝতে পেরে নিজেকে কেমন উল্লুক বুদ্ধু আর হাঁদা মনে হত। আসলে, একটা সতের বছরের মেয়ে, সাতাশ সাঁইত্রিশ সাতচল্লিশের

পুরুষেরই সমকক্ষ বোধহয়। কারণ. ও তখনও লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে, আর একটা ভীষণ পাপবোধ নিয়ে, কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া ছাড়াই, নিতান্ত একটা অনিবার্য শরীরের উত্তেজনাতেই নিজে নিজেই বীর্যপাত করত। এত খারাপ লাগত, পরের মুহূর্তেই মনে হত শরীরের একটি অঙ্গের শৈথিল্যের সঙ্গে, সমস্ত শরীরটাই কীরকম শিথিল হয়ে পড়েছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজেকে কেমন বিশ্রী লাগত, চোখের কোল ছুটো যেন তখনই বসে যেত। মুখটা রোগা রোগা দেখাত, এবং বাড়িতে কারোর দিকেই ভাল করে তাকাতে পারত না। অবিশ্যি কিছুক্ষণের জন্য। তারপরেই আবার সব ঠিক হয়ে যেত। কিছুই প্রায় মনে থাকত না। খেলাধুলো পড়া খাওয়া নিয়ে, অন্য জগতে চলে যেত।

কিন্তু এই নন্দিতা, সেই নন্দিতা, যদি বা তখনও সুমতি তাকে ক্যানাডিয়ান এঞ্জিন, নাম দেয় নি সে যে পুড়ছিল, রক্তের মধ্যে, মাংসের ভাঁজে ভাঁজে, পরতে পরতে, ও কিছুই বুঝত না। ও আসলে বেশ ফাজলামি আর মজা করতে পারত, বেশ গম্ভীর মুখে এমন সব পাকা পাকা কথা বলতে পারত, শুনে সবাই হাসত, এবং কী ধরনের মজা করা যায়, কথা বলা যায়, ফাজলামি করা যায়, আপনা থেকেই, ওর মনে আসত। সে সব শুনে, এমন কি, নন্দিতা ওকে একদিন ঘাড়ের নিচেই কামড়ে দিয়েছিল, অবিশ্যি, হাসতে হাসতে, আর নাক খামচে দিয়ে। আঙুল তো অনেকবার কামড়ে দিয়েছে, যে কারণে কোথাও কেউ কাউকে খাউনতুরে বললে—অর্থাৎ যে খুব খেতে পারে তখন নন্দিতার কথাই ওর মনে হত। তথাপি, অনেক কিছু বুঝেও নন্দিতার অবস্থা বুঝতে পারে নি, তা-ই কী একটা ছুটির দিনে, ও যখন বেলা মাত্র সাড়ে এগারটায একদিন নন্দিতাদের বাড়ি গিয়েছিল, এবং দেখেছিল, বাড়িটা যেন একদম ফাঁকা কেউ নেই, নিচে বসবার ঘরের দরজায় ঝিকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাড়িতে কেউ নেই?'

'না, সব বেড়াতে গেছে। খালি ছোড়দিমণি আছে।

ছোটদিমণি নন্দিতা। ওপর থেকে নন্দিতার গলা শোনা গিয়েছিল, 'খোকার মা, কে এসেছে।'

খোকার মা ঝি কিছু বলবার আগেই, ও বলেছিল, 'আমি'।

'ওপরে এস।'

ও ওপরে উঠতে উঠতে ভাবছিল, বাড়ির সবাই বেড়াতে গিয়েছে, কিন্তু নন্দিতা যায় নি কেন, বা নন্দিতাকে একলা বাড়িতে রেখে গেল কেন। ও ওপরে উঠে, নন্দিতাকে দেখতে পায় নি, সব ঘরের দরজাগুলোই খোলা ছিল, এবং প্রত্যেকটা ঘরই ওর জানাছিল, রীতিমত যাতায়াত ছিল, ওপরে নিচে, কোথাও যেতে বাধা ছিল না সকলেই ওকে চিনত, নন্দিতার বাবা মা দিদি—দিদি মোটেই নন্দিতার মত ছিল না, বরং একটু রোগা লম্বা ধাঁচের অনেকটা ওদের বাবার মত, আর নন্দিতা অনেকটাই তার মায়ের মত, সকলের সঙ্গেই, অর্থাৎ পারিবারিক আলাপ পরিচয় ছিল। ও প্রত্যেকটা ঘরেই নন্দিতাকে খুঁজেছিল কোথাও দেখতে পায় নি, তাই অবাক-হয়ে ডেকেছিল, 'নন্দিতা'। কোন সাড়া পায় নি, এবং তখনই মনে মনে, অনুমান করে নিয়েছিল, নন্দিতা নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে লুকোচুরি খেলছে, যদি বা তখনও নন্দিতা একটা বাড়িতে রয়েছে, একেবারে একা, এটা ওর মাথার মধ্যে ঢুকে, কোনরকম অবাক খুশির উত্তেজনা সৃষ্টি করেনি, কারণ একটি মেয়ের সঙ্গে, সকলের আড়ালে, অবাধ স্বাধীনভাবে, যেমন খুশি মেলামেশার চিন্তা ওর মাথায় ছিল না, ও ঘরের বাইরে চলে এসেছিল। বারান্দার দুপাশে ঘর, শোবার ঘর, বাথরুম, এবং বারান্দাটা যেন একটা গলির মত, সেখানে ও এপাশে ওপাশে হাঁটাহাঁটি করে, একমাত্র বাথরুমের দরজাটা বন্ধ দেখে, আবার ডেকেছিল 'নন্দিতা'। কোন জবাব পায় নি, তখন, একটু সরে গিয়ে বলেছিল, 'তাহলে আমি চলে যাচ্ছি'। আর ঠিক তখনই বাথরুমের—একটা না, দুটো বাথরুম, এবং দ্বিতীয় বাথরুমের দরজাটা খুলে গিয়েছিল, নন্দিতা সেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই অবস্থায়, একেবারে উলঙ্গ ওকে জিভ ভেংচে দিয়েছিল, আর

সঙ্গে সঙ্গেই আবার দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরকম একটা ব্যাপার সম্ভব কী না, কিংবা যা দেখেছে, তা সত্যিই দেখেছে কী না, ও যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, তাই বন্ধ দরজাটার দিকে হা করে তাকিয়েই ছিল, এবং ভাবতে চেষ্টা করছিল, আধখোলা দরজার ফাঁকে, সেইমাত্র যা দেখেছে; সেটা কী, কী রকম মানে, সত্যিই নন্দিতা ওভাবে—এ কি সম্ভব এবং কেন। ওর মস্তিষ্কের সীমায়, এমন কোন জায়গায়, গোটা ছবিটা আঘাত করে নি যাতে ওকে বাঘের মত, রক্তখেকো বাঘের মত, দরজার ওপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে বাধ্য করে, যে-কারণে ও হা করে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ওর শরীরের কোথায়, কোন অচেনা জায়গায়, হঠাৎ যেন খুব নিচু শব্দে, একটা ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করেছিল। শরীরের মধ্যে ওরকম কোন ঘণ্টা বাজতে পারে কী না, ও জানে না, তখন মনে হয়েছিল, যেন, অনেকটা বহু দূর থেকে ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি, অন অ্যাকশন, ছুটতে ছুটতে আসছে, তার দ্রুত বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টার শব্দ খুব আস্তে, অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত মিনিট খানেক তারপরেই আবার দরজাটা খুলে গিয়েছিল, খোলা ফাঁকের মাঝখানে, নন্দিতাকে আবার দেখা গিয়েছিল, তেমনি উলঙ্গ যা ভাবা যায় না মাত্র দু তিন হাত দূরে তেলতেলে ঘাম ঘাম, নন্দিতার মুখ কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছিল, চোখ দুটো ঠিক রোদ ঝলসানো আয়নার মত, এবং গোটা শরীরটাই ফরসা ফরসা তেলতেলে ভাব, বিশেষ বুকের দিকেই ও হাঁ করে তাকিয়েছিল। তারপরেই, কোমরের কষির দাগ পেরিয়ে, নিচে ওর চোখ পড়েছিল, আর তখনই, আবার নন্দিতা জিভ ভেংচে দিয়েছিল, দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পুরোপুরি না, অল্প একটু ফাঁক ছিল, নন্দিতাকে দেখা যাচ্ছিল না। ওর মুখের ভাবটা, অনেকটা যেন, জীবনে প্রথমদিন চিড়িয়াখানা দেখার মত, প্রথম বাঘ বা হাতি বা বনমানুষ দেখার মত অথচ চিড়িয়াখানায় সমস্ত কৌতূহলটা যেমন সমস্তটা তখনই আস্তে আস্তে মিটে গিয়েছিল, জীবন্ত বাঘ, জীবন্ত হাতি, জীবন্ত বনমানুষ এবং একটি

শিশু মন, নানান ভয় আর অদ্ভুত সব কল্পনায় ভরে উঠেছিল, নন্দিতার ভেজানো বাথরুমের দরজার সামনে, সেরকম হয় নি। সেই মুহূর্তে অন্যরকম একটা বোধ ওর মধ্যে কাজ করছিল। ফায়ারব্রিগেডের দূরের গাড়ি অনেক কাছে এসে পড়েছিল. স্পষ্ট আর জোরে ঘণ্টা বেজে উঠেছিল ওর ভিতরে, এবং ঠিক যেন বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টার মতই, ও কী রকম সাবধান আর সচেতন হয়ে উঠেছিল। শরীরের মধ্যে হঠাৎ যেন কতগুলো খোলা দরজা দমকা বাতাসে দুমদাম শব্দে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার আর দমবন্ধ একটা অবস্থা, এবং সেই অবস্থায়, ওর সারা শরীর জড়িয়ে যেন একটা সাপ পাক দিচ্ছিল, ও দাঁতে দাঁত চেপে যেন লড়তে চাইছিল। ভেজানো দরজাটার কাছে যে ও নিজে নিজেই গিয়েছিল, তা ওর মনে হয় নি. অথচ দরজাটার কাছে যে ও গিয়েছিল, এবং দরজাটা ঠেলে দিয়েছিল। ওর চোখে তখন যেন রক্তের আঁচ লেগেছে, এমন একটা কৌতূহল, যা সারা জীবনেও কোনদিন মিটবে না। এবং ও যেন তখন ওর সেই অন্ধকার ঘরেই দম বন্ধ অবস্থায় ছিল। দরজার সামনে কেউ-ই ছিল না, বাঁ দিকের দেওয়ালে, পাশ ফিরে হেলান দিয়ে নন্দিতা দাঁড়িয়েছিল। ডান হাতটা তুলে, বন্ধ জানালার ওপর রেখেছিল, তার নিচে বুকের একটা পাশ দেখা যাচ্ছিল, ডান পা-টা একটু মুড়ে কেমন যেন একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। নন্দিতা ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় নি, কিন্তু ঠোঁটের শক্ত কোণে টেপা টেপা হাসি ছিল, চোখের কোণ দিয়ে ওকেই দেখছিল, এবং ও এই অদ্ভুত নগ্ন ছবিটাকে যেন তখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না, কারণ, বিশ্বাস করবার মত, কোন কার্যকারণ ভাবনা-চিন্তা, কিছুই ওর মাথায় ছিল না, তথাপি, দমবন্ধ শরীরে. যেন ওর সমস্ত শরীর পেশী শক্ত হয়ে উঠছিল, আর তখনই নন্দিতার ফিসফিস গলা শোনা গিয়েছিল, 'হাঁদা'। বলেই, নন্দিতা, যেন স্বাভাবিকভাবেই, জামাকাপড় পরা অবস্থায় যেমন সবাই করে, তেমনিভাবে, ওর গা ছুঁয়ে, ডিঙিয়ে গিয়ে, দরজার ছিটকিনিটা আটকে দিয়েছিল, ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, ওর সেই অবাক

হতভম্ব অথচ রক্তের আঁচ লাগা চোখের দিকে তাকিয়ে, আলতো করে ওর গালে একটি চাটি মেরে, মাথার চুল আস্তে টেনে দিয়েছিল, এবং হঠাৎ যেন লজ্জা পেয়েছে, সেইভাবে, চোখ নামিয়ে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়েছিল।

ও তখনও অবাক, এবং নন্দিতার শরীরের দিকে তাকিয়ে ওর কেমন একটা খারাপ ভাব লাগছিল, সমস্ত শরীরটা কী রকম খারাপ আর একটা ভয় ধরানো ভাব, নাকি যেন, একটা ভীষণ অন্যায়ের মত লাগছিল, তেলেতেলে ফরসা ফরসা রোঁয়া রোঁয়া ভাবের গা, কেমন যেন অদ্ভুত, মানুষের না, একটা অন্য কোন জীব বিশেষ, নন্দিতার তলপেটের দিকে যখন ওর চোখ পড়েছিল, ওর গায়ের মধ্যে কী রকম করে উঠছিল, একটা বিরূপতা, প্রতিবাদ, বিদ্রোহের ভাব, অথচ চোখ ফেরাতে দেরি হচ্ছিল, এবং ওর শরীরের মধ্যে আপনা থেকেই কী রকম পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, সমস্ত শরীরটা একটা প্রকাণ্ড মশালের মত জ্বলছে। ওর মনে হয়েছিল, নন্দিতার শরীরের প্রত্যেকটি জায়গা কাঁপছে, গা থেকে ভাপ বেরচ্ছে। কেমন করে, নন্দিতা ওকে জড়িয়ে ধরেছিল. মনে করতে পারে না। ঠিক যেন একটা পকেটমারেব মত নন্দিতার হাত ওর কোমরে গায়ে ঘোরাফেরা করেছিল। আর ওর ট্রাউজারটা বাথরুমের ভেজা মেঝের ওপরে খুলে পড়েছিল, এবং নন্দিতা যেন একটা অদ্ভুত খেলায় মেতে গিয়েছিল, যে-খেলাতে, এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ও হঠাৎ খিলখিল করে হেসে. মেঝের ওপর ধপাস্ করে পড়ে গিয়েছিল. ঠিক যেমন ভীষণ সুড়সুড়ি এবং কাতুকুতু লাগলে হয়। নন্দিতার কোনও ঘৃণা ছিল না, লজ্জা ছিল না. মুখের স্বাদ এবং সাধের যেন কোন অন্ত ছিল না, এবং সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা বিরাগ থাকলেও, হাসতে হাসতে, গড়িয়ে পড়েছিল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার ভয়ে হাত জোড় করে, ছেড়ে দিতে বলেছিল। আর তখন মনে হয়েছিল জামাকাপড় পরা থাকলেও, নন্দিতা এরকম করতে পারত, কেননা, সমস্ত ব্যাপারটা যেন,

নন্দিতার চেহারা, স্বভাব ইত্যাদি সবকিছুর সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল, যদি বা, কী করে নন্দিতা ওরকম করছিল, কোনদিনই ভেবে উঠতে পারে নি, বা কেউ কী ওরকম করতে পারে, কোনদিনই সঠিক জানতে পারে নি। নন্দিতা যেন সত্যি ওর সঙ্গে খেলা করছিল, একটা খেলা, আর একরকমের।······

॥ ৬ ॥

তারপরেও, ওরকম খেলা নন্দিতা, ওকে নিয়ে অনেক খেলেছে, এবং সব সময়েই, ওর একই রকম মনে হয়েছে, প্রথম দিন যেরকম মনে হয়েছিল। নন্দিতার কাছে, সমস্ত ব্যাপারটাই, এত সহজ আর অনায়াস ছিল যে কখনও মনে হত না, ওর কোন ভয় বা চিন্তা আছে, যেমন, ওর বিশ্বাস, সব মেয়েরই থাকে। প্রেম মানেই, যেমন লুকনো বিষয়, লুকিয়ে লুকিয়ে তাকানো, লুকিয়ে লুকিয়ে হাসা, লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলা, তারপরে আর একটু কাছা-কাছি, একটু ছোঁয়াছুঁয়ি, একটু জড়িয়ে ধরা, চুমো খাওয়া, অথচ সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই একটা ভয়, লজ্জা মিশে থাকে, নন্দিতার মধ্যে সেসব কিছুই ছিল না। যত মেয়ের সঙ্গে, ওর পরে আলাপ হয়েছে যদি বা, আলাপি সব মেয়ের সঙ্গেই ওর প্রেম বা, সেই এক ধরনের প্রেম প্রেম ব্যাপার, খানিকটা শরীর নিয়ে খেলা, এক রকমের ছিঁচ-কেমি বা ছোঁচাবৃত্তি যাকে বলা যায়, সুযোগ পাওয়া গেল তো, দু-তরফ থেকেই, হাতে ঠোঁটে কিছু আদায় উশুল হয়ে গেল, সেরকম ছিল না, তথাপি, কোন মেয়েকেই ও নন্দিতার সঙ্গে মেলাতে পারে নি। অথচ, নন্দিতা, লেখাপড়ায় ভাল ছিল, জেদি মেয়ে ছিল। কপকপিয়ে খাওয়া, হাসি খুশি, আবার রাগীও বটে, কলেজের ইউনিয়ন করতে গিয়ে, সেটা বোঝা যেত। সব মিলিয়ে বুদ্ধিমতী ছিল, কিন্তু যে ব্যাপারটা মানুষের কাছে, বিশেষভাবে একটা পাপ এবং ভয়ের ছায়ায় ঘিরে থাকে, নন্দিতার কি তা ছিল না? অবিশ্যি,

একটা কথা সত্যি, রক্তের মধ্যে আগুন জ্বালানো উত্তেজনা, এবং আবেগ, এমন অন্ধ করে ফেলে, নগ্নতা তখন অনেকটাই সহজ অনায়াস, আর সেটাই বোধহয় স্বাভাবিক তথাপি নন্দিতার নগ্নতা যেন একটা সহজ খেলার মত। লজ্জা ভয় ন্যায় অন্যায়.বোধের যে সমস্ত বাধা বা একটা দ্বিধা থাকে, যা হয় তো মেয়েদের আরও আকর্ষণীয় করে তোলে, ওর নিজের ধারণা বা অভিজ্ঞতা তা-ই, যেন তখন আরও সুন্দর লাগে প্রেমিকাকে, কেননা, তখন যেন প্রেমিকাকে চেনা যায়, ভিতরে ভিতরে একটা শক্তি জেগে ওঠে—শক্তি, শরীরে না, মনের মধ্যে, কারণ প্রেমিকার দুর্বলতা, ভয় দ্বিধা ইত্যাদি। প্রেমিক যেন নিশ্চিন্ত করে, নিশ্চিত করে, একে জয় করা যাবে। যার ভয় নেই ন্যায় অন্যায় বোধ নেই, দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই, তাকে জয় করা যায় না. সে যেন কখনই সুন্দর হয়ে ওঠে না, আকর্ষণীয় হয় না, এবং নন্দিতা যেন তা-ই।

কেমন করে নন্দিতা এমন হয়েছিল, ও কোনদিন বুঝতে পারে নি, এবং সতের বছর বয়সে, নন্দিতা, ওর সমস্ত অবাক হওয়ার ব্যাপারটাকে, একেবারে একটানে যেন ছিঁড়ে ফেলেছিল। ওর আবিষ্কারের জন্য, এবং সেই আবিষ্কারের মধ্যে, কত উত্তেজনা, কত আশ্চর্য হওয়া, কত অদ্ভুত অনুভূতি, সুখ দুঃখ ভয়, সেসব কিছুই রাখে নি নন্দিতা, যদি বা, এর মধ্যে একটা কিম্ভূত ব্যাপার. নন্দিতা বার-বার জীইয়ে রেখেছিল, যে-কারণে কোনদিনই বলা য়াবে না, নন্দিতাই ওকে প্রথম, রহস্যের শেষ কিনারায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল। একটা বিষয়ের শেষ রহস্য, যেমন একটা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সব কিছুই ঠিক মত শেষ হয় অনিবার্যভাবে, নন্দিতার তা ছিল না। নন্দিতার সহজভাবে উলঙ্গ হওয়ার কারণটা ছিল যেন, ওকেও যাতে উলঙ্গ করা যায়, এবং একথা মানতেই হবে, ওর উলঙ্গ মূর্তি দেখে দেখে যেন নন্দিতার সাধ মিটত না, ঘেঁটে চটকে আশ মিটত না ওর, কষ্ট হচ্ছে কী না, সে কথাও যেন নন্দিতার মনে থাকত না, যাকে বলে, অপার কৌতুহল বা চির-কৌতুহল, তা-ই জেগে

থাকত চোখে, এবং সেই কৌতূহলের সঙ্গে, চোখের দৃষ্টিতে, সারা শরীরে, দারুণ উত্তেজনায়, নন্দিতা ওকে নিয়ে খেলা করত। কিন্তু ও জানত সেটাই শেষ না, আরও কিছু বাকী, এবং প্রথম প্রেম, ইচ্ছা জানাতে লজ্জা করলেও, পরে যখন জানিয়েছিল, তখন নন্দিতা বলেছিল, 'ওটা একটা জঘন্য ব্যাপার, আমার বিচ্ছিরি লাগে, ঘেন্না করে। না, ওটা না, তোমাকে তো কষ্ট দিই নি।' ও মনে করেছিল, ওটা বোধহয় নন্দিতার লজ্জা বা ভয়—না, লজ্জা না, ভয়ই মনে করেছিল। নন্দিতা নিশ্চয়ই ভয়ে ও কথা বলেছিল, পরে আর ভয় থাকবে না, ও ভেবেছিল, কিন্তু ও ভুল ভেবেছিল, কারণ পরে যতদিন গিয়েছিল, ও বুঝতে পেরেছিল, বিশ্বাস করেছিল, মেয়ে পুরুষের একটা স্বাভাবিক ব্যাপারকে, নন্দিতা সত্যি সত্যি জঘন্য ব্যাপার মনে করে, ঘৃণা করে। নন্দিতার ভয় সত্যি ছিল না, কিংবা হয়ত ভয় থেকেই ওরকম ঘৃণা জেগেছিল, হয়ত সেটাকেই নন্দিতা একমাত্র পাপ মনে করত, যদি বা, নন্দিতা সত্যি সুখী ছিল, সেই খেলাতেই তৃপ্ত ছিল।

অন্য ঘরে, কাশীর গলা শোনা গেল। হয়ত কেউ এসেছে বা কেউ বাড়িতে ফিরেছে। সেই নন্দিতা, তারপরেও অনেকদিন—কিন্তু এখন নিশ্চয়ই আর সেরকম নেই, কারণ ধীরেনবাবুর কোলে ও সন্ধ্যাবেলা একটা বাচ্চা দেখেছিল এবং বাচ্চাটা সেইরকম জঘন্য ঘৃণার ব্যাপার থেকেই নন্দিতার পেটে এসেছিল। অথবা, নিতান্ত একটি বাচ্চার জন্য বা ধীরেনবাবুর কাতর অনুরোধে, নন্দিতা রাজী হয়েছিল তথাপি উলঙ্গ বাঙালী ড্রাইভারকে যে নগ্ন ক্যানাডিয়ান এঞ্জিনের সঙ্গে, নিজের মত যেন দেখতে পাচ্ছে। ওকে নিয়ে যা করেছে, ধীরেনবাবুকে নিয়েও নিশ্চয় নন্দিতা তা-ই করেছে, কী রকম যেন ভাবা-ই যায় না। নন্দিতা আর ধীরেনবাবু উলঙ্গ চেহারায়, ওর চোখের সামনে ভাসছে, কে জানে, একই ভাবে কোন একদিন ফাঁকা বাড়িতে, ধীরেনবাবুকে বাথরুমের দরজায় দেখা দিয়ে, জিভ ভেংচেছিল কী না।

সেটা যে-ভাবেই হোক, নন্দিতা যে-ভাবে থাকতে চায়, থাকুক, ওর কিছু ভাববার বা বলবার নেই। কোন এক সময়ে, নন্দিতাকে ও মনে মনে একটা অন্যায়ের জন্য দায়ী করত। ঠিক না, একটা ক্ষতির জন্য, যেন নন্দিতা ওর কোন ক্ষতি করেছিল। তারপরে আর সে চিন্তাটাও ছিল না আপনা থেকেই, ওরা পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। ও নিশ্চয় নন্দিতাব কোন ক্ষতি করে নি, নন্দিতা নিশ্চয় কোনদিন ভাবে নি, ও চিরদিন নন্দিতার সঙ্গে এরকমভাবে চালিয়ে যাবে। নন্দিতার বাঙালী ড্রাইভার হবে. এবং পাঁচ বছর পরে, নন্দিতা যদি একটু অবাক হয়ে হাসত, কথা না বলেও, শুধু একটু হাসত, যদি বা, তাতে ওর মনের মধ্যে দারুণ কিছু ঘটত না. পণ্ডিতি ভাষায়, সামান্য একটু হাসিতে, নতুন কোন মূল্য-বোধের রহস্য জন্ম হত না কিন্তু একটু হাসতে বোধহয় পারত, সেই-সব দিনের কথা মনে করে. এবং আসলে. সেই মুহূর্তেই যে ওর ভিতরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, তার কারণ, বিচ্ছিন্নতা যেন ও আর সহ্য করতে পারছে না। বিচ্ছিন্নতা. ঠিক নন্দিতার শক্ত মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা না. এতটা বাইরের ব্যাপার না. বিচ্ছিন্নতা একটা ভয়ঙ্কর অ-বুঝ ব্যাপার. না বোঝা, আত্মমগ্নতা, আত্মসুখ, আত্মভয়, গোষ্ঠী সুখ, গোষ্ঠী মগ্নতা. গোষ্ঠী ভয় বা একই কথা. পার্টির সম্পর্কেও ওভাবেই চিন্তা করা যায়, যদি বা, 'সবাই সবাইয়ের জন্য', 'সমবেত,' 'সমগ্র মানব সমাজের আত্মবোধ' কথাগুলো এত জোর গলায় বলা হচ্ছে ছাপার অক্ষরে রোজ কোটি কোটি বার বলা হচ্ছে, যে-কারণে, ছাপার অক্ষরগুলোকে এক এক সময় ওর ভয়ঙ্কর মনে হয়। অতি ভয়াবহ একটা রাক্ষসের মত, প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষের বুদ্ধি চিন্তাকে যেন খেয়ে ফেলেছে. আর মিথ্যাব আর অহঙ্কারের বোঝা বাড়িয়ে তুলেছে। এই বিচ্ছিন্নতা, না বোঝা, ভিতরে ভিতরে, না চাওয়া, এটা ওকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। অন্তত কেউ একজন যদি একটু, বোঝাবুঝির অবস্থায় আসত, কেউ একজন এবং সেই একজন. এই মুহূর্তে যার মুখটা ভেসে উঠছে—।

'বেরোসনি বুঝি।'

মা ঢুকল ঘরের মধ্যে। সেই জন্যই কাশীর গলা শোনা যাচ্ছিল লালপাড় মুগা রঙের শাড়ি মায়ের পরনে, বাইরে গিয়েছিল, তা-ই, যেমন সবাই কুচি দিয়ে পরে, নীলিমাদের মত, সেইভাবে পরা, আর একটা সাদা জামা। কপালে সিঁদুরের টিপ নেই, একটা চন্দনের ফোঁটা আছে, সিঁথেয় সিঁদুরের দাগ আছে। পাতলা পাতলা, চুলগুলোকে পিছনে খোঁপা করে বাঁধা। মাথার একটা চুলও পাকে নি, কেবল পাতলা হয়ে গিয়েছে, খুলির সাদা রঙ ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়। মাকে দেখলেই বোঝা যায়, কেমন একটা অন্য ঘোরে আছে, কথা বলছে, হাসছে, চলছে, ফিরছে, তবু যেন অন্য কোথাও মন পড়ে আছে, এইরকম মনে হয়। ওকে নাকি অনেকটা মায়ের মত দেখতে, যদি বা মা এখন অনেকটা থপথপে হয়ে গিয়েছে, ঠিক মোটা বলা চলবে না, অথচ থপথপে, আসলে দোহারা গড়নের ওপরে বয়সের ভার নামলে যেরকম হয়।

মা ওর কাছে আসতে আসতে, হাতের ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগটা খুলে কী একটা ফুল যেন বার করল, এবং ফুলটা ওর কপালে একবার ছুঁইয়ে, পড়ার টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল, 'আসতে আসতে ভাবলাম, হয়ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছিস।'

ও বলল, 'না। একবার একটু বেরিয়েছিলাম—।'

কথাটা ও শেষ না করেই, চুপ করল, এবং দেখল, মা ওর কথা ঠিক শুনছে না, বাইরের জানালা দিয়ে, অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন, বাইরের অন্ধকারে যা কিছু দেখতে পাচ্ছে, তার ঠোঁটে একটা হাসির আভাস জাগছে, চোখে একটা ঘোর ঘোর ভার। বলল, 'অত তোর ভাববার কী আছে, উনি আমাকে পরিষ্কার করে বলে দিলেন, তোর নবজন্ম হয়েছে। আজ আমি ওঁর কাছে যাব বলে বেরোই নি, সেটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার।'

মা একটু থামল, মুখটা যেন কেমন, আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দেওয়া আলোর মত ঝকঝক করে উঠল, এবং ওর দিকে ফিরে না

তাকিয়েই বলল, 'আসলে আমি তো তোদের নির্মলামাসীর বাড়ি গেছলাম, আমরা সকলেই তো একজনের কাছেই দীক্ষিত। তা নির্মলাই বললে, অতসীদি, চল আজ একটু ওঁকে দর্শন করে আসি, মনটা বড্ড টানছে। আমি আবার, দেরী হয়ে যাবে ভাবলাম, তবু মনটা কেমন আমারও হয়ে গেল। এই তো সেদিন ঘুরে এসেছি। তবু মনটা টানল, চলে গেলাম নির্মলার সঙ্গে, আর আমাকে দেখেই, বলে উঠলেন, 'তোমার কথাই ভাবছিলাম, এস' ছেলে কেমন আছে। প্রথম কথাই এই।

মা তার গুরুদেবের কথা বলছে। ভদ্রলোককেও দেখেছি আগে মায়ের মত বা মায়ের মত অন্যান্য শিষ্যশিষ্যাদের মত, ভদ্রলোককে ওর অদ্ভুত কিছুই মনে হয় নি। যৌবনে হয়ত, ভদ্রলোক দেখতে সুন্দরই ছিলেন, কেন না, ফোলা ফোলা লম্বাটে ধরনের মুখে নানা ভাঁজের মধ্যে, নাক চোখ বেশ সুন্দর। পান খান অনবরত, যে জন্য, ঠোঁট দুটো সব সময়েই, পানের পিকে কালচে লাল, এবং নকল দাঁতগুলো পরাব একমাত্র কারণ বোধহয় পান চিবোবার জন্যই। নকল দাঁতগুলোও লাল কালো ছোপ ধরা। গড়গড়াতে তামাক খান। চোখে চশমা, কপালে একটা লাল লম্বা রেখা আঁকা, আর গেরুয়া থান পাঞ্জাবি পরা। ভদ্রলোক যখন হাসেন, তখন খুব চড়া গলায় হাসেন, কিন্তু যখন কথা বলেন, তখন অন্য রকম, ·গন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনিভাবে, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হয়ত বলে উঠলেন, আসলে কী জান, যে বলে, ভগবানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, সে মিথ্যে কথা বলে, ভগবানকে ফাঁকি দেওয়া কিছু না, তুমি যদি মনকে বোঝাতে পার, এতে ভগবান আমার ওপর রাগ করবেন না, তা হলেই হল, দিব্যি একটি ফাঁকি দিয়ে দিলে। কিন্তু ফাঁকি দেওয়া যায় না নিজেকে বুঝিলে তো। নিজের কোন বিষয়ে রাগ হলে, তখন আর ফাঁকা বুলি দিয়ে নিজেকে ঠাণ্ডা করতে পারবে না। তা হলেই হল। আসল জিনিসকে ঠিক রাখ, সব ঠিক থাকবে।'

অর্থাৎ নিজেকে বা নিজের মনকে ঠিক রাখার কথা বলেন, আর শুনলেই. ওর মনে হ'ত, ভদ্রলোকের সমস্ত কথাগুলোই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা, পুরনো পচা কথার মত, মেকী মেকী ভাব, এবং ওর মনের মধ্যে একটা কথাই বেজে উঠত, 'গুলবাজ'। ভদ্রলোক এমন ভাবে বলেন, এত সুন্দর করে, যেন গলাব বিশেষ কাজ দিয়ে দিয়ে, একজন পাকা গাইয়ের মত, যাতে মনে হয়, লোকটি নিজে কোন কথাই বিশ্বাস করেন না. তা ই ওভাবে ঢঙ করে, রসিয়ে রসিযে বলছেন। ওর মনে হয়, এসব লোক খুব নির্লজ্জ আর দুঃসাহসী হয়, কোন কিছুতেই ভয় নেই, লজ্জা নেই, তা না হলে, একটা লোক, এই ধরনের লোক, অনেকের ত্রাণকর্তা সেজে বসে কেমন করে। মায়ের গুরুদেবকে ও অনেকদিন মনে মনে, 'ফেরেববাজ খচ্চর' বলেছে, যদি বা, মাকে কোন কথা বলতেই ইচ্ছা করেনি। অথচ একটা ভয়েব ভাবও ওব মনের মধ্যে থাকে. কী জানি, লোকটা যদি সেরকম সত্যি কিছু হয়। তাহলে হয়ত ওর কোন ক্ষতি করে দেবে। পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেবে বা চলন্ত-গাড়ি থেকে ফেলে দেবে কিংবা ঘুমন্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলবে। এরকম অনেক কিছু মনে হত, তবু ভদ্রলোককে কখনও ওর একজন ত্রাণকর্তা বলে মনে হয় নি, বরং, সেই ফেরেব্‌বাজ বা ধূর্ত, আর মিথ্যাবাদী বলেই মনে হয়েছে, এবং অনেক সময় এমনও মনে হয়েছে, মা নির্মলামাসীদের সঙ্গে ভদ্রলোকের কিছু একটা বোধহয় আছে। খারাপ কিছু, যা ভাবলেই, গুরুদেব ভদ্রলোকের ওপর ভীষণ রাগ হত, একটা ঘৃণার ভাব মনে আসত। নির্মলামাসীই প্রথম মাকে এসে সংবাদ দিয়েছিল, যেন কী এক গোপন আশ্চর্য রহস্য উদ্ধাবের সংবাদ, মন্ত্রের মত মায়ের কানে কানে দিয়ে গিয়েছিল, আর মা অমনি ছুটে গিয়েছিল, তারপরে, ক্রমেই যেন মা কেমন হযে গিয়েছিল, কেবল গুরুদেবেব কথা। মা যেন, সেই প্রায় চল্লিশ বছব বয়েসে, আবার প্রেমে পড়েছিল, প্রেমিকার মত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটাই আশ্চর্যের কথা, গুরুদেব নিয়ে বাবাকে একটা কথাও

কোনদিন বলতে শোনা যায় নি। বাবা সবই জানত, বাবাকে বলেই মা দীক্ষা নিয়েছিল, যদি বা, বাবার কাছে, ব্যাপারটার যেন কোন গুরুত্বই ছিল না, এখনও নেই, গুরুদেব নিয়ে, মা-বাবাতে কোন কথা হত না, বাবা শুনতে চাইত না, কিছু জিজ্ঞেসও করত না, মাও বাবার সামনে, গুরুদেবের বিষয়ে চুপচাপ থাকত। বাবার ভাবটা যেন ছিল, ওসব নিয়ে মা থাকুক গিয়ে, বাবার কিছু যায় আসে না, বাবা ওসবের মধ্যে নেই। গুরুদেবের বিষয়ে বাবার ওরকম চুপচাপ থাকা, অনেকটা যেন বিতৃষ্ণা বা বিবাগের মত, অথচ মাকে কোন-রকম বাধা না দেওয়া, এসব দেখে শুনেই, ওর আরও মনে হত, মা নির্মলামাসীদের সঙ্গে, গুরুদেব লোকটার মধ্যে খারাপ কিছু আছে, যে কথা ভাবলে, রাগ এবং ঘৃণা ছাড়াও ওর নিজের মনটা কী রকম ছোট হয়ে যেত, কথাটা না ভাবতেই চেষ্টা করত, যেন নিজেকেই কী রকম অপরাধী বলে মনে হত। যে নির্মলামাসী বাবার সঙ্গে এত কথা বলত, সেও বাবার কাছে এসে, গুরুদেবের কথা কিছু বলত না। নির্মলামাসী মায়ের থেকেও, দু-এক বছরের ছোট, মায়েব থেকে বেশি সাজগোজ কথাবার্তায় একটু বেশি রঙ ঢঙ, বাবার সঙ্গে তো খুব চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলত, যেন বাবাকে একটুও ভয় পায় না। কিন্তু গুরুদেবের কথা বলার সাহস একদিনও হয় নি। বাবা কেন মায়েদের গুরুদেবকে নিয়ে এত নির্বিকার এবং চুপচাপ ছিল, তা জানে না। বাবার কি কোনরকম ঈর্ষা বা হিংসা ছিল। তাও ও জানে না, বুঝতেও পারত না, কারণ বাবা যে কিছুই বলত না, হাঁ-ও না, না-ও না। সে যাই হোক গিয়ে, ওর কোনদিনই গুরুদেব লোকটাকে ভাল লাগে নি, একটা যে কোন ফেরেব্‌বাজ গুলবাজ লোকের মতই মনে হয়েছে, শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাব কোনদিন মনে আসে নি। আর সেই লোকটা, খেয়ে দেয়ে যার কাজ নেই, মাকে দেখা মাত্রই 'তোমার কথাই ভাবছিলাম। ছেলে কেমন আছে।' কথাটা শুনলেই, একটা ধূর্ত মুখ ভেসে ওঠে, একটা চতুর মনের খবর পাওয়া যায়।

॥ ৭ ॥

মা এখনও বলে চলেছে, 'কত কথা যে বললেন। উনি তো কোষ্ঠী দেখেন না, এমনিতেই অনেক কিছু বুঝতে পারেন, তোরা যাকে ইনটুইশান বলিস। আমি তাও বলি না, আমার মনে হয়, ওঁর অন্য একটা ক্ষমতা আছে. যার বলে, উনি অনেক ভূত-ভবিষ্যৎ দেখতে পান, জানতে পারেন। বললেন, 'জানবে, তোমার ছেলের নবজন্ম হয়েছে, পাঁচটা বছর ওর মৃত্যুযোগ গেছে, জীবন্ত নরক দর্শন করেছে, নরকবাস করেছে, এবার দেখবে, ও কোথায় যায়, কতদূরে ওঠে। ও অনেক ওপরে উঠবে, অন্য মার্গে। ওর জন্যে তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না। ওকে একবার আমার কাছে আসতে বলো।'...

ও মনে মনে বলে উঠল, 'সোয়াইন।' কিন্তু মাকে কিছুই বলল না. মুখের ভাব শক্ত করল না, যেন বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনছে, এমনিভাবে তাকিয়ে রইল। মা ঘোর লাগা চোখ দুটো তুলে, ওর দিকে তাকাল। মা জানতে চাইছে ও গুরুদেবের কাছে যেতে চায় কী না। সন্ধ্যাবেলা মা গিয়েছিল, নির্মলামাসীর বাড়িতে। মা রোজই বিকেলের দিকে বেরিয়ে যায় একদিনও বাড়ি থাকে না. এবং বেরলেই, কোন না কোন শিষ্য ভগিনী বা ভ্রাতার কাছেই যায়, তাদের ধর্ম নিয়ে কথা হয় বা, সমস্ত শিষ্যগোষ্ঠীর মধ্যেই এটা দেখা যায়, রোজই তারা কেউ না কেউ নিজেদের সঙ্গে দেখা করে, হয়ত, খবরের কাগজের সংবাদ, বিশেষ কোন ঘটনা, বাজার দর, পরিবারের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা, সবরকম কথাবার্তাই হয়, কিন্তু অন্য কোন বাইরের লোকের সঙ্গে না, কেবল নিজেদের মধ্যে। মা গিয়েছিল নির্মলামাসীর বাড়িতে, গুরুদেবের কাছে যাবার কথা কিছুই ভাবে নি. তারপরে নির্মলামাসীর গুরুদর্শনের' টান শুনে, মায়েরও টান বেড়ে গেল, মাও গেল গুরুদর্শন করতে, এবং সেখানে গিয়ে, হঠাৎ

ওর কথা উঠল। তাই মা এসে এখন ওকে সেইসব কথা শোনাচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটার পূর্বাপর যোগাযোগ কী ও বুঝতে পারছে না। মা রোজ যেমন বেরোয়, তেমনি বেরিয়েছিল, তার মধ্যে ওর চিন্তা মায়ের ছিল না। কিন্তু এটা বুঝতে পারছে, ও কোন ব্যাপার না, ব্যাপারটা গুরুদেব। গুরুদেব আছেন, গুরুদেব বলেছেন বলেই, ও আছে, অর্থাৎ মায়ের মনে আছে, এসে গিয়েছে, এবং গুরুদেব বলেছেন বলেই, মায়ের কাছে, ওর নবজন্ম হয়েছে। কারোর চিন্তার মধ্যেই, কেউ ছিল না, ওর চিন্তার মধ্যে মা ছিল না, ঘরে এসে গেল বলে, মায়ের চিন্তা এল, এবং গুরুদেব হঠাৎ বলেছেন বলেই, মায়ের মনে ওর চিন্তা এসেছে। যদি বা, মায়ের মনে ওর চিন্তা এসেছে, যদিবা, মায়ের মুখে তো এটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, মা গুরুদেবের কথার ঘোরেই রয়েছে, এবং বলছে, 'বলব বৈকি, আমি ওকে আপনার কাছে আসতে বলব, আমি নিজেই নিয়ে আসব, আপনি ওর জন্য এত ভাবেন……।'

'রাসকেল'। ও আবার মনে মনে বলে উঠল, এবং তক্তাপোশের তলা থেকে, ছুঁড়ে দেওয়া জামাটা না বের করে, হ্যাঙার থেকে অন্য একটা হাওয়াই নিয়ে গায়ে দিল, আর মা দরজার দিকে যেতে যেতে বলতে লাগল, 'দেখি তো, রান্নার কী ব্যবস্থা আছে না আছে। কিন্তু বুঝলি বুলু……'। মা আবার ওর দিকে ফিরল, বলল, 'তুই একবার চলিস।' মায়ের মুখ সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক, তার বিলু তার চোখের সামনে আছে বলে মনে হল না, এবং মা ঠিক যেন বিলুর দিকেও তাকিয়ে নেই, ঘোর লাগা চোখের দৃষ্টি অন্য কোনখানে। বুলুর মনে হয়, ওর বুকের মধ্যে চারিদিক জুড়ে আবার সেই অন্ধকারই যেন ঘিরে আসছে।

কিন্তু কেনই বা অন্ধকার ঘিরে আসে। ওর মনে হল এই অন্ধকারটা ও নিজেই হয়ত তৈরি করছে, ডেকে আনছে, কেন না, সকলের সঙ্গে, ওর তফাত কোথায়, ও কী, ও কে, যে, ওর ভিতরে অন্ধকার ঘিরে আসে। এটা, এই অন্ধকার, আসলে হয়ত, ওর

একটা—একটা কী বলা যায়, অভিমান? অথবা হতাশা, বা নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়, যে অসহায় অবস্থাটা ও নিজে পুরোপুরি জানে না, বুঝতে পারে না, অথচ অন্যদের আচরণের সময়, তাদের এত দূরে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে মনে হয়, ওর ভিতরের হতাশা বা অসহায়তা বা অভিমান, যা-ই হোক, অন্ধকার ডেকে নিয়ে আসে। বুলু নিজে কি ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আছে। মা গুরুদেবে আছে, নীলিমা সমীরে আছে, টুলু ওর সেই মিষ্টি মেয়ে বন্ধুটি বা আরও সব বন্ধু বা কেবলমাত্র নকশালবাড়িতেই আছে, মহেন্দ্রদা একমাত্র নেতা হতেই আছে, লোকাল পার্টির নেতৃত্ব রাখতেই আছে, নন্দিতা শুধু বাঙালী ড্রাইভারের ক্যানাডিয়ান এঞ্জিন হয়ে ছুটছে, অথবা ও যা যা ভাবছে, এ সবের মধ্যে, এরা কেউ-ই নেই, একেবারে ভিন্ন, অন্য কিছুতেই আছে, কারোর কাছেই ও নেই। তাতেই বা কী। ওর কাছে কে আছে, কারা আছে। হয়ত কিছু একটা আছে, কেউ হয়ত আছে, কিন্তু বাড়িতে, বাইরে, যা কিছু আছে, যারা রয়েছে, যাদের সঙ্গে বা আশেপাশে ফিরছে, তারা কি ওর কাছে আছে। কেউ নেই, কিছুতেই নেই, তবু কেন অন্ধকার ঘিরে আসে—ঘিরে আসে, আসতে আসতে, হঠাৎ এমনভাবে বুকের কাছে চেপে ধরে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে যায়, নিজেকে ল্যাংটো করে, বাহ্যজ্ঞানরহিত করে দেয়, কী বিশ্রী আর ভয়ঙ্কর। 'এ অন্ধকার থেকে রেহাই দাও।' মনে মনে বলে উঠল ও, আর জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে ভয় ভয় চোখে তাকাল, এবং আবার মনে মনে বলল, কী যেন সেই কবিতাটা—না, গান বোধহয়, কী যেন সেই গানটা, কার যেন লেখা, নীলিমার মুখেই তো শুনেছে বোধহয়, নীলিমার গলায়, সেই গানটা, রাস্তার ভিখিরি মেয়েমানুষের মত শোনাত, ও সব গান নীলিমার গলায়, ভিখিরিদের মতই শোনায়, কী যেন—হ্যাঁ, "এ অন্ধকার ঘুচাও তোমার অতল-অন্ধকারে।" কার অতল অন্ধকারে, আমি জানি না, হয়ত যার গান, সে ঈশ্বর-টিশ্বরের কথা ভেবেছে, আমি আমারই অন্ধকারে তলিয়ে

দিতে চাই, তা না হলে, বুলু, তোর মুখে লাতথি, তোর মুখ আগুনে গুঁজে দিই, তুই মর।...

যেন রাগে দিশেহারা হয়ে পড়েছে ও, আর এভাবে কথাগুলো বলতে ইচ্ছা করলে। ও যেমন, সকলেই তাই, তবে এই একটা জঘন্য অন্ধকার ওকে ঘিরে আসে কেন, যে অন্ধকারকে ও চেনে না, কেবল একটা কষ্ট এবং ভয় হয়। অথচ, আসলে তো, ও মহৎ না, মহানুভব বা মহাপুরুষও না, যাদের হৃদয় মন, ইত্যাদি সব, মানুষের সঙ্গে মানুষের, সম্পর্কের দূরত্বে, ব্যথায় দুঃখে কাতর হয়ে ওঠে, এবং সেই ব্যথা বা দুঃখকে, ওই সব লোকেরা, অন্ধকারও বলে না, হয়ত তাঁদের ভাষায় অন্য কিছু বলে। ওসব ও জানে না, ওরটা নিতান্ত অন্ধকার, বিশ্রী আর জঘন্য, ভয়ের। নন্দিতার সঙ্গে, একসময়ে একটা অন্যরকম সম্পর্ক ছিল, আর মা, বিশেষ করে মা, বলেই কি এদের বিরাগ, বিতৃষ্ণা, আপন ঘোর এবং অন্যমনস্কতা এমন অন্ধকারে ভরিয়ে দেয়। 'উল্লুক, গাধা, ইডিয়ট'। নিজেকে ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রূপ করে, ধমকে উঠল ও। খোকা! কিছুই যেন বোঝে না ও। সকলেই নিজে, নিজের আছে, যদি বা, একথা সত্যি, আবার সকলেই সকলের জন্য আছে, যেটা একটা ব্যবস্থা। মাকে নিয়েই বা এত ভাববার কী আছে। সেই যে সব কতগুলো কথা আছে, 'নাড়ির টান', 'মাতৃঋণ' কথাগুলোর অর্থ কী। মেয়েমানুষের বাচ্চা হয়, তাতে নাড়ির ব্যাপারটা কী আছে। একজন পুরুষের সঙ্গে শোয়া, সুখ, জরায়ুতে অপেক্ষমাণ একটা ডিম্বাণু, যেন হাঁ করে আছে পুরুষের বীর্য থেকে এক বা একের বেশি একটা কীটকে কপাত করে গিলে নেবে, ডিম্বাণুটা বড় হতে থাকবে, কারণ ভিতরে থাকা কীট বড় হতে থাকবে, সবই বড় হতে থাকবে, কীটটা আস্তে আস্তে মানুষের বাচ্চার মত দেখতে হবে, বড় হতে থাকবে ডিম্বাণুটার খোলসের মধ্যে, তারপরে যথানিয়মে, বাচ্চাটাকে বের করার জন্য এক সময়ে, একদিন, ব্যথা আর যন্ত্রণার সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে, কারণ, তখন যেভাবেই হোক বাঁচাতে হলে, ওটাকে বের করে দিতেই

হবে, তা না হলে মরণ, এবং তারপরে সেই খোলসটাকে জরায়ুর মধ্যে রেখেই মানুষের বাচ্চাটা বেরিয়ে আসবে তখন একটা নাড়ির যোগাযোগ থাকবে বটে, কিন্তু সে একটু সময়ের জন্য মাত্র, কারণ নাড়িসহ সেই খোলসটা পর্যন্ত বের করে ফেলতে হবে, যাকে লোকেরা ফুল বলে, বোধহয় একটা মাটির গাছের ফুলের মত, কল্পনায় যার খসে যাওয়া পাপড়ির ভিতরে, ফল জন্মায়, আর সেই খোলসটা থেকে, নাড়ি কেটে, বাচ্চাটাকে আলাদা করে নিতে হবে, খোলসটা ফেলে দিতে হবে। ওকেই কি নাড়ির টান বলে। 'টান' কথাটা তো যেন একটা অন্যরকম কথা, অন্যরকম একটা অর্থ এই কথায়, একটা যেন অন্য সুর বেজে ওঠার মত, মনের সঙ্গে, যার যোগাযোগ, কিন্তু নাড়ির ব্যাপারটা তো আসলে প্রবৃত্তি, প্রাকৃত, এবং মানুষের বাচ্চাটা শরীরের কতগুলো অবুঝ আরাম আর কষ্ট ছাড়া, কিছুই জানে না, সে কোথা থেকে কোথায় কেন এল, যেটাকে ভবিষ্যতে বলা হবে 'মাতৃঋণ' কেন না, মা তখন বাঁচিয়েছিল, যে বাঁচানোটা মায়ের একটা প্রবৃত্তি, একটা আসক্তি, বুকের দুধ দিয়ে পেট ভরানো আর খুব করে আদর করা, খুব করে চুমো খাওয়া, আর বুকটা ছ্যাৎ ছ্যাৎ করে ওঠা, যেটা মানুষের একমাত্র অহঙ্কার বা, তাজ্জব কিছু না, পশুরাও একই এই ব্যাপারে। ওর ঠিক ভাল মনে আসছে না, কী যেন একটা ভাল কথা আছে, এক কথায় বলা যায়, একটা কী কথা—একটা হ্যাঁ, 'জীবপ্রবৃত্তি'। এটা একটা জীবপ্রবৃত্তি। এ যেন অনেকটা, ভিনি ভিসি ভিডি এর মত, এলাম দেখলাম জয় করলাম, সেইরকম, শুলাম, পেটে ধরলাম বের করে দিলাম, ইজেকশন। শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন সেইদিনই, তারপরে সম্পর্ক রিলেশন, একটা গড়ে ওঠার বিষয়, টান তো সেখানেই তবে এই গালভরা কথাগুলো কেন, 'নাড়ির টান' 'মাতৃঋণ' সাজানো সাজানো, তৈরি করা, যেন বেশ একখানি কথা বলা গেল। জীবপ্রবৃত্তি একটা খুব সুন্দর ব্যাপার, কিন্তু এখন মায়ের কী করবার আছে, কী উপায় আছে, গুরুদেবে থাকা ছাড়া। মা এখন নাড়ির টানে বিচলিত না, গুরুর

টানে বিচলিত, এবং বুলুরই বা মাতৃঋণ শোধের কী আছে। ও যে এই পৃথিবীতে এসেছে, মা যে ওকে এনেছে, সেটাই ওর মাতৃঋণ—কথাটা কী রকম হাস্যকর শোনাচ্ছে, যেন মাকে ও মাথার দিব্যি দিয়েছিল, আমাকে পৃথিবীতে নিয়ে এস। যে আসতে চায় কী না, বাঁচতে চায় কী না, কোন জিজ্ঞাসা-ই নেই তার ঘাড়ে একটা ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

॥ ৮ ॥

অবিশ্যি একথা ঠিক বলু এই পৃথিবীতে বাঁচতে চায়, কিন্তু মায়ের জন্য না। মাও বুলুর জন্য বাঁচছে না। মা বাঁচছে মায়ের কারণে আর বুলু বাঁচছে নিজের কারণে। বুলু ওর নিজের প্রতিটি অণুকে নিয়ে বাঁচতে চায়, যাতে ও নিজেকে সবদিক থেকে রক্ষা করতে পারে, কত লোক সংসারে মরে যায়, মরছে রোজই প্রায় চোখের সামনে। চেনা পরিচয় থাকলে, অনেক কথা মনে পড়ে এবং যা একান্তভাবে মানুষের বুদ্ধির অগম্য মনটা যেমন কেমন করে, যে কেমন করাটা, অনেকটা জীবতত্ত্বের মধ্যেই পড়ে, কারণ শোকটাও মানুষের একচেটিয়া ব্যাপার না, পশুদের মধ্যেও ওটা আছে। তথাপি এ কথা ঠিক মানুষের মরা দেখে, মানুষ নিজের সম্পর্কে আরও বেশি সজাগ হয় জেনে বা না জেনেও। মানুষ তার নিজের বাঁচাটাকে নিজের মন যা কিছু, সুখ অসুখ ভয় বিপদ আকাঙ্ক্ষা, সব মিলিয়ে, তার গোটা অস্তিত্বটাকে নিয়ে বাঁচে এবং এই বাঁচাটা অবিশ্যি তেমন না, সব সময়ে মরার ভয়ে যারা বাঁচে। বুলু নিজেও এর কোন কারণ জানে না, কেন মরার ভয় ওর নেই। যদি মরণ আসে কোন রকমে, আত্মহত্যা বা জেনেশুনে কোন কারণে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরা না কিন্তু যেভাবেই হোক, মরণ যদি আসেই, আসবে, সেই চিন্তায় কখনও ওর মন কোন উদ্বেগ বোধ করে না। ও জানে না, এটা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার কী না, যদি না, মানুষ হিসাবে

নিজেকে খুব একটা সাহসী মনে করে না। সাহসী বলতে যাদের বোঝায়, কী যেন একটা কথা আছে—অ—অকুতোভয়, ও তা না। তবু, ও যদি মরে যায়, সেটা মাথায় হাত দিয়ে, ভয়ানক একটা ভাববার মত ব্যাপার বলে ওর মনে হয় না যদি বা, মরাটাকে ও কখনোই সহজভাবে মেনে নেবে না, যতক্ষণ হোক, যে-ভাবেই হোক, যে-পরিবেশেই হোক, চেয়ে বা না চেয়ে পাওয়া, জিজ্ঞাসার অনেক ওপরে এই অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য, ও প্রাণপণে লড়বে। অসুখে বিসুখে বা পশু বা মানুষের আক্রমণে, যে ভাবেই মরতে হোক। মরাটা জন্মের মতই আকস্মিক ব্যাপার কী না, ও বোঝে না। 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে, এরকম একটা ভাবনা থেকেই যে মরার বিষয়ে ওর ভয় বা উদ্বেগ নেই, তা না, সম্ভবত মানুষের জন্ম তার ইচ্ছাধীন না, সে চাক বা না চাক বহুলক্ষ বীর্যকীটের একটি সে, জরায়ুর ডিম্বাণুর মুখের গ্রাসে গিয়ে পড়ে। এই ভাবনা থেকেই বিপরীত দিকে মরাটাও সেই রকম একটা কিছু, ওর ইচ্ছাধীন না, অতএব কী করা যাবে যদি মরতে হয় মরবে। ওর ভাবনাটা এইরকম।

কিন্তু সে কথা যাক গিয়ে মাতৃঋণ বা নাড়ির টান, এ কথাগুলো মানুষ অনেকটা দেয়ালা করবার মত, তৈরি করেছে, ঋণ বা টান এসব কোনটাই, প্রবৃত্তিজাত বা প্রাকৃত কিছু না। বুলুর বিশ্বাস, রক্ত বা শারীরিক সম্পর্ক থাকলেই ঋণ বা টান জন্মায় না। ঋণ বা টানের সম্পর্ক আলাদা। রক্তের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই, আবার থাকতেও পারে, কিন্তু রক্তের সম্পর্ক মাত্রেই ঋণ বা টান না, রক্তের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, মানুষ পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করেছে, খুনোখুনি করেছে। না থেকেও, মানুষ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে, আলিঙ্গন করেছে, অবিচ্ছিন্ন থেকেছে। বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন সবই মানুষের মনের বিষয়। ওকে মা চেনে না, বোঝে না, ও মাকে বোঝে না। জন্মসূত্রে একটা সম্পর্ক মাত্র। তবে কেন ওর মনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এ অন্ধকার থেকে ও নিষ্কৃতি চায়।

অথচ যেখানে ও দিবারাত্র অবিচ্ছিন্ন যেন একটানা একটা নদীর মত বহে চলেছে, সেখানে একটা মস্ত বড় শূন্যতা। সেখানকার খবর কেউ বলে না, বুলু নিজেও জিজ্ঞেস করতে পারে না। কেবল একটি মুখ চোখের সামনে ভাসতে থাকে যে মুখটা চেনা চেনা অথচ ক্ষণে ক্ষণে অচেনা হয়ে ওঠে। আর তখনই, ওর ভিতরে একটা ভয়ানক আলোড়ন হতে থাকে। মনে হয়, জানু পেতে বসে হাত জোড় করে, চিৎকার করে কাঁদে, বলে, 'একবার দেখা দাও আমাকে, ক্ষমা কর, আমাকে মার, আমাকে জ্বালাও পোড়াও আমাকে ক্ষমা কর।'

এ কথা মনে হতেই, ও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, নামটা যেন মনে পড়েছে, বুলুর, তার নাম, তার নাম ছিল, মোম ডাক নাম. মোম ভাল নামটা যেন কী, মনে পড়ছে না, কিন্তু ডাক নামটা, ছিল, ডাকাডাকি করার, তুলে রাখার জন্য না, কোন সার্টিফিকেটে বা অন্য কোন কিছুতে, মোম, যে-নামটার মধ্যে বুলু সব সময়ে বইছে। ও তাড়াতাড়ি মাকে খুঁজতে চলল, মা তোমরা আমাকে মোমের কথা আর বল না কেন, মোম কোথায় আছে, মোমরা কি······।

'বুঝলি কাশী, গুরুদেবের সে কি সুন্দর কথা···।'

মা চাকর কাশীকে গুরুদেবের সুন্দর কথা শোনাচ্ছে, বোধহয়, কী রান্নাবান্না হবে, সে কথা বলতে এসে, গুরুদেবের কথা আগে বলে নিচ্ছে, কারণ গুরুদেবের ঘোর এখনও কাটে নি। আর এই মহিলাকে ও মোমের কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। সত্যি কি এ নামটা এই ক'দিন ওর মনে পড়ে নি, নাকি, নামটা এত বেশি ছেয়ে রয়েছে যে, আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না বলে নামটাও মনে পড়ছিল না। ওর চোখের সামনে একটা রাস্তা ভেসে উঠল. একটা বড় রাস্তা ট্রাম লাইন পাতা, তার পাশ দিয়ে, বে.নাকুনি বেরিয়ে গিয়েছে আর একটা রাস্তা. ডান দিকের কোণে, আর ডান দিকে সোজাসুজি আর একটা রাস্তা, মাঝখানে একটা ছোট আইল্যাণ্ড যেটাকে

কলকাতার কর্পোরেশনের সেইসব নোংরা আবর্জনাগুলো, যাদের শরীর বা চেহারা বা স্বর অবিকল মানুষেরই মত, যারা কর্পোরেশনকে চালায়, কোনটার নাম মেয়র, কোনটা বিভাগীয় অফিসার—বুলুর এই রকমই মনে হয়, যেন কলকাতা কর্পোরেশনটা ওদের কাছে, ভিড় ঠাসাঠাসির মধ্যে একটা অচেনা যুবতী মেয়ে, চোরা হাত গলিয়ে যে যতটুকু পারে, তুলে নিচ্ছে, কিংবা মেয়েটাকে উদ্ধারের নাম করে, নিজের নামটা বীরের মত, মেয়েটারই গায়ে চেপে দিচ্ছে, সেই তারা আইল্যাণ্ডটাকে একটা ছোট সুন্দর মখমলের মত ঘাস ছড়ানো, ফুলের বাগান করতে চেয়েছিল, যদিবা সেটা এখন একটা নোংরা, আবর্জনার আইল্যাণ্ড হয়ে উঠেছে, আর সেই আইল্যাণ্ডের বাঁ দিক দিয়ে, সোজাসুজি ডাইনের রাস্তাটা গিয়েছে, যে-রাস্তার দুপাশে, নতুন পুরনো, সব রকমের বাড়ির সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে, কি যে কারণে বোঝা যায়। রাস্তাটা এখনকার না, নতুন পাড়া না, পুরনো, সেই রাস্তাটা ওর চোখের সামনে ভাসছে। সেই রাস্তাটাতেই ও একটা নদীর মত বহে চলেছে, অবিচ্ছিন্ন, অথচ সেই রাস্তাটার কথা ওকে কেউ বলে না, ও তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে পারে না। বুলু সেই রাস্তাটা এখন খুঁজতে যাবে।

উঁহু, মাকে ইচ্ছা করছে, একটা কম্বল চাপা দিয়ে, কোথাও ফেলে দিয়ে আসে, কী একটা বাজে গল্প ফেঁদে বসেছে গুরুদেব সম্পর্কে, আসলে মা, বুলুকেই শোনাচ্ছে, কাশীকে শোনাবার নাম করে, কারণ মা ভেবেছে বুলু এঘরে এসে গুরুদেবের কথা শুনতে শুনতে এমন মোহিত হয়ে পড়েছে যে আর নড়তে পারছে না, এবং কাশীটা ঠিক যেন ভেড়ার বাচ্চার মত দেখতে···বুঝলি কাশী, গুরুদেব বলেছেন, আর আমার গায়ের মধ্যে কী রকম কাঁটা দিচ্ছে। ভাব, উনি খেতে বসেছেন, 'খেতে খেতে হঠাৎ দেখলেন, ওঁর এক পরম শিষ্য, গঙ্গা পার হতে গিয়ে, দারুণ ঝড়ের মধ্যে পড়েছে আর ওঁকে ডাকছে, "হে গুরু রক্ষা কর, রক্ষা কর" সেই ডাক শুনে উনি তৎক্ষণাৎ নিজের শরীরকে খাবার আসনে রেখে, ঝড়ে সাজ্ঞাতিক গঙ্গায় চলে গেলেন,

মোচার খোলার মত, ডুবন্ত নৌকা দুহাত দিয়ে স্থির করে রাখলেন। শিষ্য তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল, তিনি এসেছেন, এদিকে গুরুদেবের মা ঘরে ঢুকে দেখলেন, তাঁর ছেলে যেন এঁটো হাতেই জপে বসে গেছে। কিন্তু এমন তো কোনদিন দেখেন নি যে, তাঁর ছেলে খেতে বসে, এমন ধ্যানস্থ হয়ে পড়েন। তাই তিনি ছেলের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, ডাকতে লাগলেন, কোন জবাব পেলেন না। মায়ের মন, কেমন যেন ভয় পেলেন, তাই গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে গেলেন, আর যে-ই গায়ে হাত দিয়েছেন অমনি গুরুদেব মাটিতে পড়ে গেলেন, শরীর একেবারে ঠাণ্ডা, প্রাণ নেই যেন। মা তো কাঁদতে বসে গেলেন। খানিকক্ষণ বাদেই গুরুদেব আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। মা তো অবাক। তাড়াতাড়ি ছেলের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, "তোমার কী হয়েছিল বাবা?" গুরুদেব বললেন, "কিছু হয় নি তো মা। গঙ্গায় বড় ঝড় হচ্ছে. গঙ্গা পার হতে গিয়ে, সেই ঝড়ে পড়েছিল। আমাকে ডাকছিল, তা-ই সেখানে গিয়েছিলাম।" কাশী, একবার ভেবে ছ্যাখ্ গুরুদেবের বাড়ি থেকে গঙ্গা, কিছু না হোক চার পাঁচ মাইল দূরে।'…

বলতে বলতে মায়ের চোখে প্রায় জলই এসে যাচ্ছে যেন. আর ভেড়াটা একেবারেই যেন ভেড়া হয়ে গিয়েছে, এবং বুলুর এখন গুরুদেবকে প্রায় শুয়োরের বাচ্চা বলতে ইচ্ছা করছে। কী ভয়াবহ শয়তান লোকটা, আর মাকে কী বলা যায়, ও ভেবে পাচ্ছে না, একমাত্র মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া ছাড়া, মাকে আর কিছু করার নেই। ও তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে পা বাড়াল, টেলিফোনটা বেজে উঠল। বুলু যে-কদিন বাড়িতে এসেছে একদিনও টেলিফোন ধরে নি, কারণ, ওর মনে হয়, ওকে কেউ চিনবে না ও কাউকে চিনবে না, এখন সবই ওর কাছে অচেনা। মা নিজেই তাড়াতাড়ি টেলিফোনটা ধরল। বুলু তখন ঘরের বাইরে, সেই রাস্তাটা ওর চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু মায়ের গলা ও শুনতে পেল, বুলু…। মা গলা তুলে ওকে ডাকল, অথচ বেশ বোঝা যাচ্ছে, এখন মায়ের

গলায় গুরুগানের রেশ। বুলুর মনটা হঠাৎ যেন কেমন চমকে উঠল কে ডাকছে ওকে। পাঁচ বছর কযেক মাস বাদে, এই প্রথম টেলিফোনে ওকে কেউ ডাকছে। কোথা থেকে কে ওকে ডাকতে পারে। কেমন যেন একটা ভয়, একটা সন্দেহ এবং একই সঙ্গে একটা আশাতে, ওর বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগল।

ঘরে ঢুকে বুলু মায়ের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু মা ওকে কারোর নামই বলল না, কেবল রিসিভারটা তুলে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোর ফোন'।

বুলু রিসিভারটা হাতে নিতেই, মা তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বলল, 'কাশী রাঁধতে রাঁধতে তোকে গুরুদেবের কথা বলব, শোন একবার বাজারে···।'

বুলু বহুকাল বাদে, রিসিভারে মুখ রেখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল 'হ্যালো'।

জবাব এল, 'কে বুলু, বাহ্ তোর গলাটা টেলিফোনে দারুণ লাগছে, ঠিক যেন সত্যজিৎ রায়ের গলা, সেই যে রবীন্দ্রনাথের কমেন্টারি।'

বুলু চিনতেই পারছে না, কার গলা শুনছে, ও শুধু শুনেই যাচ্ছে। আবার জিজ্ঞাসা এল, 'কী করছিলি, ঘরেই ছিলি নাকি?'

গলাটা প্রায় চেনা চেনা লাগছে, টেলিফোনে চিনতে হয়ত অসুবিধা হচ্ছে, তবে যা বলছে, তার কথাবার্তা একটু জোরে বলা অভ্যাস গলার স্বরটা সরু ভাবের, আর বেশ তাড়াতাড়ি। ও বলল, 'না, আমি একটু বেরচ্ছিলাম।' ওপারের কথা, 'ও, আচ্ছা শোন, তোকে যে কারণে টেলিফোন করছিলাম, ড্রেইজারেব কথা তোকে যেটা বলেছিলাম।'

ড্রেইজার। সেটা আবার কী, তার কথা আবার কে বলেছে ওকে কিছুই ঠিক মনে করতে পারছে না, তবু শুনে যেতে লাগল, 'কথাবার্তা এক রকম পাকাপাকি, তবে ওই বাস্টার্ড লাটু বোস্ বানচোত শালা, তোর বিরুদ্ধে....... ।'

বুলুকে বলতে বলতে, টেলিফোনের স্বর, পাশে আর একজনকে বলে উঠল, 'খিস্তি করব না তো কী, লাটু বোসের নামে খিস্তি না করে আমি কথা বলতে পারি না। আর আমি তো বলছি বুলুকে, তাও টেলিফোনে লাটু বোস শালা আমার সামনেই ডিরেক্টরকে, বুলুর নামে যা তা বলতে আরম্ভ করেছিল। শুয়োরের বাচ্চা, নিজের বউটাকে সবাইকে খাইয়ে খাইয়ে যাক গে, বুলু শোন, তোর সঙ্গে তো কাল একবার দেখা হওয়া দরকার। হ্যাঁ, বাদ দাওতো, আমার মুখ ওই রকমই বুলু মোটেই কিছু ভাবছে না, তুই কিছু ভাবছিস বুলু। লাটু বোসকে আমি গালাগাল দিলাম বলে। বিশ্বাস কর মাইরি, ডিরেক্টর পি কে-কে, আমার সামনেই তোর সম্পর্কে এমন বলতে লাগল, যেন তুই একটা মারাত্মক কোন জীব ইনশান, ম্যাড অ্যাবনরম্যাল, পার্ভার্ট, মানে সেই পুরনো কাসুন্দি কেস কাঁচিয়ে দিয়েছিল আর কী। আমিও ছাড়ি নি, আমি পি কে ওর সামনেই বললাম, আপনি কার সম্পর্কে কী বলছেন। ছ বছর আগের একটা ঘটনা নিয়ে একটা লোকের সম্পর্কে এসব বলছেন, এখন তাকে দেখলে, আপনার নিজেকেই অ্যাবনরম্যাল আর ইনশান বলে মনে হবে। লেট মিস্টার ডিরেক্টর সী বুলু, আই থিংক হি ইজ মোর এফিসিয়েন্ট দ্যান ইউ টু অ্যাণ্ডারস্ট্যাণ্ড পীপল। তারপরে শালা চুপ করল। আসলে বুঝলি তো বুলু লাটু বোস ভাবছে ড্রেইজার এ কিছু হলে, সবই ওর হাত দিয়ে হবে। 'আচ্ছা শোন পি কে তোকে একদিন নিয়ে যেতে বলেছেন।'

স্বরটা থামল, বুলু এখনও কিছুই ধরতে পারছে না ব্যাপারটা কে কথা বলছে, তাও সঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এবং ড্রেইজার পি কে লাটু বোস এসব কোন নামও কোনদিন শুনেছে বলে মনে করতেও পারছে না। আবার টেলিফোনে কথা এল, 'তাহলে কাল তোর সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে তখন ঠিক করে নেওয়া যাবে, কবে পি কে-এর সঙ্গে দেখা করতে যাবি। তুই এখন কোথায় বেরচ্ছিলি ?'

আশ্চর্য, বেশ চেনাই তো লাগছে গলাটা, তবু কোথায় যেন

স্বরটার মধ্যে একটা বেশ ভারিক্কি চাল আছে, যে কারণে, ওর থেকে থেকে সন্দেহ হচ্ছে, বড় মেলামেশার কথা বলছে কী না, এবং ড্রেইজার পি কে লাট্টু বোস

বুলু বলল. 'এমনি বেরচ্ছিলাম. বিশেষ কোথাও না।'

কথা এল 'ওরে চলে আয় না আল্‌বামায়।'

জবাব এল, 'হ্যাঁ আল্‌বামায। গরিবের এই ভাল ভাই, বেশ নিরিবিলি আছে, জায়গাটাও খারাপ না. এর থেকে সস্তা—অ্যাঁ, কী বললে? বাহবা এতে লজ্জার কী আছে, বুলু এলই বা। বুলু তো সবই জানে, ওর কাছে তো কিছু লুকনো নেই, আর আমি ওর সামনে—আহ্, মুখে হাত চাপা দিও না, আচ্ছা. ও সব কথা কিছু বলছি না। হিঃ হিঃ হিঃ. বুঝলি বুলু আল্‌বামা হচ্ছে সব থেকে সস্তার হোটেল অ্যাণ্ড বার। তুই এখানেই চলে আয় না. আমি একটা ঘর নিয়ে একটু আড্ডা, দিচ্ছি, অবিশ্যি জানি না তুই আবার ব্যাপারটাকে কীভাবে নিবি, আমাকে তো তুই জানিসই—।'

ও, এতক্ষণে বুলু চিনতে পারল, সমীর কথা বলছে। সমীর ওর বোন নীলিমার প্রেমিক, ভবিষ্যতে কোন একদিন বিয়ে হবে. এটা মোটামুটি ঠিকঠাক হয়ে আছে, যদি বা, কেউ-ই জানে না. কবে সেই ভবিষ্যতের দিনটি আসবে। ধরে নেওয়া যায়, সমীরের হাতে কিছু পয়সা আছে, যে কারণে আল্‌বামায় একটা ঘর ভাড়া করে নীলিমাকে নিয়ে গিয়েছে, এতক্ষণে বোধহয ওদের রোজকার যেটা অভ্যাস, সেটা হয়ে গিয়েছে। এই ঠিক আফিমের নেশার মত কী না ও জানে না, তবে মনে হয়, সমীর আর নীলিমাকে. এভাবে রোজ রোজ অভ্যাস অনুযায়ী মিলতে না দিলে, একটা কিছু ঘটে যেত, হয় বিয়ে না হয় কাট্টি। অবশ্যি নীলিমার যদি ভাল লাগে. সমীরের যদি এটাই বেশ মানানসই বলে মনে হয়, তবে কার কী আপত্তি থাকতে পারে। পরে, কেউ কারোর দোষ দেওয়া ঝগড়াঝাটি কান্নাকাটি না করলেই হল। সমীর নিশ্চয়ই, দু তিন পেগ ড্রিঙ্ক করেছে. কে জানে. নীলিমাও আজকাল ধরেছে, কী না, আশ্চর্য

হবার কিছু নেই। সেইজন্যই বোধহয়, সমীর কোন একটা লাটু বোসকে এত গালাগালি দিতে পারছিল. আসলে মদ খেলেই তো মনের আর জিভের আড় ভেঙে যায়। একটু বেশি কথা বলা যায়। কিন্তু ড্রেইজার. লাটু বোস, পি কে এগুলো তখনও ওর কাছে অস্পষ্ট, কোনদিন সমীর এসব বলেছে বলে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না। ভাগ্যিস্, সমীরকে চিনে ফেলতে পেরেছিল, তা না হলে, 'আপনি আজ্ঞে' করে কথা বলতে যাচ্ছিল প্রায়। বুলু বলল, 'আমি এতক্ষণ বুঝতেই পারছিলাম না. তুই কথা বলছিলি।'

'কেন?'

'গলার স্বরটা চিনতে পারছিলাম না। ও ছাড়া ড্রেইজার মানে—'

'ভুলে গেছিস তো। তোকে পরশু দিন বলেছিলাম না, ড্রেইজারে তোর একটা চাকরির কথা বলব. ড্রেইজার. দ্যাট অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাণ্ড পাবলিসিটি ফার্ম।'

বুলুর অস্পষ্টভাবে মনে হল. এরকম কিছু একটা যেন সমীর বলেছিল, তবে চাকরির কথা যে হয়েছিল. সেটা ওর পরিষ্কারই মনে আছে, ড্রেইজারের কথা ওর মনে নেই, তথাপি বলল. 'হ্যাঁ মনে পড়েছে. বলেছিলি। তা, লাটু বোস কে?'

'শালা একটা ফোঁপর দালাল, কিছু শেয়ার টেয়ার কিনে, ড্রেইজারের শরিক হয়েছে, কিন্তু ওরকম শরিক অনেক আছে, তাতে ডিরেক্টর হওয়া যায় না। ওর ভাবটা যেন, ও এখনই ডিরেক্টর হয়ে গেছে। কিন্তু পি কে ঘোষ তো খুব ভাল লোক, বোঝেন। ওখানে চাকরি করি না বটে, তবে উনি আমাকে খুব ভালবাসেন, বিশ্বাসও করেন। সেইজন্যই ওঁর কাছে. তোর জন্য দরবার করেছিলাম। হয়েও যাবে একটা কিছু। ক্ল্যারিকালটা আমার খুব পছন্দ না. তবে আপাতত তাই যদি দেন, তাই নিয়ে নিবি। বসে থাকার থেকে একটা কিছু করা ভাল। আমি তো বুঝি তোর কীভাবে কাটছে

এখন দিনগুলো, তার চেয়ে দশ জনের মাঝখানে কাজকর্ম নিয়ে থাকলে—অবিশ্যি আমি ওঁকে বলেছি, মানে পি কে-কে তোর যা বাংলা ইংরেজী ভাষার জোর আছে, তাতে তুই, ভবিষ্যতে ভাল ক্যাপশনও লিখতে পাববি।'

বুলুর একটা চাকবির দরকার, শুধু সমীর যে কারণ বলল, সেই কারণেই না, যে, একরকমভাবে ওর সময় কাটছে না। আসলে কাজ না করে, টাকা রোজগার না করে, এভাবে বসে বসে ওর দিন চলবেই বা কেমন করে। কিছু তো করতেই হবে, সব মানুষকেই করতে হয়। ও বলল, 'হ্যাঁ, যা হোক একটা হলেই হল, কিছু রোজগার করা নিয়ে কথা।'

সমীর বলল, 'হ্যাঁ, সেটাও একটা কথা.... অ্যাঁ, কী বলছ? দাড়া বুলু, নীলি কিছু বলছে, শুনে নিই— '

সমীর আদব করে নীলিমাকে নীলি বলে। হয়ত, হযত সমীরেব পিঠে চেপে, ঘাড়ে হাত দিয়ে দাড়িযে আছে নীলিমা। এখন বোধ-হয়, বিযে করে, একটা সংসাবেব মধ্যে রোজ বোজ দেখা হওয়া বান্না খাওয়া, একই ঘবে, একই বিছানায়, বোজ বোজ শোয়া, ওদের আব ভালও লাগবে না। এখন বোধহয়, রোজ একবার কোথাও কোন আড়ালে গিযে, এক সঙ্গে শোয়ার মতই, এটাও ওদের রক্তে গছে গিয়েছে যে, নানাখানে, নানা জায়গায়, নানা রকমারি ঘরেও বিছানায় ওরা শোবে। সমীরের গলা শোনা গেল, 'শোন বুলু, তুই তাহলে আসছিস?'

বুলু বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না। তোরা কতক্ষণ আছিস?'

'আমরা মানে, নীলি তো একটু পরেই চলে যাবে। আমি কতক্ষণ থাকব, ঠিক বলতে পারছি না। একদিনের জন্য আল্‌বামায় ঘর নিয়েছি।' হোটেলটার নাম আল্‌বামা কেন, বুলু তার কিছুই বুঝতে পারছে না। 'বেড অ্যাণ্ড ব্রেকফাস্ট, এমনও হতে পারে, রাত্তিরটা হয়ত এখানেই থেকে গেলাম—আচ্ছা, ওরকম করছ কেন নীলি, সত্যি কি আর আমি রাত্রে হোটেলে থাকতে যাচ্ছি নাকি,

একটা কথার কথা মাত্র······হ্যাঁ বুলু, তুই যদি আসবি বলিস, তাহলে আমি অপেক্ষা করব।'

বুলু এক মুহূর্ত ভাবল মোম আর সেই রাস্তাটার কথা ওর মনে পড়ছে —পড়ছে না, মনের মধ্যে জেগেই রয়েছে, যদি বা রাস্তাটার চেহারা সামনে ভাসলেও, 'গেলাম—আচ্ছা, ওরকম করছ কেন নীলি, পারছে না, মোম মোম, মোম-আহ্‌ না থাক, আচ্ছা সমীর, আমার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিস না, পারি তো একবার যাব, তখন তোকে গিয়ে না পেলেও, ক্ষতি নেই। তাহলে কাল—।'

ওর কথার মাঝখানেই, সমীরের গলা শোনা গেল, যদি বা, ওর উদ্দেশে না কথাগুলো নীলিমার উদ্দেশেই, 'তাই নাকি, বুলু আবার আসন করা ধরছে, ভেরি গুড'—তার মানে বুলুর কথা শুনছিল সমীর, নীলিমার।

॥ ৯ ॥

বুলুর কানে, মাইকের বক্তৃতা ভেসে এল। টুলুদের (ওর ছোট ভাই) স্লোগানের জন্য মাইকের বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে না, অস্পষ্ট, অথচ খুব তাড়াতাড়ি, কিন্তু খুব জেদ আর তেজের সঙ্গে যেন, মাইকে কেউ বক্তৃতা করছে। টুলুরা গলির মোড়ে, বড় রাস্তায় অনেকখানি জুড়ে, দাঁড়িয়ে আছে। কী কারণে, কে জানে, গলির মোড়ে, বড় রাস্তায়, পর পর তিনটে লাইটপোস্টে কোন আলো নেই, খানিকটা জায়গা জুড়ে অন্ধকার হয়ে আছে। যদি বা ওরা ট্রাম রাস্তা ছেড়েই দাঁড়িয়েছে, তবু এত অল্প জায়গা ছাড়া রয়েছে, যে, আপ অ্যাণ্ড ডাউন ট্রাম বাস ট্যাক্সি প্রাইভেট গাড়ি, সবই একটা জায়গায় চাপ বেঁধে যাবার মত হয়েছে, যদি বা ট্রামের ঠন্‌ঠন্‌ বা কোন গাড়িরই, কোন রকম হর্ন বাজছে না, এবং এটাও বুলু দেখল, আশেপাশের অনেকগুলো দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যে-কারণে অন্ধকারটা আরও বেশি লাগছে। আপ এবং ডাউনে, যারা গাড়ি ব্যাক করে নিতে

পারছে, তারা পেছিয়ে চলে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে, সমস্ত পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে, যেন একটা কিছু ঘটবে।

বুলু ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না: টুলুরা হঠাৎ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে কেন, এবং এভাবে হঠাৎ স্লোগান দিতে আরম্ভ কেন, আর মাইকের বক্তৃতা কোথা থেকে ভেসে আসছে, কে বলছে কাদের দল, কিছুই বুঝতে পারছে না। টুলুদের স্লোগানের মধ্যে মেয়েদের গলাও শোনা যাচ্ছে, সেই ছিমছাম ঝকঝকে মেয়েটিও হয়ত আছে, টুলুর সেই বন্ধু। বুলু পেভমেণ্টের ওপর দিয়ে, খানিকটা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল, আর তখন শুনতে পেল, কয়েকজন লোকের মধ্যে, একজন বলছে, 'শালা, আজকের মত বেচাকেনা খতম।' টুলুদের স্লোগান তখন শোনা যাচ্ছে, 'সাম্রাজ্যবাদের দুই ফ্রণ্ট, কংগ্রেস আর যুক্তফ্রণ্ট।' 'মন্ত্রী গড়ে বিপ্লব কয়া, শোধনবাদীর নয়া ধারা'। 'শোধনবাদ—নিপাত যাক, নিপাত যাক।' · ···

বুলু শুনতে পেল, হঠাৎ আর্তনাদের মত একটা শব্দ হল, তার পরেই মাইকের বক্তৃতা জোরালো আর স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর্তনাদের শব্দটা যান্ত্রিক, মাইকের মুখটা এদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হল, আর তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ জেদী গলা শোনা গেল, 'বন্ধুগণ, সাম্রাজ্যবাদের দালাল কারা, আপনাদের আজ আর চিনতে বাকি নেই। যে কংগ্রেসকে আপনারা দেখছেন, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে, হাত মিলিয়ে ভারতকে শোষণ করছে, সেই কংগ্রেসর সঙ্গে, নির্বাচনের মোকাবিলায় যখন, সমস্ত প্রগতিশীল বামপন্থী বৈপ্লবিক দলগুলো মাঠে নেমে এসেছে, যখন—যখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, যাদের আপনারা অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন, তখন কোন দল যদি বলে, নির্বাচন বয়কট কর, তার অর্থ কী? তার অর্থ কী, বন্ধুগণ, আপনারাই বলুন, আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, তারাই আজ কংগ্রেসের দালাল—তথা সাম্রাজ্যবাদের দালাল······।' গলাটা আশীষের বলে মনে হচ্ছে, বিকালে যাকে মহেন্দ্রদার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল, তখন হয়ত, সন্ধ্যার পরে, এই বিষয় নিয়েই, আশীষ

মহেন্দ্রদারা আলোচনা করছিল, যখন মহেন্দ্রদা বুলুকে দেখেও কথা বলবে কী না, ঠিক করতে পারছিল না, এবং শেষ পর্যন্ত না দেখার ভান করাটাই ঠিক মনে করেছিল। আশীষ বোধহয় এখন পার্টির হোল টাইমার, খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পারে, বিশেষ করে, অ্যাজি-টেশন খুব ভাল পারে। মাইকের গলার স্বর লক্ষ্য করে, বুলু চোখ তুলে দেখতে পেল, রাস্তার অন্যদিক, ছোট পার্কে, অনেক মানুষের ছায়া দেখা যাচ্ছে। সেখানেও অন্ধকার ভাব, কারণ, রাস্তার আলো তিনটে নেই, পার্কের ভিতরেও কোন আলো নেই, যদি বা একটা থাকবার কথা, ওটা চিলড্রেন্স পার্ক। সন্ধ্যার আগে চিলড্রেনরা ছিল কী না, বুলুর মনে পড়েছে, সন্ধ্যার পরে তো না থাকবারই কথা এবং সেখানে, কয়েকটা পতাকাও উড়তে দেখা যাচ্ছে, যার রঙ নিশ্চয়ই লাল, কাস্তে হাতুড়ি ছাপ কিন্তু অন্ধকারে রঙ ছাপ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, যেমন এত দূর থেকে আশীষের শক্ত দপদপে মুখটা দেখা যাচ্ছে না, তবু বুলু কল্পনা করতে পারছে। আশীষের মুখটা ওর চোখের সামনে ভাসছে, রুক্ষ চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে ফরসা মুখটা রাগে আর উত্তেজনায় এখন লাল, দরদর করে ঘামছে, চোখ দুটো জ্বলছে, এবং বুলুদের স্লোগানের জবাবে, আক্রমণ করে বক্তৃতা দিচ্ছে।

আশীষের বক্তৃতা খানিকটা শোনা গেল, তারপরেই টুলুদের স্লোগানের মিলিত স্বর এত জোরে বেজে উঠল যে, আশীষের বক্তৃতা প্রায় ডুবে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা একটা ঝগড়ার মত—'দেখি ভাই, একটু যেতে দিন তো,...গায়ে ঠেলা লাগতে বুলু সরে গেল, দেখল ছাতা হাতে এক ভদ্রলোক, তাঁর হাতে ধরা একটি বছর আটেকের ছেলে, তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছেন। অনেকেরই এরকম তাড়া, আবার অনেকে পেভমেণ্ট জুড়ে দাঁড়িয়েও আছে, এবং বুলু বুঝতে পারল, ওর ভিতরে মোম নামটাই বাজছে, আর সেই রাস্তাটাই জেগে রয়েছে। দুটো দলের মধ্যে, ব্যাপারটা অনেকটা ঝগড়ার মত হচ্ছে। কাকে যে বুলু সমর্থন করবে, ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে

না, কারণ বুলু যেন এসবেব কোন কিছুর ভিতরেই ঢুকতে পারছে না। ভেবে, ওব মনটা কেমন খারাপ হয়ে উঠল, এবং সে সময়েই ও শুনল পাশে দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে, 'আমি তো বিপিনকে বলেছিলাম, সাত টাকা আশি পযসা যেন ওকে দিয়ে আসে।……' 'সে সব আমি জানি না, চার টাকা তিরিশ দিয়ে এসেছে। আমি এখন চললাম, এখানে এখন কী হবে বলা যায় না। হবি সব গুটিয়ে নিয়েছে?' 'নিযেছে। আমিও চললাম।'· ·

বুলু কয়েক পা এগিয়ে গেল। বাড়িগুলোব ব্যালকনিতে, জানলায় মেয়ে পুরুষেরা ভিড় করেছে ওদের মুখগুলো বুলু দেখতে পাচ্ছে না, কেমন তাদের মুখের ভাব বা তাদের কথাবার্তাও শুনতে পাচ্ছে না, কী তারা বলাবলি করছে, কেবল টুকরো টকরো অস্পষ্টই স্বর ওপর থেকে নেমে আসছে, তার মধ্যে মেয়েদের হাসির ঝিলিকও মেলে। হয়ত, অমন হতে পারে, সকলেই দুটো দলে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে সেটা রাজনৈতিক চেতনা কী না, কে জানে মনে মনে একটা উত্তেজনা হয় তো সকলেরই জেগে উঠেছে—'শোন, বিণি, চল ওদিকে গিয়ে, আমি তোমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আসি।' বুলু দেখল, প্যান্ট শার্ট পরা একটি যুবক হাতে ব্যাগ, আব একটি যুবতী, দুজনে একটা বন্ধ দোকানের সামনে কাছাকাছি, প্রায় ছোঁয়াছুঁযি করে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। যুবতীটিকে স্বাস্থ্যবতী বলে মনে হল, যুবকের হাফশার্ট পরা ডানাটা, যুবতীর বুকের কাছে ঠেকে আছে, যুবতী মুখ তুলে জবাব দিল, 'না তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও তো, আমি ঠিক চলে যেতে পারব।' যুবতীর কোমরে হাত দিয়ে যুবক বলল, 'তুমি চল না, কিছু ভয় নেই···।' বুলু এগিয়ে গেল আরও কয়েক পা, এবং একটা ছোট দঙ্গল লাইটপোস্ট ঘিরে জটলা করছে, সেখানে গ্রীলের রেলিঙে বুক চেপে মেয়েরা দাঁড়িয়ে। এই লাইটপোস্টে আলো জ্বলছে, অন্ধকার অংশটা বুলু ছাড়িয়ে এসেছে। যে কোন কাবণেই হোক এখানে লাইটপোস্টের তলায একটা কিছু হাসির ব্যাপার যেন ঘটেছে, কারণ ছেলেদের দঙ্গলটা হাসছে আর

মাঝে মাঝে হাসির ফাঁকে, 'স্‌সালা' 'মাইরি' খুস স্‌সালা, 'লড়ে লিব বে' এইরকম কথা শোনা যাচ্ছে এবং অন্ধকার জায়গা থেকে একটা দোতলা বাস সরে যেতেই, একটা আগুনের ঝলক দেখা গেল, দ্যুম্‌ করে শব্দ হল, বুলুর মনে হল, ওর ঘাড়ের ওপর কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ওর ঘাড়ের ওপর কেউ-ই ঝাঁপিয়ে পড়েনি, আসলে অনেকেই ছুটতে আরম্ভ করেছে, আর ওর কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, 'শুরু হয়ে গেল।' এবং সত্যি যেন শুরুই হয়ে গেল, পার্কে এবং রাস্তায় দুদিকেই দ্যুম্‌ দ্যুম্‌ করে বোমা না পটকা, কী বলে ওগুলোকে ফাটাতে লাগল, আগুনের ঝলক জ্বলে উঠতে দেখা গেল। সেই ঝলকে, আগুনের কাছাকাছি কাউকে কাউকে অস্পষ্ট ছায়ার মত ছুটতে দেখা গেল। স্লোগান ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বক্তৃতা আর শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু বোমা না পটকা কী বলে ওগুলোকে, পার্ক এবং রাস্তার একটা সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যেই ফাটতে লাগল, গোলমাল চিৎকারটাও সেখানেই যেন আটকে রয়েছে। লোকজন ছুটোছুটির কোন দরকার আছে বলে মনে হল না, যদি বা, মানুষের প্রাণে ভয় ঢুকলে, তাকে কোন কিছু দিয়েই বোঝানো যায় না, তখন যেন অনেকটা দাবানল দেখে, হাতি বাঘ হরিণ সব একসঙ্গে কেমন দৌড়তে থাকে, অনেকটা সেইরকম। যারা তখন দৌড়ে পালায়, নিজের নিজের জায়গায় পরিবেশে বা পরিবারে তারা হয়ত অনেকেই হাতি বা বাঘের মত হরিণের তুলনাটা কেবল মেয়েদের জন্যই মনে হয় যেন। কিন্তু লাইটপোস্টের তলার দঙ্গলটা কেমন নিশ্চিন্ত, ওদের নড়বার নাম নেই, যেন ওরা জানে, বোমা বা পটকা, ও-গুলোকে কী বলে, ও সব এত দূরে ফাটতে আসবে না। তথাপি, দরজা জানালা বন্ধ হবার শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং পাশেই কোথায় রেডিও বা ট্রানজিস্টার বাজছে। কী রকম একভাবের গলা আছে যেন গাইতে গেলেই লোকটার আসল স্বর বদলে যায়। কাঁপা কাঁপা মোটা মোটা, যেন কিঞ্চিৎ নেশা করে গাওয়া এক রকমের

স্বর আছে, সেই স্বরে গান হচ্ছে 'সুনীল সাগরে শ্যামল কিনারে ···' রবীন্দ্রনাথের গান, সত্যি কেমন একটা আমেজ লাগে এই রকমের গানে, এই রকম গলায় শুনলে হ্যাঁ, অনেকটা যেন, গানের থেকে অভিনয় বেশি এই ধরনের গানে, এবং কে যেন কাকে সবেমাত্র বলছিল 'এখন হোক না, আমরা তো নটার শোতে নয় যখন ফিরব···' ঠিক সেই মুহূর্তেই একদল লোক হঠাৎ পেভমেণ্টের ওপর দিয়ে ছুটে এল। বুলু ধাক্কা লেগে পাশে সরে যেতেই কে যেন বলে উঠল, 'ওরা হাতাহাতি করতে এদিকে চলে আসছে।' তারপরেই একটা প্রকাণ্ড চিৎকার, কার গলা যেন শোনা গেল, 'ওরা স্ট্যাব করেছে।'

কারা কাদের স্ট্যাব করেছে, কিছুই বোঝা গেল না। বোমা না পটকা ওগুলোকে কী বলে, ফাটাফাটি একটু কমেছিল, আবার ফাটতে আরম্ভ করল কয়েকটা, আর ঠিক এ সময়েই, ধরমবীরের পুলিস এসে পড়ল, সঙ্গে একটা বড় প্রিজন ভ্যান আর একটা বেতার ভ্যান। তারা সোজা অন্ধকার জায়গাটায় চলে গেল, বাঁ দিকে পার্ক রেখে, একেবারে রাস্তার উপরে। এখন পুলিস 'ধরমবীরের' সবাই তা-ই বলে। 'ধরমবীর এখন রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি, সে কোন দলের না, বুলুর বলতে ইচ্ছা করে, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর ধরমবীর কোন দলের না। ধরমবীরের সেই চেহারাটা তার মনে পড়ে গেল, সেই ডুবুরির চেহারা, মাঝে মাঝে অগাধ জলে ডুব দিচ্ছে, আবার উঠে আসছে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা একটা ছবি, যেন জলের তলে কোথায় গিয়ে লড়ে আসছে, আবার ভেসে উঠছে, আর হাঁপাচ্ছে। ইতিমধ্যে, কয়েকটা পতাকা বা অন্য কিছু এবং বোধহয়, একটা টেবিল পার্কে জ্বলতে আরম্ভ করেছে। প্রিজন ভ্যানের হেড লাইট জ্বলছে, লাঠি হাতে পুলিস নেমে পড়ছে। বুলু এগিয়ে গেল।

খানিকটা এগোতেই, রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে, আর বাঁকের মুখে, সন্ধ্যারাত্রের আলো ঝলমলে দোকানগুলো সব খোলা। এ সময়ে,

যতটা ভিড় থাকা উচিত, হয়ত ততটা নেই, তবে একবারে কমও নেই বেচাকেনা বেশ ভালই চলেছে দোকানে দোকানে। পেট্রল পাম্পে নিয়নের আলো ছড়ানো, তেল কালি মাখা লোকেরা কাজ করছে, বয় তেল দিচ্ছে, ক্লিনার সাফ সুরত করছে, মবিল ঢেলে দিচ্ছে, চাকায় হাওয়া ঘুরছে। ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে কিছু মেয়ে ফুচকা খাচ্ছে, কয়েকটি ছেলে তাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে, এক একজন বলছে, 'দাঁড়া না, এক জোড়া ফুচকা মেরে যাই।' বুলুর মনে হল, একথা যখন ছেলেটি বলল, তখন তার চোখ কাছের মেয়েটির বুকের দিকে হানল, এবং এর দ্বারা বন্ধুকে কোনরকম ইশারা কী না, বুঝতে পারলে না। কী ইশারা হতে পারে ফুচকা এবং বুক ? একটা যাচ্ছেতাই তুলনা, উল্লুকের মত, যা খুশি একটা তুলনা দিলেই হল যেন।

মাত্র একটা বাঁক, ওখানে এত কাণ্ড হচ্ছে, আর এখানে যেন অন্য একটা রাজ্য, আলো ঝলমলে দোকান, কেনা বেচা, সাজগোজ করে মেয়ে পুরুষের চলাফেরা, বাচ্চাদের নির্ভয় যাতায়াত, যেন কিছুই জানে না, আর একটু এগিয়ে কী ঘটছে। সকলেই নিশ্চিন্ত ব্যস্ত বা বিরক্ত বা হাসিখুশি বা এমন কি, কাউকে কাউকে দেখে প্রেমিক প্রেমিকাও মনে হল, যারা পাশাপাশি আস্তে আস্তে হাঁটছে, কী বলছে, কিছুই শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু মুখে এমন একটা ছাপ যে ছাপটার মধ্যে, একটা ছেলের আর মেয়ের, একটা বিষয়ই ফুটে ওঠে। আচ্ছা কী বলে ওরা, বুলুর জানতে ইচ্ছা করে, কিংবা, এই যে স্বামী স্ত্রী, হাত ধরাধরি করে চলেছে, মেয়েটির সিঁদুর দেখেই বিবাহিতা বোঝা যায়। স্বামী স্ত্রী এখনও হাত ধরাধরি করে চলছে, এরাই বা কী বলাবলি করছে, বুলুর জানতে ইচ্ছা করে 'শিওর' 'নো' 'ন্যাকা' তিনটি মাত্র শব্দ এদের শুনতে পেল, এর থেকে একটা গোটা দাম্পত্য জীবনের ছবি ফুটে ওঠে কী না। ও বোঝে না, কিন্তু মনে হয় যেন, অনেক কথা শোনা হয়ে গেল। বুলু কি কখনও এরকম পাশাপাশি কখনও কারোর সঙ্গে চলেছে। চলেছে, এবং

সেইসব কথাগুলো চলতে চলতে যেসব কথা বলাবলি করত, ওকে যেন মনে করতে পারছে না। ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

ট্রাম রাস্তার ওপারে, সেই আইল্যাণ্ড ও দেখতে পেল ময়লা আবর্জনার আইল্যাণ্ড যার এক পাশ দিয়ে সেই রাস্তাটা চলে গিয়েছে কোনাকুনি। মোম—সেই নামটা ওর ভিতরে ছেয়ে রয়েছে, মোম, আজ সন্ধ্যাবেলাতেই মনে পড়ে গেল, যে নামটা ওকে কেউ বলে না, যে রাস্তাট ব কথা ওকে আর কেউ বলে না। এ সব সত্যি নাকি, মোম নামটা হঠাৎ আজ সন্ধ্যেবেলাতেই ওর মনে পড়ে গেল। কেমন মিথ্যা আর আজগুবি বলে মনে হচ্ছে অথচ এটা তো মিথ্যা আর আজগুবি নয় যে নামটা মনে পড়েছে, কিন্তু কেমন চেহারাই ভেসে উঠছে না। মোম মোম মোম, পোশাকি তোলা নামটা কিছুতেই মনে পড়ছে না, এসব কি ওর নিজের কাছেই চালাকি হচ্ছে নাকি। চালাকি করার মত মন একেবারেই নেই। আসলে, হয়ত, সে কথাই সত্যি, অন্ধকারের মধ্যে থেকে, অন্ধকারকে হাতড়ে বেড়ানো যায় না, বা, আলোতে থেকে আলোতে, মোম নামটা সেইরকম ওর মধ্যে ছড়িয়েছিল। আলাদা করে। নামটা মনে পড়ছিল না। তারস্বরে সন্ধ্যাবেলা থেকে, ওর মনের মধ্যে যে সব কথা ওর মনের মধ্যে বারে বারে জেগেছিল। তার থেকেই কোন একটা ঝিলিক লেগে, নামটা মনে পড়ে গিয়েছে। রাস্তাটা পার হতে যাবার আগেই, বুলুর খেয়াল হল, সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পেছিয়ে তাকাতে বুলু বাবাকে দেখতে পেল। বাবা চলতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছে, সেটা একটু অবাক হবার মতই কথা, কারণ বাবা এত অন্যমনস্ক লোক, রাস্তা চলতে গিয়ে বুলুকে দেখতে পাওয়া এবং দেখে এবং চিনতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়া, একটু অবাক হবার মতই। বাবার হাতে চামড়ার বড় ব্যাগ। লম্বা দোহারা প্রায় কালো রঙ, মাথায় বড় বড় চুল বিশেষ মাথার পিছন দিকে, কেননা সামনের চুল অনেক পাতলা হয়ে গিয়েছে। অমৃতলাল, বাবার নাম, এবং বুলু একজন ফাদারিস্ট কী না ও জানে না, কিন্তু

বাবাকে ওর ভাল লাগে, এবং কেন লাগে, সেটা ও ঠিক জানে না। বাবাকে ওর দেখতে ভাল লাগে, কালোর ওপরে বাবার চেহারাটা বেশ ভাল লাগে, যদি বা ওর বাবাকে দেখে অনেকেরই এখন ভালো লাগবে না এইরকম ঢলেঢলে প্যান্ট কোমব আর পেট মোটা হয়ে যাওয়ায় আরোই খারাপ লাগে, তার ওপরে বাবা মোটা বেল্ট কোমরে বাঁধে। গায়ের কোটটা যেন ঠিক মাপসই না, অনেকটা লোয়ার কোর্টের উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা হতভাগা উকিলদের মত ঝলঝলে কোট গায়ে দেওয়া লোকের মত দেখায়। গলায় টাই বাঁধে না, অথচ মোটা শার্টের কলারটা কোটের কলারের নিচেই থাকে অধিকাংশ বাঙালী—না, অধিকাংশ কেরানিরা যেরকম পরে, সেই-রকম। চোখে চশমা আছে, আর ডানদিকের চশমার ফ্রেমের ওপরেই এাব।ে কপালের সামনে পাতলা হয়ে যাওয়া চুলের একটা সরু গোছা এলিয়ে পড়েছে। মাথার চুল পাতলা না হলে, বড় একটা কপালের ওপর এসে পড়ে না। বাবার মাথার চুল যখন খুব ঘন ছিল তখন কপালে পড়ত না। বাবার চোখ দুটো বেশ বড়, মুখের ছাঁচটাও খুব সুন্দর, এখন কিছু রেখা পড়লেও বয়সের তুলনায় কমই লাগে বাবা যেন কবি, না কবি হলে বাবাকে বেশ দেখতে হত অথচ বাবার পেশাটা অদ্ভুত।

বুলুর মনে হয়, ছেলেবেলায় বাবাকে এক সময়ে ও বেশ হাসি-খুশি দেখেছে, যেন বেশ ঝকঝকে একজন যুবক। তখনও অবিশ্যি বাবা প্যান্ট কোট পরত এখনকার মত লাগত না, খুব স্মার্ট আর স্টাইলিস মনে হত, যেটা, আসলে রুচিরই কথা, যদি বা অধিকাংশ লোকই স্টাইলিস বলতে অন্য কথা বোঝে অনেকটা রিয়্যাল যাকে বলে প্রকৃত ছোটলোকদের মত কথাটা বোঝে, অর্থাৎ মূর্খদের মত। তখন বাবা শুধু পৈতৃক ব্যবসা, টিম্বার ওয়ার্কস দেখাশোনা করত। বাবারা বোধহয় পাঁচ ভাই, ভাবতে বুলুর নিজেরই অবাক লাগছে, এখন যেন ঠিক মনে করতেই পারছে না, ওর কজন কাকা জ্যাঠা আছে, একটা সময় এসেছিল, যখন টিম্বার ওয়ার্কস কিছুটা

ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল। এখন বাবা একটি সান্ধ্য কলেজে পড়ায়, কিন্তু সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আগে টিম্বার ওয়ার্কসের কাজ দেখাশোনা করে, সারাদিন বাড়ি ফেরে না। একেবারে কলেজ সেরে ফিরে আসে।

॥ ১০ ॥

টিম্বার ওয়ার্কস যখন ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল তখন বুলুর বয়স আট-ন হতে পারে, সেই থেকে ওরা কাকা জ্যাঠাদের সঙ্গে আলাদা। সকলেই আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এ বাড়িটাও বুলুদের নিজেদের, বাবার ভাগে বাড়িটা পড়েছিল, আর এ বাড়িতেই ওর মনে আছে রাত্রে বড় বড় ছেলেমেয়েরা বাবার কাছে পড়তে আসত এবং এখনও একটি মেয়েকে ওর মনে পড়ে, টিকলো নাক বড় বড় চোখ ফরসা দোহারা দোহারা গড়ন, সিঁথেয় আর কপালে ওর সিঁদুর ছিল, বাবার কাছে পড়তে আসত, আর সেই মেয়েটি একদিন, একটা রবিবারে দুপুরে হঠাৎ এসেছিল, দরজায় কড়া নেড়েছিল, বুলু তখন নীলিমাকে সঙ্গে নিয়ে, ঘরের বারান্দায় কাগজের পাখী বা নৌকা, এরকম কিছু বানাচ্ছিল। ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল মা খাটে শুয়েছিল, বাবা ইজিচেয়ারে বসে কী একটা বই পড়ছিল এবং কড়া নাড়ার শব্দ শুনে, জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে, মাকে বলেছিল, 'নীরজা এসেছে, একটু দরজাটা খুলে দিয়ে এস তো'। মা হঠাৎ যেন, ঘাড় ফিরিয়ে, বাবার দিকে দপদপে চোখে তাকিয়েছিল— এই মা, এই গুরুদেবের ঘোরে থাকা মা, এবং বলেছিল, 'আমি যাব ওকে দরজা খুলে দিতে, আমার কি মরণ নেই, তোমার লজ্জা করছে না একথা বলতে।' বাবা যেন অবাক হয়ে বলেছিল, 'ও কী রকম কথা বলছ, নীরজাকে তুমি দরজাটা খুলে দিয়ে—' বাবার কথা শেষ হবার আগেই, মা আলুথালুভাবে খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল। মায়ের কপালে সিঁথির সিঁদুর, চুলগুলো খোলা, চোখগুলো দপদপ

করছিল, মুখটাও যেন দপদপ করছিল, আর ফুঁসে উঠেছিল, 'না, খুলে দিয়ে আসতে পারব না. তোমার ইচ্ছে থাকে. তুমি দিয়ে এস. আমার দায় কেঁদে গেছে।' বলেই মা মুখটাকে এক ঝটকায় ফিরিয়ে নিয়েছিল, আর সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তখন বুলু ভয় পেয়ে, নীলিমার দিকে তাকিয়েছিল. নীলিমাও ঠিক তেমনি ভয় পেয়ে. বুলুর দিকে তাকিয়েছিল. কারণ. আগে কখনও যেন ঠিক ওরকম ভাবে বাবা মাকে ঝগড়া করতে ওরা দেখে নি. যদি বা বাবা মাকে কখনও কখনও একটু ঝগড়া বা কথা কাটাকাটি করতে দেখেছে, কিন্তু সেই ব্যাপারটা যেন অন্য রকমের লেগেছিল। আর বাবা, বুলু বা নীলিমাকে দরজা খুলতে বলে নি, হাতের বইটা বন্ধ করে. নিজেই গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল, আর নীরজা নামে সেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে এসেই. মুখে আঁচল চেপে. ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। বাবা যেন কেমন অস্বস্তি অথচ দুঃখী দুঃখী মুখ করে বলেছিল, 'এতে তোমার এত কান্নাকাটি করার কী আছে. এমন তো মানুষের জীবনে ··' কিন্তু নীরজা নামে সেই বিবাহিতা মেয়েটি যে বাবার কথা শুনছিল, তা মনে হচ্ছিল না, সে মুখে আঁচল চেপে তেমনি কেঁদেই যাচ্ছিল, তার শরীরটা কাঁপছিল, এবং বাবার অবস্থা তেমনি অস্বস্তিকর, আর বুলু নীলিমার সঙ্গে আবার চোখাচোখি করেছিল। বাবা আবার বলেছিল. 'বস বস, কেঁদে কেটে কী হবে।' তখন সেই নীরজা নামে মেয়েটি বসেছিল, যদি বা, তার মুখ তেমনি নিচু ও ঠোঁটের ওপর আঁচল চাপা ছিল। বুলু কিছুই বুঝতে পারছিল না, কেন নীরজা নামে সেই মেয়েটি কাঁদছিল। নীলিমার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয়েছিল, নীলিমার যেন একটু রাগ হচ্ছিল নীরজার ওপরে. নীলিমার চাউনিতে কেমন একটা সন্দেহ আর অবাক ভাব ফুটে উঠেছিল। তখন নীলিমার বয়স আর কত হতে পারে, ছয় সাত বা আট। বাবা আবার বলেছিল. 'দোষ তো তোমার একলার না। সংসারে ঢুকলে, মেয়েদের পড়া শোনার ক্ষতি একটু হয়। আবার ভাল করে পড়ে পরীক্ষা দাও, ঠিক পাস করে

যাবে।' তখন বুলু বুঝতে পেরেছিল, নীরজা নামে সেই ধাড়ি মেয়েটি পরীক্ষায় ফেল করেছে বলে, বাবার কাছে কাঁদতে এসেছিল, কারণ সে বাবার কাছে পড়তে আসত। কিন্তু মা যে কেন ওরকম করেছিল বুলু তখন ঠিক বুঝতে পারে নি। নীরজা কান্না থামিয়েছিল। চোখ মুছে, লাল লাল ভেজা ভেজা চোখ তুলে, বাবার সঙ্গে কী দু একটা কথা বলেছিল, বাবাও তার জবাব দিয়েছিল, তারপরে নীরজা চলে গি য়ছিল।

ঘটনাটা যে কেন এতকাল ধরেও মনে আছে, বুলু জানে না, যদি বা, সেই ঘটনার পরে বাবার জীবনে কোন অদল বদল ঘটে নি, বা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদও হয় নি। বাবা মা যেমন থাকবার, তেমনি ছিল, কথাবার্তা হাসি, এবং নীরজার সেই কাঁদবার দিনের ঘটনার পরে, বাবা মায়ের কখন কী কথা হয়েছিল, বুলু কিছুই জানে না, সন্ধ্যাবেলা যখন বাবা মাকে কথা বলতে দেখেছিল, দেখেছিল, কোন পরিবর্তনই হয় নি, দুজনেই যেমনকার তেমনিই আছে। বুলুর মনে আছে, কেবল নীলিমা ওকে বলেছিল, 'নীরজা মাসীটা ভারী পাজী।' বুলু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কেন'। 'বাবার কাছে কাঁদতে এসেছিল কেন।' 'তাতে কী হয়েছে।' 'কেন, ওর বাবার কাছে গিয়ে কাঁদতে পারে না' 'তুই থাম্, ডেঁপো মেয়ে।' দশ বছরের বুলু, বোনকে ধমকে দিয়েছিল, যদি বা সে নীলিমার রাগের কারণ কিছুই বুঝতে পারে নি। তারপরে, দেখা গিয়েছিল বাড়িতে ছাত্রছাত্রী পড়ানো, আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বাবা যেন কোথায় কোন টিউটোরিয়াল হোমে পড়াতে যেত। সারাদিন টিম্বার ওয়ার্কস্, সন্ধ্যের সময় পড়ানো। বুলু এখন ঠিক মনে করতে পারে না, বাবা যেন কবে থেকে, অন্য এক ধরনের মানুষ হয়ে যেতে লাগল। বেশি কথা বাবা কোনদিনই বলত না, কিন্তু এখনকার মত একেবারে চুপচাপ ছিল না। আস্তে আস্তে বাবা, চুপচাপ আর একটা শ্রান্ত —হ্যাঁ, সব সময়েই যেন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, এবং মুখটা দেখে মনে হত, সব সময়ই যেন অন্য কথা চিন্তা করছেন, অথচ সমস্ত মুখ

ভরে এমন একটা গম্ভীর ভাব, হঠাৎ কোন কথা বলা যেত না। হ্যাঁ না, কোন রকম আপত্তি বা ইচ্ছার কথাই যেন বাবা বলতে ভুলে গিয়েছে। এখন বাবা একটা সান্ধ্য কলেজে পড়ায়। সকালবেলা বেরিয়ে যায়, টিম্বার ওয়ার্কস-এ যায়, সেখানেই দুপুরে কিছু খায়, সন্ধ্যায় কলেজে যায়, এ সময়ে ফিরে আসে। বাবা কখন বেরয়, কখন আসে, কখন বাড়িতে আছে, কিছুই জানা যায় না। বুলু যে ক'দিন বাড়ি এসেছে, একদিনও মায়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখে নি, আসলে, বাবা মাকে এক সঙ্গে, একবারও দেখতে পায় নি। তার কারণ হয়ত, বাবা মার সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন বুলু কাছে থাকে না, তাই দেখতে বা শুনতে পায় না। মাত্র একদিনই, দিন তিনেক আগে, মা যখন নীলিমাকে গুরুদেবের কথা শোনাচ্ছিল, তখন হঠাৎ বাবা এসে পড়ায়, মা একদম চুপ হয়ে গিয়েছিল, আর নীলিমা সরে এসে বুলুকে বলেছিল, ভাগ্যিস বাবা এসে পড়েছিল, নাহলে গুরুদেবের কথা কতক্ষণ শুনতে হত কে জানে। বাবা ওসব শুনতে চায় না, জানতে চায় না, মা বলতে ভয় পায়।'...

বুলু বাবাকে কিছুই বোঝে না, যেন একজন অচেনা বিদেশী লোক, তথাপি বাবার ওপরে ওর কোনরকম রাগ হয় না। দূরের মানুষ এবং অচেনা হলেও, এক এক সময়ে যেমন মনটা খারাপ হয়, যে কারণে, অন্যদের সময়ে সেই অন্ধকার মনে ঘিরে আসে, বাবার বেলায় তা মনে হয় না। কেন, ও তা জানে না। তার কারণ এই না যে, বাবা ওকে বোঝে। ওরা কেউ-ই কাউকে বোঝে না, তবু এক রকমের আছে, জানি না, চিনি না বুঝি না. তবু লোকটার সম্পর্কে একটা কৌতূহল থেকে যায়, লোকটাকে জানতে ইচ্ছা করে সেইরকম।

বুলু একটু পেছিয়ে এসে বুঝতে পারল, বাবা ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটা শব্দও শোনা গেল, 'বুল।'

শব্দের মধ্যে একটা যেন জিজ্ঞাসার সুর। বুলু কিছু বলবার আগেই, ও যে দিকে তাকিয়েছিল. সেই আবর্জনার আইল্যাণ্ডের

দিকে বাবাও তাকাল। চোখ ফিরিয়ে, বাঁকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মারামারি থেমে গেছে, না?'

এমন নিরাসক্ত গলা, মারামারিটা যেন কোন ব্যাপার না। এই সময়ে, টুলুর কথা একবার ওর মনে পড়ে গেল, টুলুকেই কেউ স্ট্যাব করেনি তো, কিংবা টুলু কাউকে। ও বলল, 'পুলিস তো এসেছে দেখেছি।'

বাবা বলল, 'হুঁ শুনলাম কী না, রাস্তায় কী সব হচ্ছে। তুইও ছিলি না কি ওখানে।'

বাবা এত ক্লান্ত, অন্যমনস্ক, ঢোলাঢালা মানুষ। কিন্তু চশমার কাঁচের আড়ালে, চোখ দুটো কখনও আধ বোজা না, বরং কেমন যেন পুরোটাই খোলা, কী রকম একটা চোখ বড় বড় করে, খুঁজে ফেরার ভাব। সেই চোখে, এখন নিতান্ত একটা কৌতুহল। বুলু বলল, 'না, আমি ছিলাম না।'

ও ভাবল, বাবা টুলুর কথা কিছু বলবে, কিন্তু কিছুই না, বাবা এগিযে চলতে লাগল। ঘাড় নুয়ে, বড় ব্যাগ হাতে, ঢলঢলে পোশাক পরা, মাথায় বড় বড় চুল, একটি লোক। 'মোম'—বাবা সরে যেতেই, নামটা আবার মনে পড়ল, রাস্তার ওপারেব দিকে তাকাল ও। ট্রাম রাস্তা ফাঁকা, এখন আর কিছুক্ষণ ট্রাম নিশ্চয়ই চলবে না। ও রাস্তাটা পার হয়ে আইল্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

ময়লা জমানো আইল্যাণ্ড থেকে একটা দুর্গন্ধ নাকে লাগল। আইল্যাণ্ড পার হয়ে ও সোজা এগিয়ে গেল। রাস্তাটা প্রায় সেইরকম আছে, নতুনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, এ রাস্তাতে ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাগানো হয়েছে, পুরনো হলদে বালব্‌ এর বদলে, আর যেটুকু সামান্য ফাঁকা ছোটখাটো জায়গা ছিল সেগুলো সবই ভরাট হয়ে উঠেছে, বাড়ি তৈরি হয়েছে। কোন কোন পুরনো বাড়ি রিনোভেট করে, চেহারা বদলে ফেলেছে, কিংবা গোটা বাড়িটা ভেঙে দিয়েই হয়ত নতুন বাড়ি হয়েছে, বুলু বুঝতে পারছে না। এক একটা নতুন বাড়ি এত বড়, কী কারণে এমন তৈরি হয়েছে, বুলু বুঝতে

পারে না। ভাড়া দেবার জন্য নাকি। কী বিশ্রী বড় বড় বাড়ি, হয়ত একশ দেড়শ লোক এক একটা বাড়িতে আছে। আশ্চর্য লাগে বুলুর, মানুষ যত বেশি নিজেদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, ছাড়াছাড়ি বাড়ছে, চেনা পরিচয় কমে যাচ্ছে, তত সবাই গোয়াল-ঘরের মত এক জায়গায় ঠাসাঠাসি করে থাকছে, থাকতে বাধ্য হচ্ছে। অদ্ভুত। তবু পাড়াটাকে চিনতে অসুবিধা হয় না, এক একটা পুরনো বাড়ি, প্রায় এক রকমই আছে, চোখ পড়লেই বুলুর গায়ের মধ্যে কীরকম করে উঠছে, কেমন যেন একটা শিউরানো ভাব। ঘাড়ের কাছে শিরদাঁড়ার কাছে, কেমন যেন একটা অস্পষ্ট-ভাবে কেঁপে উঠছে, আর সারা গায়ে শিউরোনি, কেন কে জানে। এ পাড়াতে রক প্রায় নেই বললেই চলে, তাই অনেকটা ফাঁকা, কিংবা এখন সবাই, সেই পার্কের কাছে লড়তে চলে গিয়েছে, যদি বা একেবারেই ফাঁকা নেই, সেই পুরনো পান-সিগারেটের দোকানটার কাছে, রাস্তার ধারে পেভমেণ্টর ওপব বেঞ্চ পেতে দুতিনজন বসে আছে, একটা বাড়ির ছোট্ট গোল সিঁড়ির ওপরে জনা দুয়েক বসে আছে, আর নিচের বারান্দায় বা ওপরের ব্যালকনিতে, দু-একটি মেয়ে বা বয়স্ক মহিলাদের দেখা যাচ্ছে। এ রাস্তা কোনদিনই ভিড় জম-জমাট ছিল না, বরাবরই একটু ফাঁকা, এবং এখন অনেক নতুন নতুন বাড়ি হলেও, প্রায় আগের মতই, ফাঁকা আছে।

মোম। মোম উনিশ, ধূসর, লাল, একটু ভিতরে, ব্লাইণ্ড কথা-গুলো এই ভাবে ওর মনে এল, যার অর্থ মোম, মোমদের উনিশ নম্বর বাড়ি, রঙ ধূসর, লাল বর্ডার, বাড়িটা একটু ভিতরে, দুপাশে দুটো বাড়ির মাঝখানে রাস্তা, রাস্তাটা শেষ, মোমদের বাড়ি, আর রাস্তা নেই, মোমদের বাড়ি মানেই রাস্তা শেষ, মোমদের বাড়িটাই রাস্তাটাকে অন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মোম, এখনও মোমের মুখটা-মোম মোমের মুখটা এখনও যেন ঠিক চেহারা নিচ্ছে না, এখনও যেন, গর্ভবতীর গর্ভাধানের মধ্যে, ভ্রূণের আকার নেবার আগের অবস্থায় মোমের মুখটা, একটা জেলি ফিশের মত অবয়ব

হীন, আকার নেই, অথচ আর দেরি নেই, এইরকম মনে হয়, আর দেরি নেই, গর্ভবতীর মাথা ঘোরা বমির ভাব গা গরম, সবই কমে আসছে, মানে, সেই আকারহীন পদার্থটা মানুষের বাচ্চার আকার নিতে চলেছে, মোমের মুখটা বুলুর চিন্তায় সেরকম এসে দাঁড়িয়েছে, এখনও স্পষ্ট হয়ে উঠছে না।

বুলুর শিরদাঁড়ায় যেন একটা গুটিয়ে থাকা সাপ তার কুণ্ডলী হঠাৎ খুলে ফেলল, আর এমন শিরশির করে উঠল শরীরটা, ঘাড়ের কাছটা শিউরে উঠল যে, ওকে প্রায় দাঁড়িয়েই পড়তে হল, এবং যা ভাবল তা-ই, ডান দিকে, একটু ভিতরে, সেই বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, রাস্তা বন্ধ। রাস্তার দুপাশে দুটো, কিংবা চারটে বাড়িও হতে পারে, বুলুর মনে পড়েছে না, সেই বাড়িগুলোর আলো রাস্তায় পড়ে নি, এবং ফ্লোরেসেন্ট আলোও দেখা যাচ্ছে না, মোমদের বাড়ির ওপরে একটা জানালায় শেড ঢাকা দেওয়া আলো দেখা যাচ্ছে, রাস্তাটা যেন অন্ধকার। মোম, এখন মুখটা মনে পড়া উচিত ছিল, বুলু বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে, এখনও মনে পড়া উচিত, কেন না, বুলু তো অন্য কিছুতেই ছিল না, এখানেই ছিল, এখানেই তার প্রথম আসার কথা ছিল, বাবা মা ভাই বোন বন্ধু পার্টির মেম্বার, কারোর সঙ্গেই না, তবু মোমের মুখটা মনে পড়ছে না। ছোট তিন ধাপ চৌকো সিঁড়িতে উঠে, বন্ধ দরজার চৌকাঠের গায়, বুলু কলিঙ বেলের বোতাম টিপ্‌ল। কোথাও কোন আওয়াজ হয় কী না, ও শুনতে পেল না। বড় দরজা দুপাশে জানালা, পাল্লা খোলা, গ্রীলের ওপাশে মোটা পর্দা, আলো দেখা যায় না, সম্ভবত ঘরটা অন্ধকার।

দরজা খুলে গেল, যে দরজা খুলে দিল, তার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কেন না, একটা অল্প পাওয়ারের আলো, তাও পিছন দিকে, সামনে বা রাস্তায়ও কোন আলো নেই, শুধু এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, যে দরজা খুলে দিল, সে পুরুষ, পায়জামা আর গেঞ্জি গায়ে। সে বুলুর মুখটা দেখাবার চেষ্টা করল এক মুহূর্ত, তারপরে শোনা গেল, 'কে, কাকে চান।

'বুলু। মোম—।'

দরজায় মূর্তি যেন একটু ঝুঁকেছিল, এখন সোজা হল, তারপরে দুপা পেছিয়ে গেল, কয়েক মুহূর্ত যেন নামের পরিচয়গুলো বোঝাবার চেষ্টা করল, এবং অস্পষ্ট স্বরে কী বলল, বোঝা গেল না, বুলুর মনে হল, ও যেন শুনল, 'বস্থন।'

বুলু ঘরের মধ্যে পা দিতেই, আর একজন ভিতরের পর্দা সরিয়ে চলে গেল, একটা বেশি পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল না, বা ফ্যানটাও খুলে দিয়ে গেল না। অল্প আলোতেই, বুলু দেখল, চিনতে পারল, সেই সব মোটা চওড়া থ্যাবড়া গড়নের দুটো সোফা গুটি চারেক চেয়ার, একটা ঢাকনাবিহীন গোল টেবিল—। হঠাৎ যেন ভিতরের দরজার কাছে, কয়েকটা পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, তারপরেই আবার থেমে গেল, আর দ্রুত ফিস্‌ফিস্ গলায় কথা শোনা গেল, বুলু ভিতরের দরজার পর্দার দিকে ফিরে তাকাল।

……ঘরটাব ভিতরের দেওয়ালের রঙ বদলানো হয়েছে কী না, বুলু বুঝতে পারছে না, ঠিক সেই রকমই লাগছে, একটুও যেন বদলায় নি, এমন কি ঢাকনা ছাড়া সেই সোফার ময়লা গদিগুলো, চেয়ার টেবিল, কাদের যেন দু তিনটে ফটো সেকালের পুরুষদের—। হঠাৎ যেন বড় ভারী একটা কাঠের টুকরো াস'ড়ি দিয়ে গ ি য় নিচে এসে পড়ল, নিচের ছোট উঠোন, দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির বারান্দার ধারে, ছবিটা চোখের সামনে ভাসছে। তারপরেই একটা রাগী আর জেদী গলা শোনা গেল, 'না আমি ছাড়ব না ওকে, আমি—।' কার গলা বুলু চিনতে পারল না, তবে কোন পুরুষের গলা, এবং কেন বলছে, :কে কাকে বলছে ও ঠিক বুঝতে পারছে না। একজন পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল, মনে হল, আগের সে-ই যে দরজা খুলে দিয়েছিল। তারপরেই আর একজন প্যাণ্ট শার্ট পরা একটু চওড়া গড়ন, আবার একজন ঢুকল, একজন মহিলা, এবং তাদের সবাইকে ধাক্কা দিয়ে ভিতর থেকে আর একজন যেন এই

ঘরের মধ্যে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার খালি পা, পায়জামা পরা সে একেবারে বুলুর সামনে এসে দাঁড়াল।

এই লোকটাকে ভল্লুকের মত মনে হল, এর নিঃশ্বাস এত জোরে পড়ছে যে, বুলু ওর নিজের বা এই ঘরের আর কারোর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না, এবং ও শুনতে পেল, দাঁতে দাঁত চিবিয়ে, সামনের লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শয়তান শুয়োর এতবড় সাহস তোর।'

বুলুর মনে হল, গালাগালিগুলো ওকেই দেওয়া হচ্ছে, অনেকটা চেনা লাগছে লোকটাকে, তবে এখন যেন ঠিক ভল্লুক না, বাঘের মত মনে হচ্ছে, এবং বাকিরা এই খাবারের কাছ থেকে খাবারের আশায় জ্বলন্ত চোখে, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, যদি বা, ব্যাপারটা ঠিক কী বুলু বুঝতে পারছে না, এরকমটা আশাও করে নি। যে ওকে দরজা খুলে দিয়েছিল, সে এগিয়ে গিয়ে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিল, আর বুলুর সামনের লোকটা শেক্সপীয়রে নাটকের অভি-নেতার মত বলে উঠল, 'হাউ ড্যু উ ডেয়ার টু টাচ দিস ভোরস এগেন উঁ… '

উঁ শব্দটা জিজ্ঞাসা না, যেন একটা গোঙানির মত বাঘটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, এবং এ সময়ে শার্ট প্যাণ্ট পরা চওড়া লোকটা, বুলুর পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল, বুল তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না, আর সামনের লোকটা হঠাৎ বুলুর চুলের মুঠি ধরে, মাথা-টাকে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে, নিচু স্বরে গর্জন করে উঠল, 'চুপ করে থাকলে হবে না, আমি জবাব চাই, অ্যানসার মী উ বাস্টার্ড, এত-বড় সাহস—।'

বুলু বুঝতে পারছে, বাঘটার থাবা ওর ওপরে বসেছে, এবং এরা, আর যাই হোক ওকে এড়িয়ে যেতে পারছে না, এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ওর চুলে লাগছে, কিন্তু স্পষ্ট গলাতেই উচ্চারণ করল, 'আমি মোমের— ।'

'শাট আপ।' লোকটা বুলুর ঘাড় আর গাল সুদ্ধ সপাটে এত

জোরে থাপ্পড় মারল যে, ও প্রায় উল্টে পড়ে যাচ্ছিল, পিছনের লোকটা ওকে ধরে ফেলল, এবং সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, 'মেজদা এটা আন্‌লফুল হয়ে যেতে পারে, বাড়ির মধ্যে এভাবে।'

বুলুর পাঁজরার কাছে আর একটা জোরে ঘুষি মেরে লোকটা বলে উঠল, 'কিসের আন্‌লফুল, ইট ইজ এ ট্রেসপাস, এ থিফ্ সুইণ্ডলার, আমরা ওকে বাড়িতে ডেকে আনি নি। ওর এত বড় সাহস, এ বাড়িতে এসে এখনও ওই নাম উচ্চারণ করছে, আই উইল কিল হিম।'

কথাটা পুরো শেষ হবার আগেই, লোকটা বুলুর দাড়ি টেনে, শরীরের যেখানে সেখানে, ঘুষি আর থাপ্পড় মারতে আরম্ভ করল, আর মহিলার গলায় শোনা গেল, অন্তু অন্তু শোন আমি —।'

একটা পুরুষ গলা শোনা গেল, 'তুমি থামো না, একটু শিক্ষা দেওয়া হোক পাঁচ বছর ঘানি টেনে ওর শেষ হয় নি।'

বাঘটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর বুলু তখন একটা আলমারির গায়ে হেলে পড়েছে। আর ঠিক সেই সময়েই, ভিতরের দরজার কাছে, পর্দার ওপাশে একটা চিৎকার শোনা গেল, মনে হল, মোম। যেন মোম কেমন একটা গলায় চিৎকার করে উঠল, অনেকটা, চিৎকার করে কেঁদে ওঠার মত, না কি, ভীষণ রেগে চিৎকারের মত, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, এবং চিৎকারটা খানিকক্ষণ টেনে ধ রেখেই, ডেকে উঠল, 'মা আ আ আ……।'

আবার মহিলার গলা শোনা গেল, 'অন্তু, ছেড়ে দে।'

আর একটি মেয়ে গলা শোনা গেল, আশপাশের বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে, জানালা খুলে তাকাচ্ছে।'

'দেখুক, তাকাক, তবু ওকে আমি আজ—।'

'শুনুন মেজদা, যা হয়েছে, হয়েছে, এবার ছেড়ে দিন!'

বলেই, প্যাণ্ট শার্ট পরা চওড়া লোকটা বুলুকে ধরে দরজার কাছে ঠেলে নিয়ে চলল, বলল,

'অন্তু, দরজাটা খুলে দে।'

দরজাটা খুলে গেল, আর বুলুর চোখের সামনে, মোমের মুখটা এখন স্পষ্ট ভাসছে, মোম, মোমের মুখ। বুলুকে কেউ আস্তে ঠেলে দিল রাস্তার ওপরে, এবং দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার আগেই, ডান দিকের বাড়ির জানালা দিয়ে, একজন বুড়ো মানুষের গলা শোনা গেল, 'কী হয়েছে অন্তু, বাড়ির মধ্যে অমন করে চেঁচাচ্ছিল কে?'

বুলু শুনতে পেল, 'ও কিছু না।' পিছনে দরজাটা জোরে শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। বুলু দেখল, দু-পাশের বাড়ির দরজা জানালায় আলো, মানুষের মুখ এবং রাস্তায় কয়েকটি ছেলে, ওকে দেখছে। কিন্তু বুলুর চোখের সামনে এখন মোমের মুখটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, মোমের সমস্ত চেহারাটা। প্রহারের আঘাতের মধ্যেও, আবার ওর শরীরটা কীরকম শিউরে উঠল। মোম হাসছে সেই হাসি যে হাসি চোখে ঠোঁটে, সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, অনেকটা একহারা। ঘাড়টা একটু লম্বা, বোধহয় কী বলে ওটাকে, ওটাকে দীর্ঘ গ্রীবা বলে বোধ-হয়, কালো সেই বড় বড় চোখ, টান টান, একটু লম্বাটে ভাবের মুখ, নাকটা কেমন যেন, টিকলো বলতে ইচ্ছা করে না, কিংবা টিকলো খুব চোখা না, টিয়ে পাখীর মত বা, সেই যে বলে বাঁশীর মত নাক, বাঁশীর মত নাক আবার হয় নাকি। মোম পুরোপুরি ভাসছে চোখের সামনে, অথচ ঠিক কথা বলে চেহারাটা যেন বোঝানো যায় না, কীরকম একটা অনায়াস ভঙ্গি, সোজা অথচ টলটলে, যেন বাতাস লাগা জলটা আস্তে আস্তে দুলছে, এমনি একটা ভাব মোমের হ্যাঁ, হ্যাঁ, কপালটা খুব ছোট না, এক একজনের যেমন থাকে, যেন ভুরুর ওপর থেকেই চুলের গোছা উঠেছে—গোটা শরীরেই ব্যথা লাগছে বুলুর। ঠোঁটের কোণে গোঁফের পাশে, কিছু যেন চুঁইয়ে ঢুকছে কষের ফাঁকে। 'শালা চোর-টোর হবে।' কে যেন ওর পাশ থেকেই বলে উঠল, সেই ছেলে কটির মধ্যেই কেউ, যারা এই অন্ধকার রাস্তাটায় দাঁড়িয়েছিল। আশপাশের বাড়িগুলোর ছেলেই হবে, পনের-ষোল বছর বয়স একজন আবার বলে উঠল, 'অন্তুদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল শালা', আর একজন বলল, 'আয়

বানচোতকে পেঁচাই।' ছেলেগুলো বুলুর কাছ ঘেঁষে চলতে চলতেই. এই কথা বলছিল, বুলু বড় রাস্তা, অর্থাৎ যে রাস্তায় আলো জ্বলছে সেই রাস্তার দিকেই এগোচ্ছে, এবং কথাগুলো কানে এলেও মোমের মুখটাই ভাবছে, মোমের নানান অঙ্গভঙ্গি আচরণ কথাবার্তা, মোমের সেই আদুরে আদুরে ভাব আর অভিমানে ঘাড়টাকে কাৎ করে তাকানো—।

আলোর রাস্তায় পড়তেই, কাছেই কোথায় একটা বোমা না পটকা কী বলে ওগুলোকে, একটা ফাটল আর সাত আটজনের একটা দল ছুটতে ছুটতে এদিকেই এগিয়ে এল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' এই ধ্বনির সঙ্গে, অন্য কথাও ওরা বলছিল. আর ঠিক সেই সময়েই, 'দে শালাকে দু ঘা', এই কথা মাত্র, বুলুর পিঠে একটা ঘুষি পড়ল, এবং সেই সাত আটজনের দলটা তখন খুবই কাছে। তাদের মধ্যেই একজন জিজ্ঞেস করে উঠল, 'কী হয়েছে!'

॥ ১১ ॥

'চোর।'

'চোর নাকি।'

বুলু বুঝতে পারছে, এইসব যোদ্ধারা এখন পার্ক থেকে ফিরছে। কোন দল সে চিনতে পারছে না। বুলু খালি বলে উঠল, 'আমি চোর নই, আমি—।'

ততক্ষণে ওর পিঠে কিল ঘুষি আর ধাক্কা পড়তে আরম্ভ করেছে, 'শালা পাড়ায় ঢুকেছ কেন', বলে ওকে একদিকে ওরা তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল। বুলুর দৌড়নো ছাড়া উপায় রইল না, যদি বা বলতে লাগল, 'শুধু শুধু মারছেন, না জেনে শুনে—' কিন্তু সেসব কথা ওদের কানেই যাচ্ছিল না, এখন ওদের কাউকে মারা আর তাড়া করা ছাড়া কিছু করার নেই, এখন ওরা যেন একটা পাগলা স্রোতের মধ্যে পড়ে গিয়েছে, কেউ একটা কুকুরের পিছনে লেলিয়ে দিলেও, ওরা এভাবেই

ছুটত। বুলু প্রাণপণ সোজা থেকে চলবার চেষ্টা করল, যাতে পড়ে না যায়, কেননা, পড়ে গেলেই ওরা বুলুকে সবাই মিলে পা দিয়ে লাথিয়ে মাটিতে থেঁতলে দেবার চেষ্টা করবে। এদের এখন কিছু বোঝাবারও নেই। তবে কেমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার। মারের আঘাতগুলো তেমন জোরে লাগছে না যেন, আঘাত যেমন ভিতরে গিয়ে পৌছলে, দারুণ কষ্ট হয়, সেরকম না, এবং যখন করুণ মুখে, মোমকে বলছে, 'দেখছ তো ব্যাপারটা।' তারপরেই ওর মনে প্রশ্ন এল, চিৎকারটা কে করেছিল ভিতরের দরজার পর্দার আড়াল থেকে মোম নয় কি। মোম বলেই তো ওর মনে হয়েছিল, ট্রামের শব্দ শোনা গেল। হঠাৎ একটা জোর ধাক্কায় বুলু এতটা এগিয়ে গেল যে, একটা মোটর, শুয়োরের মত চিৎকার করে ব্রেক কষল। বুলু হেড লাইট ঘেঁষে রাস্তাটা পার হয়ে গেল, আর পিছনে ধাওয়া করা দলটা থেমে গেল, চিৎকার করে কী সব যেন বলতে লাগল, কিন্তু বুলু এখন আর এই রাস্তার লোকদের সামনে পড়তে চায় না, কেন না, তারা ওকে মারুক বা না মারুক, পুলিসের কাছে যেতেই হবে। এ রাস্তায়, একটু ভিড় গোলমাল হলেই, পুলিস এসে পড়বে, আর সেটা হবে এক রকমের পাগলকে সাঁকো নাড়া দিতে বলার মত, ব্যাপার চরমে উঠবে এবং পুলিসেরা সেটা খুব ভালই পারে। যেমন লোকে বলে না, অনেকটা ছড়া কেটে বলার মত, 'ভাল করতে পারি না, মন্দ করতে পারি, কী দিবি তা দে'. পুলিস অনেকটা সেইরকম। তাই, একটা খালি ট্যাক্সি দেখে, উঠে পড়ল ও, আর ড্রাইভার টিং শব্দে মিটার ডাউন করে, চলতে আরম্ভ করল, তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'কীধর চলে গা ?'

'হোটেল আলবামা'।

মায়ের গুরুদেবের কথা হঠাৎ বুলুর মনে পড়ে গেল, কী যেন বলেছিল লোকটা বুলুর সম্পর্কে। চিৎকারটা কি সত্যি মোম করেছিল, মোম ওরকম চিৎকার করতে পারে নাকি, সেই চেহারা —মোমকে সবাই সুন্দর বলত, ওর রূপটা অহঙ্কারের মত ছিল, আর

হিংসে করবার মত, আর রূপ বেশি থাকলে, একটা স্বাভাবিক ঢঙের ভাব বোধহয় থাকে ককেট্রি—যেটাকে বাংলায় ঠিক কী বলা যাবে, ঢঙি? নাকি যাকে বলে ছেনালি, তা-ই, বুলু ঠিক বুঝতে পারে না, তবে, মোমের সব কিছুই এত ভাল, এমন কি, অসহ্য কষ্ট হলেও, মোমের ইতরতা নোংরামি··· ।

'আপকা কাহাঁ যানা ?'

কোথায় যাবে বুলু। এখন নিশ্চয় বাড়ি ফিরে যাওয়া যায় না, অথচ কোথাও একটু বিশ্রাম দরকার। নিজেকে একবার আয়নায় দেখা দরকার, কোথায় কোথায় ফুলেছে বা কেটেছে। এখন তো মনে হচ্ছে যেন, সারা গায়ে জ্বর এসেছে, যদি বা, জ্বর সত্যি এসেছে কী না, ও জানে না, তবে জ্বরের মতই, সারাটা গা যেন জ্বলছে, মুখটা জ্বলছে, চোখ দুটো জ্বলছে—জ্বালা করছে, এবং গাড়িটা ঝাঁকানি খেলে, গায়ের কোন কোন জায়গায় ব্যথা করছে। চোখে মুখে একটু জল দেওয়াও দরকার, কিংবা বেশ করে একটু চান করে নিতে পারলেও হয়। সবই গরম, আর জ্বালা ধরানো, চুল দাড়ি কান, সবখানে জ্বলছে, হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল সমীরের কথা, সময় বেশিক্ষণ হয় নি, ইতিমধ্যে নীলিমাও নিশ্চয় বাড়ি চলে এসেছে, অথবা বাড়ি আসবার পথে। ও বলল, 'আলবামা।'

'আলবামা ?'

'আলবামা হোটেল।'

'ঠিক হ্যায়।'

গাড়িটা পার্কস্ট্রীটে ঢুকে, সার্কুলার রোডের দিকে গেল, সেখান থেকে কোথায় একটা ভিতরের রাস্তায় এঁকে বেঁকে, একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। যে-কলকাতায় বড় বড় সুন্দর হোটেল কাম বার আছে, তার তুলনায়, আলবামা কিছুই না। সামনে বাগানের জন্য খানিকটা জমি, সেকালের তিন পাতা ছাপের লোহার রেলিঙ দিয়ে ঘেরা. দেখে মনে হল, এই শতাব্দীর কোন সাহেবের বাড়ি ছিল। বাগান বলতে কিছুই নেই, পোড়ো জমির মত জায়গাটা পড়ে

আছে, যদি বা দু-একটা ছোট গাছ দেখা যায়, সেগুলো হয়ত পুরনো বাগানের চিহ্ন হিসাবে পড়ে আছে, যেমন পড়ে আছে, ইট দিয়ে গোল করে সাজানো ছোট ছোট ঘেরাও। দোতলা বাড়িটাও, সেকালের বাড়ির মতই। দোতলার বারান্দার কাছে, নিওন সাইনে নীল রঙে লেখা আছে, 'আবামা'। এল অক্ষরটা নিভে গিয়েছে, তাই আলবামার জায়গায় আবামা হয়ে আছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে, বুলু ড্রাইভারকে একটু অপেক্ষা করতে বলে, ভিতরে গেল। ওর কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই, কারণ দরকার হবে এ কথা ভাবে নি, পকেটে সিগারেট ছিল, মোমদের বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়ি ফিরে যাবে, এইরকম ঠিক ছিল। ঘরে, ওর দেরাজে কিছু টাকা ছিল, কিন্তু তখন কে জানত, ওকে শেষপর্যন্ত বাড়ি না গিয়ে এ অঞ্চলে চলে আসতে হবে। এখন যদি সমীর চলে গিয়ে থাকে, মুশকিল, তাহলে ওকে এখন এই ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হবে।

সামনের বারান্দায়, একপাশে কাউন্টার, যতটা সম্ভব আধুনিক কায়দায় সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বারান্দায় কাউন্টার করার কারণ, নিচের সামনের হলটা বার। কাউন্টারের পিছনের দেওয়ালেই থাকে থাকে নানা বোতল সাজানো, বেয়ারাদের আনাগোনা, হলে বেশ গোলমাল চলছে, পান চললে যে রকম হয়। বোতল খোলা, পেগ ঢালা, সোডার বোতল খোলার শব্দ, আর লোকদের কথাবার্তায় মোটামুটি জমজমাট, তার ওপরে রেকর্ড প্লেয়ারে বিদেশী কনসার্ট বাজছে।

বুলুর হঠাৎ খেয়াল হল, সমীর কত নম্বর ঘরে আছে, ও কিছুই জানে না, এবং ঘরগুলো কোথায়, তাও ওর জানা নেই, এখানে কোনদিনই আসে নি। তবু ও কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল, আর কাউন্টারের স্যুট পরা লোকটি ওর দিকে তাকাল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আপাদমস্তক একবার দেখবার চেষ্টা করল, তারপরে নির্বিকার ভাবে মুখটা ফিরিয়ে নিল। বুলু কিছুই জানে না, ওর মুখের চেহারা

এখন কী রকম, কিন্তু লোকটা এত নির্বিকার ভাব করল কেন। বোধহয় ভেবেছে, বুলু মাতাল, কোথাও মারামারি করে এসেছে, অবিশ্যি সেটা ভাবাও এখন ভাল, ও জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বলতে পারেন মিঃ সমীর ঘোষ কত নম্বর রুমে আছেন ?'

লোকটা মুখ না ঘুরিয়েই, হিসাব লিখতে লিখতে জবাব দিল, 'গো টু এনকোয়ারি অ্যাণ্ড আস্ক।'

কেন লোকটা মুখ ফেরালো না, কে জানে, বুলু মনে মনে উচ্চারণ করল 'গাধা'। তারপরে একটা বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল, 'এনকোয়ারিটা কোথায় ভাই ?'

বেয়ারা হলঘরের ডান দিকটা দেখিয়ে দিল। বুলু হলঘরের ডান দিকে গিয়ে দেখল, সেদিকে আর একটা বারান্দা। সেই বারান্দায় গিয়ে দেখল একটা টেবিল, একটা চেয়ার, প্লাস্টিক বোর্ডে লেখা আছে, 'এনকোয়ারি' এবং একটা ইণ্টার কনেকটেড টেলিফোন। চেয়ারে বসে আছে এক বুড়ো উকীলের মত ভদ্রলোক, অনেকটা ওর বাবার মতই ঢলঢলে পোশাক পরা। বুলু তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, একই কথা। লোকটা বাঙলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি রুম নম্বর জানেন না ?'

'না, তবে উনি আমাকে এখান থেকে টেলিফোন করেছিলেন, বলেছিলেন, এখানেই একটা ঘরে আছেন।'

'তা বললে তো হয় না, এখানে অনেক ঘর। নম্বরটা জেনে নেওয়া উচিত।'

বলে, হাতের কাছে একটা খাতা ছিল, সেটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম বললেন ?'

'সমীর ঘোষ।'

'দোতলায়, বারো নম্বর।'

বলেই খাতাটা বন্ধ করল, এবং বুলুর দিকে তাকিয়ে। দেখার মধ্যে কেমন একটা ভাব, যাকে বলে ঠোঁট ওলটানো, একটা বিরক্তি এবং সন্দেহ।

'সিঁড়িটা কোনদিকে ?'

'পেছনে।'

লোকটা বুড়ো আঙুল দিয়ে, নিজেরই ঘাড়টা দেখিয়ে দিল, অর্থাৎ লোকটার পিছন দিকে। সেই দিকে এগিয়ে বারান্দার শেষে বাঁ দিকে দোতলায় আবার কাঠের সিঁড়ি দেখতে পেল। ওপরে গিয়ে, ঢাকা বারান্দার পাশে পাশে, ঘরের নম্বর দেখে বারো নম্বরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। নীলিমা তাহলে এখন কী অবস্থায় আছে, কে জানে। এ সময়ে ডাকাডাকি করা উচিত হবে কী না, কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে, মিটার উঠছে, হয়ত হোটেলে ঢুকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করবে। ও দরজায় ঠুকঠাক শব্দ করল, কোন জবাব পাওয়া গেল না। আবার শব্দ করল, ভিতর থেকে প্রশ্ন এল, 'কে ?'

শব্দটা যেন ঘরের ভেতরেই, অনেক দূর থেকে এল। ও বলল, 'বুলু।

কয়েক সেকেণ্ড পরে দরজাটা খুলে গেল, সমীর সামনে দাঁড়িয়ে। বুলু প্রথমে দেখতে চেষ্টা করল, নীলিমা ভিতরে আছে কী না, জিজ্ঞেস করল, 'একলা ?'

'হ্যাঁ। এই তো একটু আগেই নীলি গেল।'

সমীর আবার আদর করে নীলিমাকে নীলি বলে, বুলুর সামনেই বলে। বুলু বলল, 'আমি ট্যাক্সিতে এসেছি, সঙ্গে টাকা নেই।'

তার আগেই সমীর বলে উঠল 'এ কি, তোর ঠোঁটে রক্ত, ভুরুর কাছটা ডুমো মত হয়ে ফুলে উঠেছে ?'

'সেসব কথা পরে হবে। ট্যাক্সির ভাড়াটা আগে দেওয়া দরকার।'

সমীর তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে, দেওয়ালে, কলিং বেলের বোতাম টিপল। বলল, 'তুই ভেতরে বোস, কত টাকা হয়েছে ?'

'টাকা তিনেকের মত।'

একজন বেয়ারা এসে ঢুকল। খাটের ওপর বিছানা, সেখানেই

সমীরের পার্স পড়েছিল। টাকা বের করে দিয়ে বলল, 'ছাখ, বাইরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে এস।'

বেয়ারা চলে গেল। বুলু চেয়ারে বসে চোখ বুজল।

সমীর বুলুর কাছে এসে দাঁড়াল, ওর মুখে একটা উদ্বেগের ভাব, মনের উত্তেজনা গলার স্বরে ফুটে উঠল, বলল, 'আমি সব ঘটনাটা শুনতে চাই, কী ঘটেছে। তার আগে, আমাব মনে হয়, তোর যা অবস্থা বুলু, একটা ব্যাণ্ডি খা।'

বুলু ঘরে ঢুকেই, গন্ধ পেয়েছিল, সমীর ড্রিঙ্ক করেছে, যদি বা, তেমন বেশি না, সমীরের আচার আচরণেই সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল, তাছাড়া সমীর রাত্রের স্নানটাও, এখানেই এই মাত্র সেরে নিয়েছে, যে কারণে, এখনও ওর গায়ে শুধু গেঞ্জি আর প্যাণ্ট, চুলগুলো উসকো খুসকো, আঁচড়ানো হয় নি, এবং বুলুকে দরজা খুলে দিতে দেরি হয়েছিল। সমীর হাত বাড়িয়ে আবার বেল টিপে, বেয়ারাকে ডাকল, বুলুকে বলল, 'একটু ব্র্যাণ্ডি খেলে, বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠবি. তা না হলে, এখুনি ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, তোকে দেখে আমার একেবারেই ভাল লাগছে না।'

বুলু বলল, 'ব্যস্ত হতে হবে না।'

'ব্যস্ত হতে হবে না মানে কী, তুই নিজেকে দেখতে পাচ্ছিস না, তাই বুঝতে পারছিস না। দেখি, মুখটা তো্‌ল তো, তোল—'।

এই সময়ে বেয়ারা দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকল, সমীর বলল, 'এক বড়া পেগ ব্র্যাণ্ডি লাও, সোডা নেই মাংতা গরম পানি লাও।' বলতে বলতেই বুলুর দিকে আর একবার তাকিয়ে, হাই তুলে বলে উঠল, 'দেখো, এক কাম কর, তুম এক বড়া কেতলি মে, এক কেতলি গরম পানি লে আও।'

বেয়ারা চলে গেল, সমীর আবার বলল, 'বুঝলি বুলু তুই একটু চান করে নে, কিন্তু ঠাণ্ডা জলে না, মোটামুটি সহ্য হয়, এরকম গরম জলে চান করে নে, অনেকটা ভাল লাগবে। এবার তুই আমাকে

ঘটনাটা সব ভেঙে বল তো, ওরকম একটু আধটু বললে হবে না, আমি সব ঘটনাটা শুনতে চাই।'

বুলু টেবিলের ওপর থেকে মুখ তুলল। ওর চোখ দুটো টকটকে লাল, ওর নিজের মনে হচ্ছে, গায়ে যেন সেই রকম জ্বরভাব, এবং শরীরের কোথাও কোথাও ব্যথা করছে। বলল, 'আজ হঠাৎ মোমের কথা আমার মনে পড়ে গেল।'

'মোম! মানে অনসূয়া?'

'বোধহয়।'

'বোধহয় মানে কী, মোমের ভাল নাম তো অনসূয়াই।'

'তা হবে। তা-ই, তবে সেটা আমার মনে থাকে না।'

'অনসূয়াকে আজই তোর প্রথম মনে পড়ল?'

'হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যায়, সেই রকম তো ব্যাপারটা, যেন আজই সন্ধ্যায় আমার মনে পড়ল, আর—।'

'অথচ, আমরা মানে আমি নীলি আমরা তো রোজই সেকথা বলাবলি করি, অনসূয়ার কথা।'

'কিন্তু আমাকে কেউ বলে না, বলেও নি যে, মোম বলে একজন আছে।'

'আমরা তো ইচ্ছা করেই তোকে বলিনি। আমরা বরং ভেবেছি তোকে অনসূয়ার নাম বললে, তোর আবার মন-টন কোন রকম খারাপ হয়, কষ্ট পাস সেইজন্যই বলিনি কিন্তু তারপর, তারপরে কী?'

সমীরের গোটা মুখ ভরে অবাক ভাব, যেন ভাবতেই পারে না, অনসূয়ার কথা বুলুর এত দিন মনে পড়েনি, বুলু বলল, 'মোমের নামটা মনে হতেই, আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না, মনে হল, এখন এখনই আমার মোমের সঙ্গে দেখা করা দরকার, কারণ, আমি কালই মরে যাব কি আরও পঞ্চাশ বছর বাঁচব, সেটা পরের কথা, এই মুহূর্তে আমার বেঁচে থাকার অর্থ মোমের সঙ্গে দেখা করা, একটা রেসপনসিবিলিটি, এটা আমারই একটা ব্যাপার, মানে-কী বলব, এ ব্যাপারটার থেকে আমি পালাতে পারি না—'

বেয়ারা ঢুকল। গেলাসে ব্র্যাণ্ডি আর হাতে গরম জলের কেতলি, একটা ছোট টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'ইয়ে পানি পিনে ভি সকতা সাব।'

সমীর বলল, 'ঠিক হ্যায়।'

কিন্তু সমীরের চাউনি দেখে মনে হল, বুলুর কথাগুলোই ওর মাথায় ঘুরছে, এবং কথাগুলো যেন ঠিক বুঝতে পারে নি। বেয়ারা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে, ও গিয়ে দরজটা বন্ধ করে, ব্র্যাণ্ডির গেলাসে গরম জল ঢেলে বুলুর সামনে রাখল, জিজ্ঞেস করল, 'রেসপনসিবিলি-টিটা কী ঠিক বুঝতে পারছি না। পাঁচ বছর পরে।'

বুলু বলে উঠল, 'সেই পাঁচ বছরটা কিছুই না, তুলনায় কিছুই না, এমন কি আজ একটু আগেই যা ঘটে গেল, সেটাও কিছুই না, যদিও আমি সহ্য করতে পারছি না, তবু—।'

সমীর বলে উঠল, 'কী ঘটেছে, সেটাই আগে শুনি।'

সমীরের মুখ দেখে বোঝা গেল, বুলুকে ও ঠিক বুঝতে পারছে না, বুলুর কথার কোন পারম্পর্য খুঁজে পাচ্ছে না, এমন কি, ওর চোখের চাউনি দেখে বোঝা যায়, বুলুকে যেন ও একটা সন্দেহের চোখে দেখছে। কোন কটু সন্দেহ না, মাথাটা ঠিক আছে কী না, বা বুলু যা বলছে, সে কথার কোন অর্থ আছে কী না, কিছু ভেবে চিন্তে বলছে কী না, এই রকম একটা সন্দেহ। বুলু সমস্ত ঘটনাটা বলতে আরম্ভ করল, কথাগুলো এত তাড়াতাড়ি বলতে লাগল সমীর সব কথা যেন ধরতেই পারছে না। কথার ফাঁকে ফাঁকে সমীর ওকে ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিতে বলছে, বুলু চুমুক দিচ্ছে, গরম জলের বাষ্পে গেলাসের রঙটা ঘষা কাঁচের মত দেখাচ্ছে। কথাগুলো শুনতে শুনতে সমীরের মুখে কখনও রাগ ফুটে উঠছে. কখনও মুখটা কুঁচকে যাচ্ছে, এবং এক সময়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল, 'তুই বলছিস্ অনসূয়ার মুখটা তোর আগে মনে পড়ে ছিল না?'

'না, মোমের নামটা মনে পড়ার পরেও, কিছুতেই ওর মুখটা মনে

করতে পারছিলাম না। তারপরে, ভিতরের বারান্দা থেকে যখনই মোমের চিৎকারটা ভেসে এল—।'

'ওটা যে অনসূয়ারই চিৎকার, বুঝলি কেমন করে?'

'আমার আর একটা চিৎকারের কথা মনে পড়ে গেছল আর একদিন ঠিক ওই রকমই একটা চিৎকার, ওই রকম গলা, একই গলায়, ঠিক যেন ওই রকম চিৎকারই শুনতে পেয়েছিলাম, ঠিক—।'

বুলুর গলাটা যেন গুলিয়ে গেল, ডুবে গেল, কিন্তু ওর ঠোঁট কাঁপতে লাগল, ব্র্যাণ্ডির গেলাস ধরা হাতটা কাঁপতে লাগল, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল, কপাল আর ভুরুর কাছে, ফুলে ওঠা জায়গায়, ঘামের ফোঁটা জমে টলটল করতে লাগল, কালো দাড়ি বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল, ব্যাণ্ডিটা এক চুমুকে ও খেয়ে ফেলল। অভ্যাস নেই, তাই মুখটা বিকৃত হল, কয়েকবার ঢোক গিলল, একসঙ্গে অনেকটা খেয়ে ফেলে, ধাতস্থ করে নেবার জন্য।

সমীর যেন একটু ভয় পাচ্ছে বুলুকে দেখে সেইরকম ওর মুখের ভাব। সমীর বুঝতে পারছে একদিন যেমন চিৎকারের কথা বুলু বলছে, এবং সেই চিৎকারটা বুলুই প্রথম শুনেছিল নিশ্চয়। ও জিজ্ঞেস করল, 'আর একটু ব্র্যাণ্ডি খাবি বুলু?'

বুলু মাথা নাড়ল, নিঃশব্দে বলল, 'সেই চিৎকারটা শুনেই মোমের মুখটা আমার মনে পড়ে গেল। আমি জানি না, কেন ও চিৎকার করে উঠেছিল। আমাকে অতুদা যখন মারছিল, তখনই তো চিৎকার করে উঠেছিল। ওকেও কেউ মারছিল, না কি, মোম ছুটে বাইরের ঘরে আসতে চাইছিল, আমাকে মোম নিজের হাতে মারবে বলে হয়ত ছুটে আসতে চাইছিল, আর ওকে সবাই ভিতরে আটকে রেখেছিল বলে বোধহয় ওরকম চিৎকার করেছিল। কী জানি, আমি জানি না, কিন্তু চিৎকারটা সেইরকম—সেইরকম সাঙ্ঘাতিক। বুলু হঠাৎ থেমে গেল, কিন্তু ওর ঠোঁট কাঁপছে, এবং চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এ ঘরে ওর মন নেই, অন্য কিছু দেখছে। বুলুর চোখগুলো বড় হয়ে উঠেছে, যেন একটা ভয়ঙ্কর কিছু দেখছে, এমনি

ভাব। আবার বলল, 'মোমের মুখটা মনে পড়তেই, আর আমার কিছুই হচ্ছিল না, মারধোরগুলো যেন ওপর ওপর মনে হচ্ছিল, আমার ভিতরে কোথাও চোট লাগছিল না।'

সমীর বলে উঠল, 'কিন্তু অন্ত আর সন্তকে ছাড়া হবে না। এভাবে মারার বদলা নিতে হবে।'

বুলু মাথা নেড়ে বলল, 'বদলা আবার কী।'

'তা বলে এরকম জানোয়ারের মত—।'

বুলু হঠাৎ হাসল, আবার গম্ভীর হয়ে গেল, উচ্চারণ করল, 'জানোয়ার'। বলেই উঠে দাঁড়াল, বলল, 'অবিশ্যি, আমার খুব রাগ হচ্ছে, ঘেন্না হচ্ছে মারের জন্য, ইচ্ছা হয়, শোধ নিই, কিন্তু তাতে সুখ নেই, শান্তি নেই, ওদেরও আছে বলে. আমার মনে হয় না। আমি কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়েছি। পাঁচ বছর আমি প্রায় কোন কথাই বলি নি, কেমন যেন থমকে ছিলাম, এখন আর স্থির থাকতে পারছি না। কী করব, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মুখটা অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিলেই কি সব হয়ে যাবে।'

'বুলু।' সমীর প্রায় আঁতকে উঠে ডাকল। বুলু বলল, 'জিজ্ঞেস করছি, আমি জানি তাতে কিছুই হবে না।'

সমীরের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে বুলুকে ও ঠিক বুঝতে পারছে না, বুলুর কথাগুলো অস্পষ্ট লাগছে ওর কাছে, বলল, 'জলটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, চান করে নে।'

'হ্যাঁ, চান করে নিই, আমি খুব ফ্রাসট্রেটেড ফীল করছি, ওরা মারল, কিন্তু—।'

মুখে উচ্চারণ না করে, মনে মনে বলল, ওরা মারল, অন্ত সন্ত না কেবল, পাড়ার এবং মিছিল ভাঙা রাগী ছেলেরা, ওরাই নাকি বিপ্লব করবে এবং সরকার কায়েম করবে, ওরা মারল, নীলিমা সমীরের সন্ধ্যায় বলে, সুমিতা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল, রাগী রাগী ভাবে মহেন্দ্রদা চোখ সরিয়ে নিয়েছিল, মা গুরুদেবে আছে, যে যার নিজের নিজের মধ্যে, ওরাও তা-ই। ওরা মারতেই ছিল, আর বুলু মোমেতে ছিল।

সমীর ইতিমধ্যে গরম জলের কেতলিটা বাথরুমে দিয়ে, বালতি পেতে, কলের মুখ খুলে দিয়েছে। বুলু বাথরুমে গেল। দরজা বন্ধ করে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, জামা প্যাণ্ট খুলল, মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, আয়নার ছায়ায়। কপাল ফোলা, ঠোঁটের পাশের কাটা, রক্ত জমে আছে। প্যাণ্টে জামায় ধুলো। জল ঢেলে স্নান করতে করতে ফোলা জায়গায় হাত লাগতে ব্যথা করল, এবং মোমকে আবার দেখতে পেল ও। দেখল মোম ওর সামনে ল্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ডান দিকের উরত কাৎ করে, যৌনদেশ ঢাকা দিয়ে রেখেছে, যেন জামা কাপড় সব খুলে ফেলেও কী এক অমূল্য সম্পদ ঢাকা দিয়ে রেখেছে। বুলু নিজের শরীরের দিকে তাকাল নিচের অংশটার চেহারা বদলে যাচ্ছে, যেন একটা মাথা নিচু সাপ, আস্তে আস্তে ফণা তুলে শক্ত আর বড় হয়ে উঠছে আর বুলু যেন দেখছে এবং অনুভব করছে, সাপুড়ে বেদেনীর মত, মোম হাত দিয়ে সেই সাপের ফণা মুঠি করে ধরেছে।··সেই একটা ঘটনা ওর মনে পড়ে গেল, শরীরের এই রকম অদ্ভুত অবস্থার কথা ভেবে, যা বুদ্ধিশুদ্ধি ভাবনা চিন্তা দিয়ে, ব্যাখ্যা করা যায় না, কখন কোন অবস্থায় শরীরের এই রকম চেহারা বদলে যেতে পারে। মোমের দাদু, কেয়াতলা না কোথায় থাকতেন, রাস্তার ওপরেই বাড়ি, দাদুর সিরিয়াস অসুখে, মোম দাদুকে দেখতে যাচ্ছিল বুলুও সঙ্গে ট্যাক্সিতে ছিল। দাদুকে দেখে, ওদের অন্য জায়গায় যাবার কথা ছিল। বুলও দাদুর বাড়িতে যেত, অনেকবার গিয়েছে মোমের সঙ্গে, মোমের মামারা বুলুকে খুব একটা অপছন্দ করত না। প্রথম যখন দুজনে ট্যাক্সিতে বসেছিল, তখন বেশ ভালই ছিল। বুলু তারপরে মোমের সঙ্গে, গায়ে গা ঠেকতে, ওর কোলের ওপর বুলু হাত রেখেছিল. মোমও বুলুর হাতটা ধরেছিল, আর বুলুর শরীরে উত্তেজনা জেগে উঠেছিল আস্তে আস্তে। ট্যাক্সিতে বসে, ওরকম করার কোন কারণ ছিল না, কারণ ট্যাক্সিতে চাপাটা ওদের দুজনের কোন সুযোগ নেবার জন্য না, হাত ধরাধরি বা যা কিছু, সে সবের জন্য ওদের অনেক

সুযোগ ছিল। কিন্তু তখন নেহাত কী মনে হয়েছিল, একটু ছোঁয়া-ছুঁয়ি করতেই বুলু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ও মোমের হাতসুদ্ধ কোলের ওপর জোরে চাপ দিয়েছিল, মোম ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে-ছিল, ভুরু কুঁচকে, টান করে, ঠোঁট কুঁকড়ে, শব্দ না করে বারণ এবং ধমক দেবার ভঙ্গি করেছিল, কিন্তু বুলুর মনে হয়েছিল, হাঁড়ির সরা ঠেলে ফেলে, সাপ ফণা তুলতে চাইছে। আর ঠিক সেই সময়েই দাদুর বাড়ির সামনে গাড়িটা এসে দাঁড়াতেই, বাড়ির ভিতরে কান্না-কাটির শব্দ শোনা যাচ্ছিল, এবং প্রায় দরজার কাছে দাঁড়িয়েই বড় মামা কেঁদে বলে উঠেছিলেন, 'ওরে মোম, বাবা আর নেই।' অর্থাৎ একটু আগেই, মোমের দাদু মারা গিয়েছিলেন, সব্বাই কান্নাকাটি করছিল এবং মোম 'দাদু নে···।' এই বলে কেঁদে উঠে, গাড়ির দরজা খুলে ছুটে গিয়েছিল, আর বুলু নামতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল, সেই প্রথম ও টের পেয়েছিল, ওর ভিতরে বাইক বা জাঙ্গিয়া কিছুই পরা নেই, প্যান্টের সামনেটা ফুলে আছে, বোতামের ফাঁক দিয়ে যে কোন মুহূর্তে সাপের ফণার মত প্রত্যঙ্গ বেরিয়ে পড়তে পারে, তা-ই সেই মুহূর্তে নামতে পারে নি, গাড়ির মধ্যেই চুপ করে বসেছিল, পায়ের ওপর পা দিয়ে। বড় মামা ডাকছিলেন, 'এস বুলু এস', বুলু ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'যাচ্ছি।' কিন্তু আশ্চর্য, অস্বস্তি আর বিরক্তিকরও বটে, বুলুর মস্তিষ্কে গিয়ে তখনও বোধহয় মৃত্যু এবং কান্নাকাটি ঢুকতে পারে নি, সেই একই অবস্থায় ও চুপ করে বসেছিল, ড্রাইভারটাও অবাক হয়ে পিছন ফিরে তাকিয়েছিল। একটা লোক মরে গিয়েছে, সবাই কান্নাকাটি করছে, আর বুলু নামছে না, প্রথম কাউকে বোঝা-বার মত কথা, বুলু ভাবতে পারছিল না। বিরক্ত হয়ে ছি ছি করেছিল, এবং বলেছিল, 'উল্লুক।' কাকে বলেছিল, নিজেও ঠিক জানে না, শরীরের একটা প্রত্যঙ্গকেই হয়ত এবং আস্তে আস্তে ও যখন স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছিল, তখন ভাড়া মিটিয়ে নেমে, দরজার কাছে যেতে, মোম জলে ভেজা চোখ তুলে বলেছিল, 'তোমার যখন ইচ্ছে করছিল না তুমি ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলে কেন, চলে গেলেই

পারতে।' তার মানে, মোম বুলুর ওপরে চটে গিয়েছিল, ট্যাক্সিতে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে ভেবেছিল, বুলুর এইসব মরা-টরা দেখে, বাড়িতে ঢোকবার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। বুলু বলেছিল, 'না, মানে—।' মোম সে কথা শোনে নি, সে দাদুর মৃতদেহের কাছে ফিরে গিয়েছিল, এবং তিন চারদিন মোম ওর সঙ্গে ভাল করে কথা বলে নি। বুলু যখন ব্যাপারটা বোঝাতে চেয়েছিল, মোম বলেছিল, 'সব সময়ে, সব ব্যাপারে ইয়ার্কি করো না, আমার ভাল লাগে না।'

॥ ১২ ॥

দাদুর মরার ব্যাপারে তুমি এরকম ঠাট্টা করতে পার, তোমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমার খুব খারাপ লাগে। মোম রীতিমত রাগ করেছিল, মনে মনে কষ্ট পেয়েছিল। এবং ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে, আবার যখন বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, তখন মোম বলে উঠেছিল, 'ছাখ বুলু, ফাজলামি করো না, আফটার অল তুমি নিশ্চয় হিউম্যান বীং।' একথা দিয়ে, মোম আসলে বলতে চেয়েছিল বুলু ফাজলামিই করতে চাইছিল, কোন মানুষের কখনও ওরকম হতে পারে না। মোম কোনদিনই কথাটা বিশ্বাস করেনি। বুলুও আর বোঝাবার চেষ্টা করে নি কিন্তু মানুষ মাত্রকেই বলতে শোনা যায়, মানুষের কী হতে পারে আর কী না হতে পারে, সবই তার জানা। বুলুর মনে হয়, মানুষ তার নিজেকেই সঠিক জানে না বা জানলেও সে জানাটাকে কোন মূল্য দিতে চায় না। আসলে যুক্তি তর্ক দিয়ে, সবসময়ে মানুষের সব অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায় না, অন্তত কতগুলো চলতি কথা বা বিশ্বাসের যুক্তি তর্কে কখনোই না। মানুষই জানে, সে সব কিছুর থেকেই বড়। তার তৈরি থিওরির থেকেও।

সত্যি, শরীরটা ঝরঝরে লাগছে, ঠাণ্ডা জলের থেকেও, গরম জলটাই যেন শরীরে অনেক বেশি আরাম এনে দিল। অনেক

হালকা লাগছে এখন, এবং বেশ স্বাভাবিক। প্যাণ্ট শার্ট পরতে পরতে বুলুর মনে হল, ঘরের মধ্যে সমীর যেন কারোর সঙ্গে কথা বলছে। কে আসতে পারে, মনে হচ্ছে যেন কোন মেয়ের গলা, নীলিমা কি আবার এল। সমীর কি বাড়িতে টেলিফোন করেছিল না কি, খবর পেয়ে কি নীলিমা চলে এসেছে। বুলু মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে, দরজা খুলে, ঘরের মধ্যে এল, দেখল একেবারে অচেনা একটি মেয়ে বসে আছে চেয়ারে, ড্রেসিং টেবিলের সামনে আর সমীর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে।

মেয়েটির বয়স বোধহয়, চব্বিশ পঁচিশ হবে। খাটের ওপরে, দেখতে শুনতে মন্দ না। লাল লাল ভাবের শাড়ির সঙ্গে, ম্যাচ করে, লাল লাল স্লিভলেস জামা গায়ে দিয়েছে। বুক আর কাঁধ বেশ চওড়া করে কাটা। টুলুর বন্ধুর মত, সেই মেয়েটিরও নাভির নিচে শাড়ি পরা। জামাটাও অনেকখানি তোলা, কেবল বুক দুটো কোন রকমে ঢাকা দিয়েছে, আর নিচে, কোমরের বেশ খানিকটা অংশ খোলা, যেন আর একটু টেনে দিল, রোমশ বস্তিদেশ দেখা যাবে। মাথার পিছনে অনেক কিলিপ এঁটে, একটা বিনুনি করেছে। ঠোঁটে রঙ, চোখ দুটো বড়ই, তাতে ওপর পাতায়, কোণ অবধি টেনে, ভারী করে কাজল পরেছে। বুলু আসতে মেয়েটি ওর দিকে তাকাল, ঠিক যে অপরিচয়ের দৃষ্টি তা না, অনেকটা যেন দেখি তো লোকটা কেমন। সমীর বলল, 'বুলু, আমার বন্ধু রুণু, ওর নাম বুলু।'

বুলু নমস্কার করার ভঙ্গিতে হাত তুলল। আর রুণু সেই ভাবেই ওর জবাব দিল। এবং বুলুকে তোয়ালে দিয়ে, মাথা মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসতে দেখেই, ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে, চিরুনিটা বাড়িয়ে ধরল।

এমন সহজভাবে মেয়েটি চিরুনি বাড়িয়ে ধরল, যার নাম রুণু, সমীর এইমাত্র বলল, এবং সমীরের নাকি বন্ধুও বটে, বুলুকে যে বেশ ভালই চেনে। মুখোমুখি, যাকে বলে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও, রুণুর মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, বলুর সম্পর্কে সে হয়ত অনেক

কিছুই শুনেছে। বুলু চিরুনিটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে, প্রায় রুণুর পিছনে দাঁড়িয়ে, আয়নার দিকে ফিরে এখনো ভেজা ভেজা বড় চুল আঁচড়ে নিল। ও লক্ষ্য করল, রুণু আর সমীর যেন নিজেদের মধ্যে চোখা-চোখি করল, বুলু চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ভাবল, সমীরের এই বন্ধু রুণু হঠাৎ আলবামার এই ঘরে, এ সময়ে হাজির হল কেমন করে। আগে থেকেই কোন কথা ছিল, নাকি না কী, হঠাৎ এসে পড়েছে। হঠাৎ আসবে কেমন করে, সমীর যে আলবামাতেই আসবে, সে কথা, রুণু নামে এই বন্ধু কি করে জানবে, কারণ, সমীর কোনদিন সন্ধ্যায় কোথায় যাবে, সবটাই ওকে, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হয়। অবিশ্যি, বুলু আগে তাই জানত এখন সমীরের অবস্থা কতখানি বদলেছে, ও কিছুই জানে না।

কিন্তু তা-ই যদি হয়, সমীর যদি আগে থাকতেই রুণুকে আসতে বলে থাকে, তা হলে, কেন আসতে বলবে, সেটা জানতে ইচ্ছা করে। নিশ্চয়ই আলবামার নির্জন ঘরে, যাকে বলে, একান্তে দেখা করবার জন্য, আসতে বলে নি, কারণ নীলিমা-সমীরের নীলিও তো, নির্জনে একান্তে দেখা করার জন্য এসেছিল, সেই কারণে কি রুণু এসেছে। এলেও অবিশ্যি বলার কিছু নেই, কারণ সমীর আর নীলিমার ব্যাপারে বুলুর কিছুই করার নেই। সমীর আর নীলিমার ব্যাপার, তার ভাল মন্দ যা কিছু, সবই ওদের দুজনের দায়। তথাপি, ভাবতে একটু কেমন লাগে যে, একই রাতের এক আধঘণ্টা আগে পিছে, একজন, দুজনের সঙ্গে প্রেম করবে। ব্যাপারটাকে প্রেম-ই তো বলতে হবে। বুলু, আয়নায় সোজাসুজি রুণুর মুখের দিকে না তাকালেও মনে হচ্ছে, ও আয়নায় বুলুর দিকে মাঝে মাঝে দেখছে এবং মাঝে মাঝে সমীরের দিকে, যে কারণে বুলুর মনে হল, এরা যেন চোখে চোখে কোন কথা বলছে। সমীর বা রুণু কি কোনরকম অস্বস্তি বোধ করছে, বুলুর জন্য। কিন্তু তা-ই বা কেন হবে, কারণ বুলু তো বাথরুমের মধ্যে ছিল। সমীরের যদি ইচ্ছা হত, রুণুর সঙ্গে যেন বুলুর দেখা না হয়ে যায়, তাহলে, তাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করে

দিতে পারত। বরং রুণু, যে না কি সমীরের বন্ধু, পোশাকে আশাকে বেশ ঝকঝকে, এক পায়ের সোনালি নাগরা সহ এক ঠ্যাং ছড়িয়ে, আর একটা পা ড্রেসিং টেবিলের দিকে অনেকখানি মেলে দিয়ে, কেমন যেন একটা সহজ আলগা আলগা গা ভাসানো অবস্থায় বসে আছে। যার উপস্থিতি নিয়ে মনে কোন অস্বস্তি থাকতে পারে, সে কখনও এমন করে বসে থাকতে পারে না, এমন করে চিরুনিও এগিযে দিতে পারে না। রুণু সমীরের কী ধরনের বন্ধু, কে জানে, তবে আলবামায় সমীরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তাতে মনে হয়, বোধহয় ঘনিষ্ঠতা আছে।

রুণু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, একটু সরে পাশ নিয়ে, বুলুর দিকে চেয়ে বলল, 'এ মা আমি কী রকম অভদ্র, চিরুনিটা আপনাকে দিয়ে, আমি এখানে বসে আছি। আপনি বসে বসে চুল আঁচড়ান।'

বুলু বলে উঠল, 'আপনি বসুন, আমার তো হয়ে গেছে।'

বুলু চিরুনিটা রাখল, আর আঙুল দিয়ে, দাড়িগুলো আঁচড়ে নিল একটু। সমীর এখন অন্য দিকে সরে গিয়েছে।

রুণু জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দাড়ি রাখতে ভাল লাগে বুঝি?'

বুলু রুণুর দিকে তাকাল। একটু চওড়া ভাবের হলেও রুণু দেখতে মন্দ না, স্বাস্থ্যটা বেশ ভাল। মেয়েটির কালো চোখ দুটোতে কেমন একটা কৌতূহল, যেন কিছু জিজ্ঞেস করবে করবে ভাব সব সময়ে, আর যেন হাসিতে উপছে পড়ার জন্যে, চোখ দুটো ঝকঝকে করছে। অথচ চোখের কোলগুলি পরিষ্কার না, একটু যেন বসা বসা, কালির ছাপ। কোন রকম নাও থাকতে পারে। এক একজনের এমনিতেই চোখের কোল একটু বসা, একটু কালো দেখায়, এবং সম্ভবত এই কারণেই, রুণুর চোখ একটু বেশি চকচকে লাগছে। যাকে বলে ঔজ্জ্বল্য, চোখের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে তোলবার জন্য এমনিতেও তো ডার্ক কিছু চোখের নিচে ওপরের পাতায় অনেকে মাখে। রুণু অবিশ্যি, তা মেখেছে বলে মনে হয় না। যে কোন কারণেই হোক, নিচে থেকে ঠেলে দেবার জন্যই হোক বা জামাটা অতিরিক্ত

কাটা বলেই হোক, রুণুর বুকের মাঝখানের খাঁজ এবং মাংসের বৃত্ত অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। রুণু নিশ্চয়ই হাসছে না বা ইচ্ছা করে শরীর কাঁপাচ্ছে না, বুলুর মনে হল, রুণুব শরীরটা কেবলই দুলছে, বুক কাঁপছে থেকে থেকে। কিন্তু এ ধরনের জিজ্ঞাসা বুলুব ভাল লাগে না। কেননা, এরকম জিজ্ঞাসার জবাবে, অনেক কথা বলতে হয়, এক কথায় জবাব হয় না অথচ রুণুকে এত কথা বলবার মত চেনা পরিচয় নেই। ও বলে, 'ভাল মন্দ জানি না, রয়েছে, আছে।'

বুলু পিছন ফিরে দেখল, সমীর ঘরে নেই। কিছুই না বলে, সমীর কোথায় গেল, নিশ্চয়ই চলে যায় নি। রুণু আবার বলল, 'আমার কথায় কিছু মনে করলেন না তো।'

বুলু দেখল রুণু যেন চোখ দুটোকে একটু বড করে, চকচকে করে তুলতে চাইছে, আবও ওর শবীবটা যেন সামনেব দিকে কেমন উঁচু হয়ে উঠছে। রুণুর গভীব নাভিটা, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এতটা গভীর কেন, নিশ্চয়ই ছেলেমেয়ে হয়নি। অবিশ্যি তেমন মেদও নেই, রুণুব গড়নটাই ভাল। রুণু কাপড়টা যেন একটু বেশি নামিয়ে পরেছে, টুলুর বন্ধুর ঠিক এতটা নামানো ছিল না যেন। রুণুর যেন অনেকটা, বেলি ড্যান্সারদের মত, কোমরের অনেকখানি বেরিয়ে আছে। বুলুর চোখ আপনা থেকেই, রুণুব এই পোশাকের ওপর গিয়ে পড়েছে। কিন্তু বুলু কিছু মনে করলেই বা রুণুব কি যায় আসে। এই তো মাত্র পরিচয়। সমীরটা গেল কোথায়। ও রুণুকে বলল, 'না, মনে আবার কী করব। আপনি বসুন, আমি ববং দেখি সমীর কোথায় গেল।'

রুণু বলল, 'আপনি বসুন, সমীরবাবু এখুনি আসবেন, বোধহয় কোন দরকারেই গেছেন।'

রুণুর কথা শেষ হবার আগেই, সমীর ফিরে এল। বলল, 'বস্ বুলু, দাঁড়িয়ে কেন। এখন একটু ভাল লাগছে তো।'

'হ্যাঁ বেশ ভাল লাগছে।'

সমীর বড় টেবিল ঘিরে যে-সোফা কয়েকটা রয়েছে, সেইদিক দেখিয়ে বলল, 'রুণু বস। তোমার জন্য লাইম জিন দিতে বলেছি।'

রুণু চোখের পাতা তুলে, একবার বুলুকে দেখে নিয়ে বলল, 'ও বাবা জিন খাব আবার।'

রুণুর নাকের ডগাটা একটু কুঁচকে উঠল, আর চোখের দৃষ্টিতে যেন কেমন একটা কৃপা চাওয়ার ভাব, অথচ সমীর সেদিকে কোন-রকম লক্ষ্যই করল না, কেবল বলল, 'একটু জিন তো।'

রুণু তথাপি বলল, 'শেষটায় মাতাল-টাতাল হয়ে যাব।'

'হয়ে যাও, হয়ে যাবে, তাতেই বা কী।'

কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব সমীরের গলায় আর বলার ভঙ্গিতে, এবং দেওয়ালের কাছে, ছোট টেবিলের ওপরে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। রুণু হেসে উঠল, যেমন কোন ঠাট্টার কথা শুনলে কেউ হাসে, সেইরকম। এবং সমীর বুলুর দিকে ফিরে বলল, 'আজ আর তোর বাড়ি গিয়ে দরকার নেই বুলু এখানেই থেকে যা, আমি একটা খবর দিয়ে দিচ্ছি।'

বুলু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না না, সমীর, আমার কাছে এখানে থাকবার মতো টাকা পয়সা কিছুই নেই। তুই তো জানিস, একটু আগেই —'

বুলুর কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল, সমীর তখন রিসিভারে বুলুদের বাড়ির নম্বরটা বলছে। বলা হয়ে গেলে, আবার বুলুর দিকে ফিরে বলল, 'ও কথা তুই ভাবছিস কেন। আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তো, এ ঘরটা আমারই আছে, দরকার হয়, একস্‌টেণ্ড করতেও কোন অসুবিধা নেই, আর টাকার — হ্যালো........।'

সমীর আবার মুখ ঘুরিয়ে, রিসিভারে কথা বলতে লাগল, 'হ্যালো আজ্ঞে, আমি সমীর কথা বলছি। বুলু আজ রাত্রে বাড়ি ফিরবে না, আমার সঙ্গেই থাকবে—হ্যাঁ, ও আমার এখানে এসেছে, না না, কোন কারণ নেই, এমনিই একটু ইচ্ছা হল, দুজনে একসঙ্গে খাওয়া-

দাওয়া করি, গল্পগুজব করি, হ্যাঁ ও, তাই নাকি, গুরুদেব বলছিলেন ওর কথা……।'

তার মানে, মা টেলিফোন ধরেছে, এবং এখনও গুরুদেবেই আছে। বুলুর নাম শুনেই, সমীরকে খবরটা না দিয়ে পারছে না। বুলু খাটের ওপর গিয়ে বসে পড়ল, এবং এখানে থাকাটা কী রকম হবে, তাই ভাবতে লাগল। অবিশ্যি, এ চেহারা নিয়ে অন্তত আর কোথাও কোন চিহ্ন না থাকলেও, ভুরুর কাছে ফুলে ওঠা মুখটা নিয়ে বাড়িতে গেলে, অকারণ অনেক কথা এসে পড়বে। রুণুও এসে খাটের এক পাশে বসল, বুলুর দিকে তাকিয়ে একটু যেন হাসবার চেষ্টা করল, বলল, 'আপনি শুয়ে পড়ুন না ইচ্ছে হলে।'

বুলুর মনে হল, রুণু বেশ সহজ। ভদ্রতাবোধই হোক বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হোক রুণুকে মোটামুটি খোলামেলা বলে মনে হচ্ছে, যদি বা জিন খাবার ব্যাপারে রুণুর আর সমীরের কথাবার্তার সময় রুণুর ভাবভঙ্গি কেমন যেন ভাল লাগছিল না, ন্যাকামি ন্যাকামি মনে হচ্ছিল, বিশেষ করে, সমীরের কথায় আরও বেশি করে সেটা মনে হচ্ছিল। বুলু যেন একটু লজ্জাই পেল, বলল, 'না, এখন শোব না।'

রুণু বুলুর চোখের দিকে তাকাল। রুণুর তাকানোটা যেন কেমন চকচকে চোখে, একটু বাঁকিয়ে তাকানো, এবং একটু লজ্জা লজ্জা ভাব, চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে একটু পা দোলানো। বুলুকে দেখে হঠাৎ রুণু এরকম করছে কেন, এ তো যেন কেমন একটা ভাব লাগার ভাব, যাকে বলে—যাকে বলে, প্রেম। জঘন্য, ভাবাই যায় না, বুলু কী করে এরকম ভাবতে পারল, সমীরের বন্ধু রুণু, একটু আগেই যার সঙ্গে প্রথম চেনা সে হঠাৎ প্রেমে পড়বে। কিন্তু রুণুর এখানকার ভাবভঙ্গি, এইরকম তাকানো, ভুরু টান টান হয়ে ওঠা, ঠোঁটের কোণে হাঁসি, এসব কি, মাত্র পনের কুড়ি মিনিটের প্রথম আলাপে হতে পারে। অথবা, বুলু জীবনের এসব ব্যাপারগুলো পাঁচ বছরে একেবারে ভুলে গিয়েছে, কেন না, পুরনো দিনের ব্যাপারগুলো কী ভাবে শুরু হত ও মনে করতে পারছে না।

সমীর তখন টেলিফোনে ওর নীলি সঙ্গে কথা বলছে। বেয়ারা দরজায় নক করে কাৎ হয়ে ঢুকল, কারণ তার হাতে একটা বড় ট্রে। সমীর টেলিফোনে কথা বলতে বলতেই বেয়ারাকে আঙুল দিয়ে বড় টেবিলটা দেখিয়ে দিল, এবং একই সময়ে যথেষ্ট ভরসা দেবার স্বরে বলতে লাগল 'না না, দুশ্চিন্তার কিছু নেই, তুমি তো আগেই জানতে, ওকে আমি এখানে আসতে বলেছিলাম, তাই চলে এসেছে।' বুলু আবার বেয়ারার দিক থেকে চোখ ফেরাতেই, রুণুর সঙ্গে চোখ-চোখি হল। রুণু ওকেই যেন দেখছিল, এবং, আহা, কেমন যেন লাজিয়ে গেল রুণু, চোখ নামিয়ে নিল, বুলু ভুরু কুঁচকে মনে মনে বলে উঠল, 'এর মানে কী। মেয়েটা কে, পাগল না বেশ্যা।'

পরমুহূর্তেই নিজেকে ধমকে উঠল বুলু, সমীরের বন্ধু সম্পর্কে এ-রকম ভাবনা ঠিক হচ্ছে না, যদি বা ও ইচ্ছা করে ভাবছে না, রুণুর ভাবভঙ্গি দেখে ভাবনাটা এসে পড়ছে। এরকম ভাবভঙ্গির অন্য কোন মানে করতে শেখেনি বুলু অথচ তা হতেই পারে না, যদি বা, রুণু সমীরের কী রকম বন্ধু, এখনও ও কিছুই জানে না, সমীর যেরকম সহজভাবে রুণুকে জিন খাওয়ার কথা বলল, নীলিমাকেও—ওর নীলিকেও বোধহয় এই ভাবেই বলে। নীলিমা কি তাহলে আজকাল জিন-টিন খায়। বুলু জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি স্টুডেন্ট।'

রুণু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে, হেসে বলল, 'আমি? না না, ও সব পাট আমার অনেকদিন চুকেছে।' এই একটি মাত্র জিজ্ঞাসাই বুলুর মনে এসেছিল। তারপরে আর কোন কথা এল না, ওর চোখের সামনে, মোমদের পাড়ার ঘটনাগুলো আবার মনে পড়ল, এবং একটু আগেই, সমস্ত আরামবোধের মধ্যেও গায়ে যে বেশ ব্যথা হয়েছে, সেটা অনুভব করল। সমীর রিসিভার রেখে দিয়ে ডাকল, 'আয় বুলু, এখানে বসি। এস রুণু।'

বেয়ারা ট্রে খালি করে, টেবিলের ওপর তিনটে গেলাস তিন বোতল সোডা, আর একটা লাইমের বোতল নিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে-

ছিল। সমীর টেবিলের কাছে গিয়ে, সব দেখে, বুলুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কী খাবি বুলু। কিছু ড্রাই খাবার খা, কাবাব রুটি বা ওইরকম কিছু।'

বুলু বলল, 'এখনও আমার খিদে পায়নি।'

'এখন না, পরেই খাবি, বেয়ারাকে অর্ডারটা দিয়ে রাখি।'

'যা হয় তুই বলে দে।'

'ঠিক আছে। রুণু, তুমি কী খাবে?'

'যা হয় আপনিই বলে দিন। তবে, আমার খুব শুকনো খেতে ভাল লাগে না।'

সমীর ঠোঁট টিপে হাসল, বলল, 'মেয়ে তো, শুকনো হলে তাদের চলে না।'

কথাটার মধ্যে, কোন ইঙ্গিত আছে কী না, বুলু বুঝতে পারল না। বোধহয় আছে, কেন না, রুণু জবাব দিল, 'ছেলেদের বুঝি শুকনোতে চলে।'

সমীর ততক্ষণে বেয়ারার দিকে ফিরে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, 'ক্যায়া ক্যায়া লায়া আভি?'

বেয়ারা আঙুল দিয়ে, প্রত্যেকটি গেলাস দেখিয়ে বলল, 'সব বড়া পেগ, ইয়ে হ্যায় আপকা হুইস্কি, ইয়ে হ্যায়, এ সাব্‌কা ব্র্যাণ্ডি, ইয়ে হ্যায় মেমসাবকা জিন। লাইম দে সঙ্গে?'

'দো।'

বেয়ারা লাইমের বোতলের মুখ খুলে, জিনের গেলাসে খানিকটা ঢেলে দিল। সমীর বলল, 'এক চিকেন দো পেঁয়াজা, এক চিকেন কারি, এক প্লেট সামী কাবাব, রোটি, একঘণ্টা বাদ লে আয়েগা।'

'জী।'

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেল। ওরা তিনজনেই বসল, বুলুর কাছের সোফাতেই রুণু বসল, সমীরই বরং একটু দূরে বসল। সমীর বলল, 'বুলু, আমি তোর জন্যে আর একটা পেগ ব্র্যাণ্ডি দিতে বললাম, তাতে তোর ভালই লাগবে। ঘুমটা ভাল হবে। চিয়ার্স।'

সমীর হুইস্কির গেলাস তুলে নিল। রুণুও ওর গেলাস তুলে, উচ্চারণ করল, 'চিয়ার্স।' বুলুর দিকে ফিরে, ঘাড়, কাৎ করে।

কেমন একটা ভঙ্গি করে, চোখ ঝকঝকিয়ে বলল, 'নিন।'

বুলু ব্র্যাণ্ডির গেলাস তুলে নিলু, কিন্তু 'চিয়ার্স' উচ্চারণ করল না, এবং ভাবতে লাগল, এরকম পর পর, ব্র্যাণ্ডি খাওয়াটা ওর ঠিক হচ্ছে কী না। ঠিক বেঠিক মানে, ও খেতে পারবে কী না আসলে, সামলাতে পারবে কী না, কারণ, কিছু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে, বমি করা বা মাতাল হয়ে যাওয়াটা ওর মোটেই ইচ্ছা না। আগের ব্র্যাণ্ডির একটা ক্রিয়া ওর ভিতরে চলেছে, সেটা ও বুঝতে পারছে। মাথাটা যেন সামান্য একটু ভার, চোখের পাতাও, এবং ঠোঁট হাত পা বেশ একটু গরম গরম। অথচ একটা আমেজের ভাবও আছে যদি বা, শরীরের নানান জায়গায়, ব্যথার দরুন সমস্ত অনুভূতিগুলোই, মস্তিষ্কের একটা জায়গা যেন দলা পাকিয়ে রয়েছে। ও আস্তে আস্তে ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিতে লাগল। রুণু এক চুমুকে বেশ খানিকটা গিলে ফেলল। এবং বুলুর যেন মনে হল. রুণু গেলাসে চুমুক দেবার সময়ে, সমীরের দিকে কেমন করে যেন একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। বুলুর আরও মনে হল সমীর যেন ভুরু কাঁপিয়ে, চোখের পাতা নাচিয়ে কী একটা ইশারা করল রুণুকে। বুলু বুঝতে পারছে না, রুণু সমীরের বন্ধুত্বটা কোন স্তরের, ওদের সম্পর্ক কেমন। রুণুর হঠাৎ চলে আসার রহস্যটা এখনও বুলু বুঝতে পারছে না। সমীরকে এ বিষয়ে কি জিজ্ঞাসা করা, বুলুর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু রুণুর আসা, ড্রিঙ্ক করতে বসে যাওয়া, সব ব্যাপারটাই যেন, কেমন অদ্ভুত। বুলু চান করতে ঢুকল আর রুণুও এসে পড়ল।

সমীর বলল, 'জানিস বুলু, আমি ভেবে দেখলাম এভাবে অন্তু-দাদের বাড়ি তোর যাওয়া ঠিক হয়নি।'

বুলু কোন জবাব দিল না। সমীর আবার বলল, 'আমি অবিশ্যি বুঝতে পারছি তুই কেন গিয়েছিলি।'

কথাটা শেষ না করেই, ও গেলাস রেখে, সিগারেট ধরাল, কেশে

বলল, 'খুবই স্বাভাবিক, মানুষ মাত্রেরই এরকম হতে পারে, এতদিন বাদে, একটু কিছু না হলে, কী করে চলে। একদিন দুদিন তো না, পাঁচ বছর, ইম্পসিবল, ভাবাই যায় না।'

সমীর কী ভেবে কথাগুলো বলছে, বুলু কিছুই বুঝতে পারছে না, ও কেবল শুনেই যাচ্ছে। সমীর আবার বলল, 'তুই আমাকে বললি না কেন।'

'কী বলব।'

'এই অন্তুদাদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করেছিল।'

'যখন ইচ্ছে, করছিল, তখন আর বলবার সময় ছিল না।'

'অনসূয়াকে অবিশ্যি আজকাল আর বাইরে বিশেষ দেখা যায় না। আমি তো অনেককাল দেখিনি, এর তার মুখে শুনতে পাই কখনও কখনও কেউ হয়ত ট্যাক্সিতে চাপতে দেখেছে। হেঁটে তো আজকাল নাকি একেবারেই চলাফেরা করে না।'

বুলু সমীরের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনতে লাগল। সমীর বলল, 'তবে যারা দেখেছে, তারা অনসূয়ার মুখ দেখে নাকি কিছুই বুঝতে পারেনি। তবে নীলির মুখে আমি শুনেছি, অনসূয়ার মুখটা এখন অন্যরকম দেখায়।'

বুলুর বুকের মধ্যে যেন কাঁপতে লাগল। সমীরের কথা ওর শুনতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু বারণ করতেও পারছে না। সমীরের একটু নেশার ঝোঁকও এসেছে, এর আগে কতটা খেয়েছে কে জানে। এখন যেন ওর একটু বকবক করার ঝোঁক এসেছে। বলল, 'মুখে কোন দাগ-টাগ নেই, তবে হঠাৎ দেখলে নাকি মনে হয়, এই অনসূয়া, সেই অনসূয়া নয়, অন্য কোন মেয়ে অন্য একটা মুখ।'

রুণু জিজ্ঞেস করল, 'অনসূয়া কে?'

সমীর বলল, 'তুমি চিনবে না।'

বুলু বলল, 'এসব কথা এখন থাক।'

সমীর বলল, 'হ্যাঁ, এসব কথা থাক। আমি এইজন্য বলেছি যে, আমি যদি আগে জানতে পারতাম, তবে অনসূয়ার সঙ্গে একটা

যোগাযোগ করে কথা বলতে পারতাম। যদি অনসূয়া তোর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয় বা কথাবার্তা বলতে চায়, অবিশ্যি, তা বোধ হয় আর কোনদিন হবে না।'

বুলুর বুকের মধ্যে কেমন করছে। ক্লান্তি এমনিতেই ওর রক্তের মধ্যে কেমন একটা আবেগের সৃষ্টি করেছে, সেই সঙ্গে, সমীরের এসব কথা, মনটা যেন থরথর করছে।

সমীর বলেই চলেছে, 'যদি না-ই আসে অনসূয়া, কথা নাই বলে আমি ধরেই নিচ্ছি, আসবে না, কথা বলবে না, তাতেই বা কী। অবিশ্যি, আমি তোর কষ্টটা বুঝি। এতদিন পরে, একটু—খুবই স্বাভাবিক।'

সমীর কথাটা কেমন করে শেষ করল, এবং সমীর কেন এ কথাগুলো বলছে, বুলু কিছুই বুঝতে পারছে না। 'এতদিন পরে, একটা খুবই স্বাভাবিক, 'এ কথার মানে কী, কী ভেবে এসব বলেছে সমীর। বুলু দেখল, রুণুর হাঁটু আর পা ওর এত কাছে, রুণু মাঝে মাঝেই পা দুলিয়ে ওর হাঁটুর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি করছে, তারপরে যখন হঠাৎ পায়ে পা লেগে গেল, বুলু তাড়াতাড়ি 'সরি' বলে, কপালে হাত ঠেকাল, আর রুণু অবাক হয়ে হেসে উঠল, 'ওমা, নমস্কার করবার কী আছে।'

বলেই, রুণু বুলুর হাঁটুর ওপরে, ওর একটা হাত রাখল। বড় বড় নখে রঙ মাখা, দেখলেই মনে হয়, আঙুলগুলো একটু মোটা হলেও, রুণুর হাত নরম। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে, রুণু এতটা সহজ হয়ে উঠেছে কেমন করে। জিনটা প্রায় শেষ করে এনেছে, তবু এক পেগ জিন খেয়ে, ঘণ্টাখানেকের আলাপী পুরুষের হাঁটুতে হাত রাখা যায় নাকি। শুধু হাতটাই রাখল না, বলল, 'এত ফর্মাল হবার কী আছে, না হয় পায়ে পা একটু ঠেকলই।'

সমীর বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই মাস্টার অব্ ড্রিঙ্ক টেবল।'

রুণু বুলুর হাঁটুতে, হাতের একটু চাপ দিয়ে বলল, 'একজাক্টলি। আপনি এরকম চুপচাপ রয়েছেন কেন, কথা-টথা বলুন।'

বুলু বলল, 'কী বলব।'

রুণু হেসে উঠল, চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'আপনার যা ইচ্ছে।'

কিছুই বুঝতে পারল না বুলু। রুণু হঠাৎ এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে কেমন করে, সমীর এ ব্যাপারে কী ভাবছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। সমীর উঠে গিয়ে, কলিংবেল টিপল। বেয়ারাটা বোধহয় কাছেই বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, ছুটে এল। সমীর বলল, 'বুলু, আর একটু ব্র্যাণ্ডি?'

বুলু মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'না, না।'

সমীর বেয়ারাকে বলল, 'এক লাইম জিন।'

রুণু এরকম করে হাসছে কেন, ওর চোখে যেন কিসের ইশারা। অনেকক্ষণ থেকেই বুলুকে যেন কিছু বলতে চাইছে, এবং এরকম ভাবভঙ্গি করে, একটা কথাই তো মেয়েরা বলে। কিন্তু বুলুর মধ্যে কী দেখতে পেল রুণু। এত তাড়াতাড়ি, এর মধ্যেই কী দেখতে পেল। রুণুর এইরকম আচরণে, গায়ে হাত দেওয়া, হাসি, চোখে একটা অজানা ইশারা, এসব কিছুই বুলুর মনে যে কোন ক্রিয়া করছে না, তা না। যাকে ব'ল ভাল লাগা, সেইরকম একটা কিছু হচ্ছে, অথচ একটা রাগ আর বিরূপ ওর ভিতরটাকে জ্বালাচ্ছে। রুণু যেভাবে শরীরটা দোলাচ্ছে, সে কারণে ওর বুক নাচছে এমনকি নাভির কাছটাও যেন কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে, এসব দেখে এখন যেন মনে হচ্ছে, রুণুকে পিষতে পারলে হয়। অথচ, সেটা একটা খুব সুখ আর আনন্দের সঙ্গে মনে হচ্ছে না। রুণুর রঙ লাগানো ঠোঁট, যে-ঠোঁট থেকে থেকে কখনও ফুলে উঠছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে, টিপে হাসছে, সেই ঠোঁট দুটো, নখ বসিয়ে চিমটি কেটে দিতে ইচ্ছে করছে। কেন এরকম মনে হচ্ছে, বুলু বুঝতে পারছে না, যেন রক্তের মধ্যে একটা সুখের ইচ্ছায়, এরকম এক যুবতী মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছা করে, সেরকম ইচ্ছা করছে না। রক্তের মধ্যে সুখটা যেন একটা রাগ হয়ে আছে, ক্রুদ্ধ যাকে বলা যায়।

বেয়ারা এসে খাবার এবং রুণুর জিন দিয়ে গেল। সমীর বলল 'খেয়ে নে বুলু।'

রুণুর গেলাসে, বেয়ারা লাইম ঢেলে দিয়ে চলে গেল। রুণু নিজেই সোডা মিশিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্লেটে করে, বুলুর খাবার সামনে বাড়িয়ে দিল, বলল, 'খান।'

বুলু সমীরকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই খাবি না?'

'না, আমি বাড়ি গিয়ে খাব। তোরা খা।'

রুণু হঠাৎ কাঁটা চামচেতে এক টুকরো সামী কাবাব, বুলুর মুখের কাছে তুলে ধরল, বলল, 'নিন।'

বুলু রুণুর দিকে তাকাল, সেই একইভাব রুণুর, এখন যেন ও কোমরটাকে কেমন একরকম মোচড় দিয়ে রেখেছে। বুলুর ইচ্ছা করল, একটা লাথি মেরে রুণুর কোমরটাকে সোজা করে দেবে। দিয়ে, ওর কোমরে, পাছায় কাঁটা চামচটা দিয়ে খোঁচাবে। কেন এরকম ইচ্ছা হচ্ছে, ও বুঝতে পারছে না, এবং সেটা সম্ভবও না, যদি বা, এইরকম করার মধ্যে, বুলু যেন একটা ক্রুদ্ধ সুখের অনুভূতিকে অনুমান করতে পারছে। ও কাঁটা চামচটা রুণুর হাত থেকে নিয়ে কাবার মুখে দিল। আর সমীর বলল, 'তোরা তা হলে রাত্রিটা এখানেই থাক আমি যাই।'

বুলু বলে উঠল, 'তোরা মানে?'

'তোরা মানে, তুই আর রুণু। রুণু কি আর এত রাত্রে বাড়ি ফিরবে?'

'না, আমি এখানেই থেকে যাব।'

'বুলু এই প্রথম বুঝল, রুণু নিশ্চয়ই বেশ্যা, বা বেশ্যার মত মেয়ে, যারা এইভাবে জীবনযাপন করে।

॥ ১৩ ॥

এই কথা মনে হতেই, বুলুর ভিতরটা, কেমন এক ধরনের জ্বালায় জ্বলতে লাগল, যে জ্বালার সঙ্গে, ঠোঁট বেঁকে যাওয়া একটা হাসি,

অনেকটা শয়তানের হাসির মত, কুৎসিত হাসি ঝকঝকিয়ে উঠল, যদি বা ওর চোখে মুখে, তার কোন ছাপ-ই ফুটল না। ও ক্ষণুর মুখের দিকে, খুব তাড়তাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে সমীরের দিকে তাকাল। সমীর ওর দিকে যেন ঠিক তাকাতে চাইছে না, বুলু দুজনের মধ্যেই, খুব তাড়াতাড়ি একবার চোখোচোখি হয়ে গেল। সমীরের চাউনির ভাবটা, অনেকটা যেন লজ্জা পাওয়ার মত, এবং যেন ক্ষমা চাইছে, এই রকম, তথাপি, অনেকটা হুইস্কি খেয়েই বোধহয় সমীরের মুখটা এখন কী রকম ভাঙা দেখাচ্ছে, মুখের রেখাগুলো যেন এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল, এখন ফুটে বেরিয়েছে, যে কারণে সমীরের হাসিটাও যেন অনেকটা শয়তানের মত দেখাল। সমীর যাবার জন্য প্রস্তুত, তার আগে একবার ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল, চিরুনিটা তুলে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, 'বুলু, শী ইজ এ পার্টি গার্ল-অ্যাজ আই হার্ড, অ্যাণ্ড শী ওয়াজ রেকমেনডেড সো···।'

বুলু তাকিয়েই ছিল সমীরের দিকে, আর ভারছিল, সমীর নিশ্চয়ই কোনদিন আমেরিকায় যায়নি, কিন্তু পার্টি গার্ল বলতে শিখছে, ওর গলায় যেটা একটা লোচ্চা মাতালের মত শোনাচ্ছে। সমীর বুলুর দিকে তাকাল। বলল, জাস্ট-জাস্ট-এ কম্পানি, একেবারে একলা···'

বুলুর ভিতরটা জ্বলছে, সেই সঙ্গে ঠোঁট বাঁকানো হাসিটার পাশ দিয়ে, শক্ত আর নোংরা দাঁত যেন দেখা যাচ্ছে—বুলু দেখতে পাচ্ছে নিজের মধ্যে এবং সেই ক্রুদ্ধ সুখের আকাঙ্ক্ষায়, কোথায় যেন দপ্‌দপ্‌ করতে শুরু করেছে, যদি বা, এমন না সে, ওর হাত পা নিশপিশ করছে, একটা শরীরকে জাপটে ধরে পিষবে, বা এমনভাবে দাঁত শুলোচ্ছে'না, কিছু কামড়ে চিবিয়ে দেবে, কেবল ওর চোখের সামনে এখন রাস্তায় সেই মার খাওয়ার ছবিটাই ভাসছে. মারগুলো যেন নতুন করে ওর গায়ে পড়তে আরম্ভ করছে। বুলু সামী কাবাবের টুকরো কাঁটা চামচে গেঁথে মুখে তুলল, ঝাল আর ঝাঝ বেশ,

কিন্তু সমীরের দিক থেকে চোখ ফেরাল না, কারণ এখনও কতকগুলো কথা সমীরের কাছ থেকে শোনবার আশা করছে। আশা না, সমীর নিশ্চয় আরও কিছু বলবে।

ঠিক তা-ই সমীর আবার বলল, 'আমার ওপর রাগ করিস না, মানে, আমার মনে হয়, ব্যাপারটা তোর খারাপ লাগবে না। আমি তোর অবস্থা বুঝতে পারি, মানে এভাবে—যাকগে, বুঝতেই পারছিস, আমি ব্যাপারটাকে সহজভাবেই নিতে চাইছি, আমাকে কোনরকম ভুল বুঝিস্ না।'...

সমীর যেন কোন কথাই ঠিক শেষ করতে পারছে না, একটা টানা রেশ থেকে যাচ্ছে, এবং এই প্রথম বুলু বুঝতে পারল, সমীর কেন ও কথা তখন বলছিল, 'অনসূয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাবি, সে কথা আমাকে বলিস নি কেন।' বা 'অন্তুদাদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে হয়েছিল, সে কথা আমাকে বললেই পারতিস।' এবং তারপরেও, সেই কথাগুলো, 'অবিশ্যি, খুবই স্বাভাবিক, পাঁচটা বছর কম কথা নয়, খুব কষ্টের' কথাগুলোর মানে তখন পরিষ্কার বুঝতে পারে নি বুলু, ভাবছিল, সমীর এ কথা কেন বলছে। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে এই রুণু, কম্পানি, পার্টি গার্ল, এবং রুণুর এ ঘরে রাত্রে থাকার ব্যবস্থা, এসব থেকেই পরিষ্কার হয়ে উঠছে কেন ও কথা সমীর বলেছিল। বুলু যে মোমদের বাড়ি গিয়েছিল, সমীরের কাছে, তার একমাত্র কারণ বুলুর একটি মেয়ে দরকার, ঠিক সমীরের যে রকম দরকার নীলিমা ওর নীলিকে। পাঁচ বছর—না, প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর, বুলু কোন মেয়েকে পায়নি—পায়নি মানে, এতকাল ধরে কোন মেয়ের সঙ্গে শোয় নি—শোয়নি মানে ও আর নীলিমা যা করে, তা করেনি, যে কারণে, 'অবিশ্যি, খুবই স্বাভাবিক, পাঁচটা বছর কম কথা নয়, খুবই কষ্টের...' কথাগুলো একমাত্র এই কারণেই সমীরের মনে হয়েছিল, এবং বুলুর যখন এরকম ইচ্ছাই হয়েছিল যে, ওর একটি মেয়েকে দরকার, নিতান্ত শোবার জন্য, নিতান্ত শরীর দিয়ে, শরীরকে জড়ানো বেঁধানো বিদ্ধ হওয়া, তখন

মোমদের বাড়িতে যাবার আগে সমীরকে বলাই ওর উচিত ছিল, পাঁঠা।

মাত্র এই একটি জীবের নামই বুলুর মনে প্রথম উচ্চারিত হল, এবং মোমদের কাছে কি ও, সে জন্যই গিয়েছিল। মোম মোম পাঁঠা শুয়োরের বাচ্চা। উহ্ কী বিচ্ছিরি. মোম-না না, এখন আর মোমের কথা ভাবতে চায় না বুলু, সেই মারের ছবিই ওর চোখের সামনে ভাসছে, মনে হচ্ছে মারগুলো এখন ওর পিঠে নতুন করে পড়ছে। সমীর বলতে চেয়েছিল ওকে বললে, বুলুর এত হেনস্তা বা অপদস্থ বা মার খাবার দরকার ছিল না, একটা মেয়ের ব্যাপার তো, এই তো—এই তো সমীর রুণুকে এনে দিয়েছে কত সহছে, কত অল্প সময়ে, মাত্র বুলুর বাথরুমে ঢুকে যতক্ষণ স্নান করতে লেগেছে, তাঁর মধ্যেই একটা মেয়েকে যোগাড় করে এনে দিয়েছে, এর জন্য বুলুর এত কাণ্ড করা, বা অন্তুদাদের বাড়ি যাওয়া, (সমীরকে না বলে) ঠিক হয় নি, কুত্তার বাচ্ছা। কাবাবের পরে, রুটি আর মাংস খেতে লাগল বুলু, যদি বা ভিতরে ভিতরে কী রকম একটা ফাঁপর ফাঁপর ভাব লাগছে, যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তবু জোরে জোরে চিবিয়ে খেতে খেতে, বুলু, তেমনি সমীরের দিকে তাকিয়ে রইল। এখন ওর মনে হচ্ছে কী খাচ্ছে, তার ঠিক ভাল কোন স্বাদ বা গন্ধ যেন পাচ্ছে না, এবং পেটের কোথায় একটা ব্যথার ভাব, যদি বা সেই ক্রুদ্ধ সুখেব আকাঙ্ক্ষা ওর মধ্যে জেগে রয়েছে, অথচ হাত পা নিশপিশ করে উঠছে না, আর ভিতরের জ্বালার সঙ্গে বাঁকানো হাসিটা যেন ক্রমেই, আরও শয়তানিতে শেনে উঠছে।

সমীর চিরুনিটা রেখে দিয়ে বলল, 'উ নীডণ্ট্ ওরি, এভ্রি থিং ইজ অল রাইট। কোন ভয় নেই, তোকে কেউ এসে জ্বালাতন করবে না। কাল সকালবেলা, আমি তোকে একবার রিঙ্ করব, তুই ইচ্ছে করলে, কাল সারাদিনই এখানে থাকতে পারিস। ব্রেকফাস্ট তো নিশ্চয়ই করবি, বেড ব্রেকফাস্ট বিল অল রেডি পেইড, অ্যাণ্ড ফুড, অ্যাণ্ড ড্রিঙ্কস, অ্যাণ্ড—।'

সমীরের চোখ রুণুর ওপরে একবার পড়ল, বুলু তেমনি তাকিয়েই ছিল সমীরের দিকে, খাবার চিবোচ্ছিল, ব্র্যাণ্ডির নেশাতেই হোক বা যে কারণেই হোক, নিজেরই মনে হচ্ছিল, ওর মুখটা, কপালের রগ, গলার পেশী, সবই যেন ফুলে উঠছে। সমীর বলল, 'অল্ পেইড্, কোন কিছুর জন্য ভাবতে হবে না। আমি এখন চলি, আর রাত করব না।'

সমীর দরজার দিকে এগিয়ে গেল, শেষের কথাগুলোও বুলুর শোনবার দরকার ছিল, কারণ ওর কাছে একটিও টাকা পয়সা নেই, অবিশ্যি সমীর তা ভালভাবেই জানত, তথাপি, বুলুর মনে হয়েছিল, এর পরে হোটেলের লোকেরা ধরে পুলিসে দিতে চাইবে বা রুণু টাকার জন্য, ধরে টানাটানি করবে, কারণ বুলুর যে এটা কাজ, তা ও বুঝতে পেরেছে।

সমীর বেরিয়ে যাবার আগে, আবার বলল, 'তুমি রুণু, তুমি সকালবেলা চলে যেও।'

বুলু তখন আর সমীরকে দেখছে না, রুণুকে দেখছে। ও বুঝতে পারল, সমীর কথা বলেই চলে যায় নি, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, রুণুকে বোধহয় ইশারায় কিছু বলছে, কারণ রুণু তখন দরজার দিকে তাকিয়ে। রুণু চট করে একবার বুলুর মুখের দিকে দেখে, সায় জানবার ভঙ্গিতে, একটুখানি মাথা নাড়ল, এবং সমীরের গ[illegible]। শোনা গেল, 'হোপ উ এ স্নইট ··গুন্না। দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল।

রুণু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, বুলুকে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে আসি।'

রুণু উঠে দাঁড়াতে গেল, বুক থেকে আঁচলটা খসে পড়ল, এবং মাংসের ঝোল লাগা হাতটা কোনরকম বাঁচিয়ে, হাতের ডানায় শাড়ির আঁচলটা, মাটিতে পড়া থেকে ঠেকাল। ওর বুক যেন কেঁপে উঠল কোন কিছুতে ধাক্কা লাগলে, যেমন কেঁপে বা দুলে উঠে, তেমনি, বুলু ওর বুকের দিকে তাকাল। রুণু একটু হাসল বুলুর দিকে

চেয়ে, একটু লজ্জা লজ্জা অথচ যেন একটা অহঙ্কারের খুশিতে, ফুল ফুল আঁট জামা এবং সূচালো বোঁটা মেলে ধরে আছে, জিজ্ঞেস করল 'কী।'

বুলু সে কথার কোন জবাব দিল না, কারণ জবাব দেওয়ার মত কোন কথা ওর যেন জানা নেই, ও রুণুর মুখের দিকে তাকাল। রুণু ভুরু দুটো কেমন করে যেন নাচালো, টুক করে না, একটু যেন আস্তে আস্তে যেন কিছু একটা জিজ্ঞেস করছে, অথচ তার জবাব ওর জানা, এমনিভাবে, তারপরে চোখে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে, মাথাটা একটু পিছনে ঠেলে দিয়ে, ঠিনঠিন করে হেসে উঠল, যেন ছোট ঘণ্টার শব্দ বেজে উঠল। হাসতে হাসতেই, আবার মুখ সামনে এনে বলল, 'আপনার দাড়িতে মাংসের ঝোল লেগে গেছে, আর একটা পেঁয়াজের কুঁচো ঝুলছে

বলতে বলতে আবার তেমনি করেই হেসে উঠল। অথচ বুলুর মুখের কোন ভাবান্তর হল না, তবু ভিতরটা তেমনি জ্বলছে, মারের ছবি ভাসছে, এবং শয়তানের হাসিটা ঝকঝক করছে, যদি বা দাঁতগুলো যেন ময়লা আর জিভটা ছ্যাতলা পড়া, পেটের কোথায় যেন ব্যথা করছে। বুলু রুণুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে টেবিলের দিকে তাকাল, আর রুণুর মাংসের ঝোল মাখা ডান হাতটা, বুলুর ডান হাতটা মুঠো করে ধরল। টেবিলের ওপরেই লেবুর কুচো সহ হট ওয়াটার বওল ছিল, তার মধ্যে, বুলুর হাতটা রুণু ডুবিয়ে দিয়ে বলল, 'হাতটা ধোন।'

বুলুর মনে হল, ঠিক যেন কাদা মাখা দুটো ব্যাং এর মত ওদের দুজনের হাত দুটো। রুণুর হাত নরম না শক্ত, তাতে কিছুই বোঝা গেল না। রুণু বুলুর হাতটা ডুবিয়ে দিয়ে, দরজার ছিটকিনিটা বন্ধ করতে গেল। বুলু গরম জলে লেবুর কুচো সহ, হাতটা কচলাতে কচলাতে ভাবতে লাগল, রুণুর সঙ্গে সমীরের সম্পর্ক কী। এখন তো মোটামুটি বোঝাই যাচ্ছে রুণু বেশ্যা বা ওই জাতীয় কিছু, কারণ তা না হলে, এই অল্প সময়ের আলাপে, এ বয়সের একটা মেয়ে, হোটেলের

ঘরে, বুলুর মত আটাশ বছরের একজন পুরুষের সঙ্গে কখনও রাত্রিবাস করতে পারে না। রাত্রিবাস! কী সুন্দর কথা, কথাটা কী রকম অদ্ভুতভাবে বুলুর মনে এসে গেল, যেন অনেকটা মায়ের গুরুদেবের ভাষার মত, রাত্রিবাস। উহ্য অথচ অনুহ্য, সব মিলিয়ে, বাতিকগ্রস্ত সাহিত্য সমালোচকদের ভাষায়, বোধহয় কথাটা অপরূপ। রাত্রিবাস! কথাটা মনে হতেই, বুলুর ভিতরের সেই জ্বালাটা যেন আরও দপদপিয়ে উঠল, শয়তানের হাসিটা আরও বেঁকে উঠল, রাস্তার ওপর মায়ের ছবিটা শুধু চোখের সামনে ভাসতে লাগল না, চিৎকার চেঁচামেচি গালাগালগুলো যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। বুলু গরম জলের হাতটা, ওর দাড়িতে বোলাতে লাগল। আঙুল ঢুকিয়ে আঁচড়াতে লাগল, যাতে, মাংসের ঝোলের দাগ এবং পেঁয়াজের কুচি ঝরে যায়।

রুণু ছিটকিনিটা বন্ধ করে, নিঃশব্দে হাসতে হাসতে, বুলুর দিকে চেয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল, যেন এই যাওয়াটার মধ্যেও কোন ইশারা করে যাচ্ছে, বা ইঙ্গিত কিছু, এমনি একটা ভাব। বাথরুমের দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হল, ভিতর থেকে ছিটকিনিটা লাগল কি না বোঝা গেল না। বুলু ন্যাপকিনটা তুলে, হাত মুখ দাড়ি, ভাল করে মুছতে মুছতে ভাবল রুণু কি সমীরেরও পার্টি গার্ল। যেদিন নীলিমাকে-নীলিকে ওর ভাল লাগে না, বা ওর নীলির শরীর খারাপ হয় সেদিন কি এইসব রুণুরা, সমীরের কাছে আসে নীলির অভাব মেটায়। সমীর তো যেন কেমন সহজভাবে রুণুর সঙ্গে কথা বলছিল, যেন কতদিনের পুরনো পরিচয়, এমন কি বন্ধু বলেই যেন পরিচয় দিয়েছিল, সমীর। নীলিমার কি তা হলে কপাল পুড়েছে, কথাটা এভাবে মোটেই ভাবতে ইচ্ছা করল না বুলুর কারণ, এখন সমীরকে নীলিমা যতটা চেনে, বুলু বা আর কেউ-ই এতটা কখনও বুঝতে বা চিনতে পারবে না। আর রুণুর সঙ্গে যদি সমীরের সেরকম—অর্থাৎ একলা ঘরে নিয়ে শোয়ার সম্পর্ক থাকত, তবে কি বুলুর সামনে এত সহজে, রুণুকে হাজির করত। একটা ভয় কি থাকত না যে,

বুলু কথাটা নীলিমাকে বলে দিতে পারে তাতে ওদের এতদিনের সম্পর্ক চিড় খেতে পারে। কিন্তু তা যদি নাও হয়, এরকম মেয়ের সঙ্গে, সমীরের আলাপই বা থাকে কেন, আর এমন অনায়াস এবং সহজ যে কথাবার্তাতেই সেটা টের পাওয়া যায়। শুধু তাই না, এ ঘরে রাত্রে থাকার জন্য, রুণুর সঙ্গে যে সমীরের একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে, ওদের দুজনের কথায় ও ভাবে, সেটা একেবারেই স্পষ্ট।

বুলু সিগারেট ধরাল, ধোঁয়াটা, অনেকক্ষণ বুকের কাছে আটকে রেখে আস্তে আস্তে ছাড়ল, আর ওর চোখে যেন রক্ত ছুটে এল, এখন শয়তানের হাসিটা যেন ওর দাঁতে দাঁত চেপে বসছে, আর ক্রুদ্ধ সুখের আকাঙ্ক্ষাটা নখহীন থাবার মত আঁচড়াচ্ছে। ক্রুদ্ধ সুখের আকাঙ্ক্ষা। কথাটা আবার বুলুর মনে বিশেষ করে ঢেউ দিল, কথাটার অর্থ কী, ও বুঝতে পারছে, না, অথচ অনুভূতিটা যেন এই রকমই। কী রকম ব্যাপার এটা, সুখের জন্য হিংস্র আক্রমণ গোছের কিছু না কি।

রুণু বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। হাত মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছে নিয়েছে, লিপস্টিকের রঙ উঠে গিয়েছে, আঁচলটা তেমনি কনুইয়ের কাছে, কোমরটাকে, প্রায় একটা কসরতের ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এগিয়ে এল। আঁচলটা বোধহয় আর ওর বুকে তুলতে ইচ্ছা করছে না, ঘরের মাঝ বরাবর এসে বলল, 'কী ব্র্যাণ্ড টানা হচ্ছে?'

বুলু কথাটা ঠিক ধরতে পারল না, রুণুর দিকে তাকাল। রুণু ততক্ষণে নাভির কাছেই, শাড়ি সায়ার কষিটাকে একটু আলগা করার ভঙ্গিতে বলল, 'বাব্বা, বড্ড খাওয়া হয়ে গেছে। আমি খাটের ওপর বসছি। কী ব্র্যাণ্ডের সিগারেট খাওয়া হচ্ছে?'

রুণু খাটের ওপর বসতে গিয়েও, বুলুর কাছে এসেই দাঁড়াল, সিগারেটের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে, নাক কুঁচকে উঠল, অনেকটা দাঁতে ভেংচি কাটার মত করে, দাঁত দেখিয়ে শরীরটাকে সামনের

দিকে একটু ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল, 'ম্যাগ্‌গ, ইমপসিবল, এ আমি খেতে পারব না, একেবারে গাঁজা।'

বুলু সিগারেটের প্যাকেটটা বাঁ হাতে, একটু দূরে সরিয়ে রাখল। রুণুর চোখের দিকে তাকাল। রুণু ঘাড় কাৎ করে, ভুরু কুঁচকে, জিজ্ঞেস করল, 'রাগ হল ?'

বুলু ঘাড় নাড়ল, সিগারেটে টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। ওর কালো দাড়িতে ধোঁয়ার রেশ যেন লেগে রইল একটু, দু এক সেকেণ্ডেই পাখার বাতাসে উড়ে গেল। রুণু হঠাৎ হাত বাড়িয়ে, বুলুর গাঁজার মত সিগারেটটা, হাতে নিয়ে বলল, 'একটা টান দিই।'

বলে, ঠোঁট দুটো ছুঁচলো করে, আলতো করে, ঠোঁট ছুঁইয়ে, একটুখানি টান দিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে, বুলুর দিকে ফিরিয়ে দিল, 'না বাবা এ আমি পারব না এ একেবারে গাঁজা।'

মারের আঘাতগুলো যেন বুলুর বুকে পিঠে মাথায় এখন প্রচণ্ড জোরে পড়ছে। সিগারেটটা নিয়ে ও ওয়াটার বতলে ফেলে দিল। রুণু সেটা যেন লক্ষ্যই করল না, এমনি ভাবে, বুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে, জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পেঁদাপেঁদি করতে গেছলে বল তো ?'

রুণু বুলুকে তুমি করে বলছে। একটু আগেই, রুণুর কথা বলার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তেই ও তুমি করে বলবে এবার। দু পেগ জিন, এবং খাবার, ওকে যেন খানিকটা, যাকে বলে, ছলবলিয়ে তুলেছে। কিন্তু কথাটা রুণু ঠিক কী বলল, বুঝতে না পেরে, বুলু ওর মুখের দিকে তাকাল, উচ্চারণ করল, 'কী ?'

রুণু মুখ নামিয়ে নিয়ে এল, তার আগেই যেন, ওর ফুল ফুল জামায় ঢাকা বুক এগিয়ে এল, প্রায় বুলুর দাড়ি স্পর্শ করল, বলল, 'বলছি, কোথায় মারামারি করে এলে ?'

'মারামারি ?'

'তা নয় তো কী। ভুরুর পাশে, কপালে বেশ ফুলে আছে।

তোমাকে দেখেও বাপু গুণ্ডা গুণ্ডা লাগে। গুণ্ডাদের মত দাড়ি রেখেছ।'

বুলুর হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা, কী করে সমীর ভাবল, বুলুর একটা মেয়ের দরকার। তার মানে, সমীর ওর নিজের মধ্যেই ডুবেছিল, যেমন মা, নীলিমা, বাবা, টুলু, সুমিতা, মহেন্দ্রদা, সেই-রকমই, এবং এখন রুণু নামে এই মেয়েটাও। রুণুর এই কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে সমীর বুলুর বিশেষ কোন পরিচয়ই দেয়নি রুণুকে। দিলে, রুণু এ ধরনের কথা বলত না, এবং হয়ত রুণু ওর অভিজ্ঞতা ধারণা ইত্যাদি থেকেই, এরকম কথা বলছে।

রুণু আবার বলল, 'দেখো বাবা, আমার গুণ্ডামি-টুণ্ডামিকে বড্ড ভয় লাগে, একে হোটেলের ঘর, তারপরে কোথা থেকে পুলিস তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে হানা দেবে, আমাকে সুদ্ধ ধরে নিয়ে যাবে। কোথায় মারামারি করেছ বলত, কী নিয়ে?'

বুলুর গলাটা গম্ভীর শোনাল, বলল, 'আমি কাউকে মারিনি, আমাকেই মেরেছে।'

'কেন টাকাকড়ি নিয়ে কোনরকম হয়েছিল নাকি।'

'না।'

'তবে। মেয়ে নিয়ে?'

বুলু হঠাৎ বলল, 'হ্যাঁ।'

রুণু হেসে উঠল, বুলুর কাঁধে একটা হাত রাখল, বলল, 'তবে, তুমি একদম মার নি, তা আমি বিশ্বাস করিনে বাবু, তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়, তুমি ছাড়বার পাত্র নও।'

রুণু আরও ঝুঁকে পড়ায়, ওর বুকের গোল অনেকখানি দেখা গেল এবং এখন ওর দাড়িতে, রুণুর বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। রুণু এক হাত দিয়ে, বুলুর হাত টেনে ধরে বলল, 'এস খাটে এস কথা বলি, আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, আমার বোধহয় নেশা হয়ে গেছে।'

সংযোজন

অবশিষ্টাংশ দাহ — ১

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বুলু উঠল, ওর সঙ্গে খাটের ওপর এল। রুণু শুয়ে পড়ে হাত দুটো ছড়িয়ে দিল, বলল, 'কী কর তুমি। তোমার মত বন্ধু সমীরবাবুর আছে বলে কখনও শুনিনি।'

'কী রকম বন্ধু।'

'এই তোমার মত মারদাঙ্গা করনেওয়ালা, পকেট গড়ের মাঠ, ফতোবাবু।'

'তুমি কী কর।'

'আমি? আমি তো চাকরি করি।'

'কোথায়।'

এই কথা যখন বুলু বলল, তখন রুণুর ব্রেসিয়ার সহ জামাটা টেনে, সবটা একেবারে ফাঁসের মত কণ্ঠার কাছে তুলে দিল। রুণু তাড়াতাড়ি উঠতে চাইল, বলল, 'একি, একি অসভ্যতা, সব খুলে দিচ্ছ।'

কিন্তু রুণু উঠতে পারল না, বরং পা দাপিয়ে বলে উঠল, 'উহ্, ওকি, খামচে দিচ্ছ কেন আমার লাগছে।' বুলুর মনে হল, ও যেন শরীরে ঠিক শক্তি পাচ্ছে না, যা ও করতে চায়, অথচ ওর নিঃশ্বাস নিজের কাছেই এত গরম লাগছে, নিজেরই তাতে যে য হালকা লাগছে, এবং শয়তানের হাসিটা এখন ভীষণ কুটিল বিদ্রূপাত্মক আর ধারাল হয়ে উঠেছে যেন। বলল, 'তোমার শরীরটা বেশ নরম।'

'তা হলে এরকম জোরে খামচে দেবে।'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, বুলু জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় চাকরি কর বললে না।'

রুণু একটা অফিসের নাম করল, সাধা·ণ অফিস। বুলু জিজ্ঞেস করল, 'আর এখানে এলে কী করে?'

রুণুর মুখ শুধু গম্ভীর হয়ে ওঠে নি, একটু রাগের ভাবও ফুটে

উঠেছে। বুলুর একটা লম্বা সবল হাত, ওর বুকের ওপরে ছড়ানো আর নাভির কাছে, আর একটা হাত, বুলুর আঙুলগুলো ঠিক যেন কাঁকড়া বিছের মত সুড়সুড় করে বেড়াচ্ছে। যে কোন মুহূর্তেই হুল বিঁধিয়ে দেবার মত, নখ বিঁধিয়ে দিতে পারে।

রুণু বলল, 'এখানে তো প্রায়ই আসি।'

'কেন।'

'এখানে আমার বন্ধুরা আসে, আমরা এক সঙ্গে খাই দাই, গল্প করি।'

'সমীর তোমার বন্ধু।'

'বন্ধু তো বটেই। কেন?'—বলে রুণু বুলুর কাছাকাছি ঘনিয়ে এল। বুলু ঘামে ভেজা পাতলা একটা পাউডারের গন্ধ পাচ্ছিল। সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না—মোমের সেই—মা-আ-আ-আ—বলে কান্নায় ঢলে যাওয়া গলা। তার এইসব ভাবনার ভেতর আস্ত একজন মেয়েমানুষ হয়ে রক্ত মাংসের রুণু বারে বারে ঢুকে পড়ছিল।

'তোমায় কোথায় মেরেছে গো—'

'সে খবরে তোমার দরকার কি?'

'তুমিও মেরেছো নিশ্চয়!'

'মারতে পারতাম। মারিনি।'

'ও মা! সে কি কথা? চান্স পেয়েও মারোনি।'

বুলু কোন জবাব দিল না। এক বিঘতের ভেতর শুয়ে একজন মানুষ আরেকজন মেয়েমানুষকে কতটাই বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারে। রুণুর মাথায় জিন কাজ করছিল। সে তার ডান উরু সমেত পা-খানা তুলে দিল বুলুর পাশ ফেরা দাবনায়।

বুলু এক স্বচ্ছন্দ গা ঝাড়া দিয়ে পা নামিয়ে দিল। রুণু একটুও আহত হল না। বরং ডবল উৎসাহে সে তার সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বুলুর দখল নিতে এগোল। নিজের বুকের মুখোমুখি রুণুকে খুব স্তনাঢ্য লাগল বুলুর।

মোম ছিল বড় নরম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে শক্ত। রাস্তায়

বেরিয়ে নির্জনে আড়ালে আবডালে বড়জোর একটা ছুটো চুমো খাওয়া যেত। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। বুলুর উত্তেজিত চুমুতে ওর প্রতিদান ছিল—গাঢ়, ধীর, আলতো করে বুলুর ঠোঁটে ঠোঁট রেখেই তুলে নেওয়া।

রুণু বলল, 'চান্স পেয়েও মারোনি যখন—নিশ্চয় এর ভেতর মেয়ে মানুষ ছিল। ঠিক বলিনি?'

'ঠিক।'

'খুলে বলো না মাইবি। মেয়েটা কেমন? কি হয়েছিল?'

'বলার মত কিছু নয়।'

'তবু বল না মাইরি। আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছে করছে।'—বলে রুণু উঠে বসে তার নিজের পাছা বুলুর তলপেটের দিকে সঁধিয়ে দিল। যাতে কিনা গল্প বলতে বলতেও বুলু তৈবি হয়ে ওঠে।

ফল হল কিন্তু বিপরীত। সে এক ধাক্কায় রুণুকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বলল, 'এ কোন খিস্তিব গল্প নয়—যে, শুনে মজা পাবে?'

'বলোই না।'

খাট থেকে নামতে নামতে বুলু বলল, 'মেয়েটার মুখে অ্যাসিড মেরে ছিলাম।'

'উ বাবা!' বলে রুণুও সিধে হয়ে বসল। এ কার সঙ্গে সে রাত কাটাতে এসেছে। 'মারলে কেন?'

'পাবো না বলে।'

'একটা মেয়েকে পাবে না বলে! বাঃ! তারও তো ইচ্ছে অনিচ্ছে থাকতে পারে।'

'তাহলে গোড়ায় ঢলাঢলি করেছিল কেন? কেন?' বলতে বলতে বুলু তার মারের চোটে ফুলে ওঠা দাড়ি ঢাকা মুখখানা রুণুব একেবারে মুখের কাছে কাছে নিয়ে এল। এনেই বলল, 'আমি যাচ্ছি—'

কেউ ডেকে এনে তাকে এমন ফেলে যায়নি কোনদিন। বুলু যেন তাকে ধমকেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আলবামা হোটেলের পুরনো বাড়ির হাট করা দরজায় পাল্লা খিরথির করে কাঁপছিল। খাট থেকে নেমে রুণু আগে দরজা আটকাল। তারপর নিজেকে গুছিয়ে নিতে শুরু করল। সে এখানে একা রাত কাটাবে না। সেও এখুনি বেরিয়ে যাবে।

॥ ১৪ ॥

অন্ধকার রাতে ঘোরে পাওয়া মানুষের মতই বুলু রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সমীর যাওয়ার সময় কিছু টাকা চেয়ে রাখা উচিত ছিল তার। হাঁটছিল আর মাথার ভেতর ব্র্যাণ্ডির ঝোঁক এক এক দিকে ঝোঁক নিচ্ছিল। সন্ধ্যেবেলা আজই সে অন্ধকারে পাড়ার বিপ্লবীদের হাতে চোরের মার খেয়েছে। তার খানিক আগে খেয়েছে মোমের দাদা অন্তুর হাতে যথাসাধ্য পিটুনি।

গরম জলে স্নান, ব্র্যাণ্ডি, রুটি কাবাব, রুণু—এসব পার হয়ে এখন সে আবার রাস্তায়। দূরে দূরে দু'একটা ট্যাক্সি। যেখান থেকে চোর তাড়া খেয়ে বুলু একটা চলন্ত অ্যামবাসাডর টপকে ট্যাক্সিতে ঢুকে পড়েছিল সন্ধ্যেবেলা—সেই জায়গাটা এখন চিনতে পারল বুলু। এখন শুনশান। ফাঁকা। রাস্তায় কুকুর। আর একটু এগিয়ে ময়লা ফেলার আইল্যাণ্ডটা বাঁয়ে ফেলে ক'পা এগোলেই মোমদের বাড়ি।

এখন সারাটা বাড়ি, সারাটা পাড়ার অন্য সব বাড়ির মতই অন্ধকার। স্ট্রিট লাইটের কোন খামতি নেই। এ বাড়ির সামনে সে কতবার ট্যাক্সি করে এসে নেমেছে। মোমকে নিয়ে হ্যাণ্ডলুম এগজিবিশনে গেছে।

কিন্তু সেই যে মোমের দাদু মারা গেল। বুলু আর ট্যাক্সি থেকে নামতে পারছে না। কেন পারছে না—তা জানে না মোম। মোম

বুঝল—দাদুর মৃত্যুতে বুলুর কিছুই হয়নি। মোমের মামারাও অবাক।

তারপর থেকেই।

গোড়ায় গোড়ায় মোম দেখা করাই বন্ধ করে দিল। তারপর নানান উড়ো খবর আসতে লাগল বুলুর কানে। তখন সবে ভারত চীন যুদ্ধ হয়ে গেছে। তেনালিতে পার্টি ভাগ হয়ে গেল। গুলজারিলাল নন্দ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নেতাদের ঝাঁকে ঝাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পোরা হল।

তখনই অন্তুদার ছোট শালার সঙ্গে মোম ঘুরতে শুরু করেছে নাকি। এমনই খবর পেয়েছিল বুলু। পাড়ার ব্যাটারি মেরামতি দোকান থেকে অ্যাসিড যোগাড় করেছিল। করে দাঁড়িয়েছিল—ময়লা ফেলবার আইল্যাণ্ডটার বাঁকে। টিউটোরিয়ালে পড়ে মোম ওখান থেকেই ফেরে।

ঘটনাটা ঘটেছিল সন্ধ্যে সাতটার ভেতর। আর রাত ছটোর ভেতর থানার মেজবাবু তাকে গঙ্গার ঘাটে গাদাবোটের খোল থেকে পাকড়াও করে। ইচ্ছে করলে জলে লাফিয়ে পড়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারত বুলু। যায়নি।

অন্তুদাদের বাড়িটাই পুরনো কায়দায়। বাইরের দিকে সেকেলে রেনওয়াটার পাইপ। ওদের বাড়ির কোন্ ঘরটা কার—তাও মুখস্থ বুলুর। সে এখন প্রায় এই মাঝরাতে পাইপ বেয়ে বেয়ে পেছনের দিককার দোতলার জানলায় চলে এল। আমি মোমের সঙ্গে দেখা করবই। অ্যাসিড পড়ার পর ওর মুখ কি দাঁড়াল—তা আমার দেখা হয়নি।

পাইপ বেয়ে উঠে দোতলার খোলা বারান্দায় নামল বুলু। এ বারান্দায় বসে এক সময় বুলু মোমের হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে খেয়েছে। এখন রাত বারটা তো হবেই, একটা পোষা বেড়াল অবলীলায় এ বাড়ির বারান্দা থেকে পাশের বাড়ির কানিসে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

এটা মোমের ঘর। এ ঘরে মোম আর তার মা শোয়। বুলু কোন বোবা প্রাণীর মতই সেই বন্ধ দরজায় গিয়ে চাপা গলায় ডাকল, 'মোম। মোম—'

ডাকতে গিয়ে সে মেঝেতে বসে পড়ল। বসে মাথা—কান কপাটের জোড়ে চেপে ধরল। যদি কিছু শোনা যায়।

কতক্ষণ এভাবে বসে আছে ঠিক নেই। হঠাৎ খেয়াল হল বুলুর সে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার নিজেরই নাক শব্দ করে ডাকতে শুরু করেছিল। তাড়াহুড়োর ভঙ্গিতে সে উঠে দাঁড়াল। এখন ক'টা রাত বোঝার উপায় নেই।

রাস্তায় নেমে সে হাঁটতে শুরু করল। নিশুতি রাতে গঙ্গার ঘাটে এসে দেখল—সেটা নয়—অন্য আর এক সাইজের একটা গাদাবোট ঘাটে ভেড়ানো। সারা গায়ে আলো জ্বেলে একটা ছোট জাহাজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটের ঢালাই বেঞ্চে পাট পাট হয়ে শুয়ে পড়ল বুলু।

এবার তার ঘুম ভাঙালো নদীর শঙ্খচিল। সবে ভোর হচ্ছিল। নদীর ওপরের আকাশে কী করুণ ডাক। পাশ মুড়ে ঘাটের দিকে তাকাতেই বুলুর শিরদাঁড়ায় কে আলপিন বসালো।

মায়ের সেই গুরুদেব লোকটা জোয়ারের জলের ভেতর বুক, দাড়ি বের করে দাঁড়ানো। আর নির্মলা মাসি জলের ভেতর এগিয়ে যাওয়া পৈঠায় দাঁড়িয়ে। এক হাতে নিজের শাড়ি যতটা পারে তুলেছে। আর অন্য হাতে গদগদ ভাবে গুরুদেবের মাথায় ঘটির জল ঢালছে।

বুলুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সোয়াইন।

তখনও বুলু দেখেনি—আর কে কে দাঁড়িয়ে। এবার সে দেখতে পেল। মায়ের সঙ্গে মোম এসেছে। মোমের হাতে গুরুদেবের পায়ের নাগরা, শুকনো জামাকাপড়। মোমের মায়ের হাতে কমণ্ডলু।

বুলু অনেক চেষ্টায় ভোরের আলোয় মোমের এক গালের পাশটা

দেখতে পেল। তেল তেল মাজা রঙের গালে যেন জড়ুলের দাগ। অ্যাসিডের ফেলে যাওয়া চিহ্ন।

পাছে তাকে দেখতে পায়—বুলু উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। এখুনি গুরুদেব উঠবে নিশ্চয়। তখনই মোমকে দেখা যাবে। ওকে এভাবে ঘাটলায় পড়ে থাকতে দেখে নেহাত বাউণ্ডুলে ভাববে। বুলু যতটা পারে মুখ ঢেকে সামনের দিকে চোখ রাখল।

গুরুদেব লোকটার গা মুছে দিতে থাকল নির্মলা মাসি। মোম গিয়ে গেরুয়া লুঙি মত বাড়িয়ে ধরল। তার ভেতর ভিজে কাপড়ে গুরুদেব পা বাড়িয়ে ঢুকল। ভিজে কাপড়ও নিয়ে গেল নির্মলা মাসি। ভোরবেলার বাতাসে সবার দিকে তাকিয়ে নির্মল হাসি হাসল গুরুদেব। মোম নিচু হয়ে পায়ের কাছে নাগরা এগিয়ে দিল। মোমের মা এগিয়ে দিতে কমণ্ডলুটা হাতে নিল গুরুদেব।

বুলু একদম মাথা নামিয়ে নিল। সে এবারে মোমের মুখখানা পুরো দেখতে পেয়েছে। বাঁ গাল একটু বেশি ফুলে ওঠা। সারা মুখে যেন কে গোবর লেপে দিয়েছে—এমনি অন্ধকার। বাঁ কানের ওপর দিয়ে খোলা চুল মেলে দিয়েছে মোম। ওখানটা হয়ত পার্মানেণ্টলি শুবো হয়ে আছে। তবু মোমের চোখে কত মায়া। এমনই করে ফাঁকা তাকানো। যেন বা এই যেমন নদীর বুকখানা।

রাতচরা পাখি যেভাবে বাসায় ফেরে—ঠিক সেইভাবেই বাড়ি ফিরে নিঃশব্দে বিছানায় চলে গেল বুলু। তার মাঝ ঘুমে নীলি একবার খেতে ডেকেছিল। ওঠেনি বুলু। উঠল যখন—তখন ভাঙা বেলা। কানা উঁচু থালায় জল ঢালা ভাত খেল বুলু। তারপর কল ছেড়ে চান করে এসে মাথা আর দাড়ি আঁচড়াতে লাগল।

আজ যাবি আমার সঙ্গে আশ্রমে? গুরুদেবের জন্মদিন।

মাকে এত উন্মনা কোনদিন দেখেনি বুলু। মুখে বলল, টুলুকে নিয়ে যাও।

তুই গেলে পারতিস। তোর কথা গুরুদেব আপনা থেকে বলেন।

বুলু কোন জবাব দিল না। সন্ধ্যে সন্ধ্যে টুলু ঘ্যানঘ্যান করতে করতে মাকে নিয়ে আশ্রম রওনা হল।

জায়গাটা বুলুর চেনা। সে কী এক অমোঘ টানে একা একা সেদিকেই চলল। পাঠবাড়ি, মিলন সঙ্ঘ, কাঁচঘর—এই সব ছাড়িয়ে গঙ্গার গায়েই গুরুদেবের আশ্রম। জায়গাগুলো সবই চেনা বুলুর। ভোটার লিস্ট চেক করতে এক সময় সে পার্টির হয়ে এসব পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে। নারী ক'জন? পুরুষ ক'জন? যাচাই করেছে।

আশ্রমবাড়ির গেটে আজ দেবদারুপাতার শিকলি। লাল কাগজ মোড়া ড্রুম। সন্ধ্যে রাতেও কাক উড়ছে। মানে খিচুড়ি ভোগের ব্যবস্থা হয়েছে। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই। সোয়াইন।

আর যা তা মনে এল বুলুর। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। ছেলে বুড়ো গুঁড়োর চেয়ে আধবয়সী মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। তাদের ভেতর একসময় কড়া ইলেকট্রিক আলোয় মোমকেও সে দেখতে পেল।

মোম ওখানে কি করছে? নিশ্চয় ওর মা ওকে নিয়ে গেছে—অ্যাসিডে মুখপোড়া মেয়ের শেষ পর্যন্ত কী গতি হবে—তাই জানতে।

এই ভিড়ের ভেতর টুলুর মাথাটাও দেখতে পেল বুলু। তেরিয়া হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি। সবই যেন মেপে দেখতে চাইছে। বাম হঠকারিতার কচি মূর্তিটি যেন আশ্রমের হাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! তাই মনে হল বুলুর।

এরপর বুলুর আশ্চর্য হওয়ার ছিল। মোমকে দেখে টুলু দিব্যি হেসে এগিয়ে গেল। শুধু গেল না। গিয়ে টুলু মোমের হাতখানা ধরল। তারপরেই একটা ভিড় বুলুর চোখের সামনে থেকে ওদের গুলিয়ে দিল।

এখানে অন্ধকার। গেরস্থ বাড়ির রোয়াক। লাইটপোস্টের আলোয় বিশেষ কিছু দেখা যায় না। আবছায়ার ভেতর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বুলু গজরাতে লাগল। ঠিক এই জন্যে! ঠিক এই জন্যেই !! এই জন্যেই মোম !!!

তখন টুলু আর মোম আশ্রমের কলাগাছ-দেবদারুর সাজসজ্জা পেরিয়ে পাঠবাড়ির দিককার গঙ্গার নাবিতে এগিয়ে গেল। এখানে নদী বাঁধানো। আশ্রম পাশেই। একটা রাস্তা টপকালেই লোকালয়।

মোম বলল, আমার লজ্জা করে।

এতে লজ্জা কিসের—? এসো।

টুলুর দু'হাতের ভেতর সাঁড়াশি চাপে পড়ে মোম অন্ধকারে হেসে দিল। তারপর বলল, তোমার দাদা ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ত।

দাদার কথা এখন বলবে না।—বলেও টুলু বুঝল, অ্যাসিডে মুখ পুড়ে খাওয়ায় অনেকদিন ঘরবন্দী থাকার পর মোম আর স্বাভাবিক নেই। কখনও হেসে ওঠে কখনও কেঁদে ফেলে। কখনও আগ বাড়িয়ে আসে। যতটা আসার কথা নয়—তার চেয়ে বেশি।

মোমের মুখে মেটুলির গন্ধ। টুলু হাবড়ে চুমু খেতে গিয়ে মোমের বিস্ফারিত হাসিতে—দাঁতে বাধা পেল। তখন মোম বলছে—কাল মেজদা বুলুকে খুব মারল—

মাথা তুলে নিল টুলু। কাল? কখন?

তা ঠিক আমার মনে নেই।

টুলু মনে মনে বলল, এ তো সত্যি পাগল।

এই পাগলের সঙ্গে টুলুর এই আশ্রমেই দেখা সাক্ষাৎ। মাকে আশ্রমে দিয়ে আসতে এসে। নিয়ে আসতে যেতে।

খুব মেরেছে?

খুব। আমি মা বলে চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম। তবে না মেজদা থামে। সে দেখা যায় না টুলু—তোমার দাদা না—

চুপ কর। —বলেও টুলু বুঝল, কার ওপর রাগ করা? এ তো ভালও বোঝে না। মন্দও বোঝে না।

মনে মনে একটা অঙ্ক কষল টুলু। কাল রাতে দাদা বাড়ি ফেরেনি। দিদি বলছিল সমীরদার ওখানে। তার সামনে অন্ধকারে এখন নদীর জল। পাড় ঘেঁষে পাঁচিলের এপারে আশ্রমের ফুলবাগান। মোম একা দাঁড়ানো। মোম তার চেয়ে বড়ই হবে। কেমন আলুনি হয়ে যায় মেয়েটা এক এক সময়।

গুরুদেব তখন মাইক্রোফোনে কী সব বলছিল। ফুল, মধু, চন্দনের ছড়াছড়ি। একটা অ্যাকশনে লোকটার পেটটা ফাঁসিয়ে দেওয়া যেত। ঠিক নেতা নয়—অথচ সমাজের একটা মাঝামাঝি জায়গায় লাগাম ধরে বসে আছে। এদেরই বি-হেডেড্ করা দরকার আগে।

মোম কি কাঁদছে? না, নদীর অন্ধকার জলের দিকে তাকিয়ে পাগলের আনন্দে হাসছে? কিছুই বোঝা যায় না অনসূয়ার। আগে হয়ত স্বাভাবিক ছিল। দাদাটাই শোধনবাদী। পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ক্ষোভ থেকে একটা মেয়ের মুখশ্রী অ্যাসিড দিয়ে পাল-টাতে গিয়েছিল। শ্রী নামক জিনিসটির বীজে আঘাত করতে চেয়ে-ছিল। অথচ মোম এখনই যেন নতুন এক রকমের শ্রী পেয়ে বসে আছে। যার কোন তল পায় না টুলু।

এবারে টুলু সরাসরি অনসূয়াকে জাপটে ধরল। অনসূযাও তাই করল। ঠোঁটে-দাঁতে সে টুলুকে কুচি কুচি করে কাটতে চাইল তার মাথার বেণীটা সরা সরানো গোক্ষুরের কায়দায় পিঠে ঝাপটানি মারতে লাগল। সেটাকে টেনে ধরে টুলু মোমের মাথা—মুখ নিজের জন্যে সযুত করে নিল।

ঘরে থাকতে থাকতে মোমের গায়ে একটা ঘাস ঘাস গন্ধ হয়েছে তাই মনে হল টুলুর। একদম বেরয় না। মাত্র ক'মাস হল মায়ের সঙ্গে মোম আশ্রমে আসছে।

মোম নামটা শোনা ছিল টুলুর। যে যখন হায়ার সেকেণ্ডারি দেয়—তখনি দাদা সারা বাড়ির ওপর অপমান টেনে আনা কাজটা

করে। একদিনের ভেতর তিনবার পুলিস ঘুরে যায় বাড়িতে। তারপর তো ওরা দাদাকে পেল গাদাবোটের খোলে। বাবা একটা কথাও বলেনি।

পাড়া সুদ্ধ চাউর হয়ে গেল, অ্যাসিডে মোম গলে গেছে। খবরের কাগজেও ফলাও করে বেরিয়েছিল। তখন থেকেই মোমকে দেখার একটা তীব্র ইচ্ছে টুলুর ভেতর কাজ করত।

সবাই ভেবেছিল, মহেন্দ্রদা ওরা বুলুর জন্যে জামিন চাইবে। ওদেরই পয়লা সারির ক্যাডার। কেউ এগিয়ে এল না। একদিন দুপুরে দিদি কলতলায় বাসন মাজতে বসে কাঁদছিল। সমীরদা বারান্দায় মোড়ায় বসে। সমীরদা বলল. আগেই জানতাম—ওরা টু শব্দটি করবে না। এর চেয়ে আমরা যদি উকিল দিয়ে মুভ করতাম তো অনেক ভাল হত।

দিদি কলতলা থেকে চোখ মুছে বলল, মোম নিজে যদি কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে বলে সবটাই অ্যাকসিডেণ্ট—তাহলেই মিটে যায়। ও যদি একবার অস্বীকার করত।

মা খুব আশায় আশায় বলল, তুই যা না নীলি। তুই গিয়ে যদি বলিস মোমকে।

সমীরদা আপত্তি করে উঠেছিল। তা কি করে হয়। ক্রিমি-নাল কেস। তার ওপর মোমের চিকিৎসা চলছে। শুনলাম—সাই-কোলজিস্ট আসছে বাড়িতে।

কেন? সাইকোলজিস্ট কেন?

নীলিমার একথায় সমীরদা বলেছিল হাজার হোক—মনের ওপর একটা চাপ পড়েছে তো। একটা মেয়ে তো বাবা! তার মুখের চেহারা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়—

সেই থেকেই টুলু মোমকে দেখতে চায়।

তারপর এই মাস চারেক হল—মায়ের সঙ্গে আশ্রমে এসে মোমকে তার দেখা। আসলে মোমই তাকে দেখে এগিয়ে এসেছিল।

সেদিনের সেই ক্যামিলিনুষ্ক অপমানের পর পাঁচ ছ'বছব কোত্থেকে গলে বেরিয়ে গেছে। বড় ভাইয়ের প্রেমিকা নয়—ধ্বংস করে দেওয়া রমণী—সে কেমন? সে কথা বললে কেমন লাগে কানে? এমন একটা নেশা ধরা জিজ্ঞাসা অনেকদিন ধরে টুলুকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।

তাকে বিশেষ কিছু করতে হল না। মা গুরুদেবের আসনের কাছাকাছি বসে নির্মলা মাসির সঙ্গে প্রদীপ জ্বালছিল। আশ্রমের হাতায় দিনের বেলায় লিলিফুলের গাছের পাশে দাঁড়ানো একটি ঠাসা যুবতী, যাকে বলা যায়—এমন মেয়ে—ছুটে এসে তার হাত ধরল। তুমি বুলুর ভাই টুলু না? আমি দেখেই চিনেছি।

গালে ডান দিকটা জড়ুলে ছাওয়া একটা চোখ ভাবলেশহীন। টুলু দেখেই চিনেছে। তুমি মোম?

আমার ভাল নাম অনসূয়া।

টুলু তখন পেটোর মশলা বাঁধতে শিখেছে। সে আলগোছে মোমের তালুতে টিপ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলল মোম। ঠিক বুলুর ভাই

দাদা তো ছাড়া পেয়েছে। দেখা করলে পারো।

ওরে বাবা! মেজদা জানতে পারলে আমায় খুন করে গঙ্গায় লাশ ভাসিয়ে দেবে। অবিশ্যি জলে ভাসতে আমার খুব ভাল লাগে।

কথাটায় কেমন খটকা লাগল। টুলু বলল, তোমার মেজদা খুব রাগী বুঝি?

রাগ হবে না? কোর্ট কাছারি করতে কত টাকা খরচ হয়ে গেল তার.

সেদিনই টুলু ঠিক কবতে পারেনি—মোম সরল? না, আস্ত পাগল?

॥ ১৫ ॥

বাড়ি মানে মা বাবা ভাই বোন। লোডশেডিংয়ের ভেতর ঢাকা বারান্দায় খানিক জ্যোৎস্না পড়ায় নিজের খাটে শুয়ে শুয়েই বুলু টের পেল – নীলি ফিরল। বাবা এখনও ফেরেনি। টুলু কখন ফেরে—কখন বেরয় জানার উপায় নেই। মা অনেকদিন পরে তাদের যৌবনের একটা গান গাইছিল বারান্দায় বসে।

বাড়ির বড় ছেলে—এই সুবাদে এই ঘরখানা পাওয়া। ঘর মানে ঢাকা বারান্দার বাড়তি চালাকে এক্সটেণ্ড করে তিনদিকে তিন ইঞ্চির গাঁথুনি। সামনে একটা দরজা বসানো।

আগে মাওবা গরম লাগত—এবার জেল থেকে ফিরে বুলুর কোন অসুবিধে হয় না। শীত বা গরম বোধ তার একদম কেটে গেছে। শোবার একটু জায়গা হলেই হল। তবে ভাল কথা-খারাপ কথার—ফারাক সে আব ধরতে পারে না। জেলে থাকতে সে এই ফারাকটা ঠিক কোথায়—তা হারিয়ে ফেলেছে।

সংসারে অনেক দায়িত্বই তার নিতে ইচ্ছে করে। নিতে চায়ও। কিন্তু নিতে পারে না। সে কোন আয় করে না। তার সময়কার ক্যাডাররা এখন চারদিকে ছড়িয়ে ছিটকে পড়ে নানা কাজে আটকে নিয়েছে নিজেদের। অনেকেই বিয়ে করে মোটা হয়েছে।

কিন্তু বুলু যে দায়িত্ব নিয়ে নীলিকে বলবে—কাল থেকে তুমি সমীরের টেলিফোন পেলেই বেরিয়ে যাবে—তা চলবে না—তা বলার মত দায়িত্ব এ সংসারে কেউ তাকে দেয়নি।

বরং উল্টে সব জেনেশুনেও নীলি তার রুটি সেঁকা সন্ধ্যেগুলো থেকে কীভাবে ফিরে আসছে—বুঝতে পেরেও –বুলুকে—চুপ করে থাকতে হচ্ছে। কেননা আগামীকালই সে পি কে-র সেই অ্যাডভার্টাইজিংয়ে গিয়ে জয়েন করছে। সমীরেরই চেষ্টায়। শেষ পর্যন্ত লাটু বোস তার জয়েন করা আটকাতে পারেনি।

চাকরির খবরটা এভাবে দিয়েছিল সমীর। ফোন করে—

ওভাবে চলে এলি কেন বুলু? রুণুকে একা ফেলে? শি ইজ এ গুড্ কম্পানি।

বুলু কোন জবাব দেয়নি। তার মনে হয়েছে—জানতে চাওয়া উচিত ছিল—নীলি ইজ আ গুড কম্পানি ফর ইউ? এভরি ইভিনিং?

বুলুকে চুপ করে থাকতে দেখে ওপাশ থেকে সমীর বলল, 'ভাল কথা—তোকে কনগ্রাচুলেশন। সোমবার ডেক্সার্টে তুই জয়েন করছিস। অ্যাজ এ কো-অর্ডিনেটর। পি কে ফুল কনসেণ্ট দিয়েছে। খুশি তো?'

'আমি গ্রেটফুল সমীর। জেল থেকে ফেরার পর চারদিক অন্ধকার লাগছে। তার ভেতর—'

'এটা কিছুই নয় বুলু। পারি তো রাতের দিকে যাব তোদের বাড়ি।'

সে রাতে আসেনি সমীর। আর আজকের রাতটা ফুরোলেই কাল সাকার হবে বুলু। কাল সে ওই চাকরিতে জয়েন করবে।

এ কি হয়ে গেল বাড়িটা। নামেই বাড়ি। আসলে একটা থাওয়া মাত্র। রাস্তার পাশের থাওয়া। এখানে কে কখন আসে—কেন আসে—কেন যায়—কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। অলিখিত আইনে কেউ তা নিয়ে কৈফিয়তও করে না।

বুলুর বুকের ভেতর দিয়ে একটা কথা উঠে আসতে চাইছিল—যা সাজালে অনেকটা এমন দাঁড়াতে পারে—

টুলু তুই মোমের কিছু জানিস না। তুই মোমের কাছে যাস না। ও ভীষণ জেদি। ওর জেদ ভাঙতেই আমি ব্যাটারির অ্যাসিড···

আমাদের বাড়িটা যদি আর পাঁচটা বাড়ির মত স্বাভাবিক হত টুলু—তাহলে আমি আর তুই চাকরি করতাম। বাবা রিটায়ার করত। নীলি এখন শ্বশুরবাড়িতে। তাহলে মোম এ বাড়িতে বউ হয়ে আসতে পারত। মোমের মামারা তো আমায় মোমের সঙ্গে

একরকম মেনেই নিয়েছিলেন। তুই একটু ভেবে দেখিস টুলু। তোরা এখন এলাকার লড়াকু পার্টি। চীনের চেয়ারম্যান তোদের চেয়ারম্যান এখন। আমরা তো বসে গেছি। মোম এমনিতে বিরাট কিছু বোঝে না। কোন রাজনৈতিক চেতনা নেই ওর। কয়েক ভাইয়ের এক বোন। আদুরে আহ্লাদি। তোর থাতে মিলমিশ খাবে না রে টুলু—আমার জিনিসে কেন হাত বাড়ালি? ও হাত আমি কাঁধ থেকে খুলে নেব।

অন্ধকারের ভেতরেই নীলিমা খুট খুট করে বাড়ি ফিরল। একটু পরে অন্ধকার কলঘরে ঢুকে দোর দিল শব্দ করে। এখন ও সাবান মেখে কোন গ্লানি ধুয়ে ফেলতে চায়? সময় মত বিয়ে হয়নি বলে অনুষ্ঠান আর গাঁটছড়াটুকু বাদে আর সবই নীলিমা বজায় করে চলেছে। যেন সমীরের বিয়ে করা বউ।

গা ধুয়ে মাথা আঁচড়ে চা করল নীলি। এই দাদা—খাবি। পাতলা করে করেছি।

দে।

তোর তো কাল জয়েনিং দাদা। সমীর বলছিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে বুলু জানতে চাইল, আর কি বলছিল?

আর কি বলবে। বাঃ! এটা একটা সুখবর তো।

বুলুর মাথার ভেতর তখন আলবামা হোটেল কাম রেস্তোরাঁয় সমীরের ঘরখানা ঘুরছিল। সঙ্গেই বাথরুম। ঠাণ্ডা জল গরম জল কল ঘোরালেই পাওয়া যায়। বুলু বলল, কিসের ব্যবসা করে সমীর?

তা তো বলেনি কোনদিন।

জানতে চাসনি কোনদিন?

জানাই হয়নি। এবার দেখা হলে জিজ্ঞাসা করব।

থাক। এতদিন যখন জিজ্ঞাসা করিসনি—তখন আর করিসনে।

আর কথা আসে না বুলুর। গুমোট। আলো নেই। জীবনটাই কেমন বেলাইন হয়ে আছে। নীলি ছোট থাকতে বর্ষার দিনে আমার সঙ্গে কাগজের নৌকো ভাসাতো। বারান্দা থেকে। নিচের

জলে। সেই নীলি এখন ভেসে যাচ্ছে। ওর নিজের ইচ্ছে জমিয়ে আছে। তার মাঝে বুলু কথা বলার কে?

উঠলি দাদা? খা খেলি না?

খেয়েছি।

ভাল হয়নি।

হয়েছে।—বলে বুলু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। পাড়ার মোড়ে দুই বাড়ির ফাঁকে লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে দিব্যি চাঁদের আলো। বাগা গুলতানি মারার তারা পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দিব্যি মেরে যাচ্ছে। পৃথিবী অচঞ্চল। তার যেন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

॥ ১৬ ॥

মহেন্দ্রদা বলল, ইচ্ছে করেই তোকে ডাকিনি। সবে ছাড়া পেলি। পার্টির দিক থেকেও তোর দুর্নাম বোঝা হয়ে দাঁড়াত।

তা হলে আজ যে ডাকলেন!

বুলুর এ কথায় পোড় খাওয়া মহেন্দ্র মানুষটি একটুও টলল না। তার চোখের পলকও পড়ল না। খুব শান্ত গলায় বলল, এখন তো সবাইকে ডাকতে হবে। ওদের বাম হঠকারিতায় মারা পড়ব নাকি? ওরা যারই একটু মাথা উঁচু দেখছে—তাকেই সাবাড় করে দিচ্ছে। আমার ওপর একদিন অ্যাটেমপ্ট হয়েছে—

তাই নাকি?

তুমিও বাঁচবে না বুলু। তুমিও ওদের টারগেট। আজ হোক কাল হোক—ওরা ঠিক অ্যাকশন করবে। ওদের চোখে তুমি একজন পুরনো পাপী।

আর আপনি?

আমি! শোধনবাদী ঘাঘু। তোকে ডেকেছিলাম আর একটা কারণে—

বলে ফেলুন।

পার্টির এখন চরম সঙ্কট। অস্তিত্বের সঙ্কট। সেখানে ব্যক্তি-হত্যার সন্ত্রাস দিয়ে আমাদের কাবু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা কিছুতেই দমব না। পার্টি আমাদের চোখের মণি। সে মণিকে আমাদের যে কোন মূল্যে বাঁচাতে হবে।

কথাটা কি বলুন না—

তোর ছোটভাই টুলু কি করছে?

কিছুই না।

কলেজে যায়?

মাঝে মাঝে যায় হয়ত। কেন?

একটু লক্ষ্য রাখিস তো। আমার ইনফরমেশান যা—তাতে ও ওদিকেই ঝুঁকেছে।

আমি তো কবে বসে গেছি মহেন্দ্রদা। আমাকে আবার ডাকা কেন? তাছাড়া আমি জেলখাটা লোক—

তুই আমাদের লড়াকু কমরেড। কত কঠিন কাজে তুই গেছিস। পার্টি তোদের স্যাক্রিফাইসে দাঁড়িয়ে। একদিন নিশ্চয় এর একটা হিসেব নিকেশ হবে বুলু। তখন দেখবি তোদের নামই পার্টির ইতিহাসে সোনার জলে জ্বলজ্বল করবে।

আবার আমাদের কেন মহেন্দ্রদা? সবে একটা চাকরি পেয়েছি। এখনও টেম্পোরারি।

চাকরিতে কি বিপ্লব আসবে বুলু!

কথা বাড়াল না বুলু। শুনে যেতে থাকল মহেন্দ্রদার কথা। মহেন্দ্রদা বলছিল—বাম হঠকারিতার শিকার হয়েছে টুলু। ওকে কতটুকু দেখেছি। এখন সেই টুলুরা ব্যক্তি হত্যায় নেমেছে। নেমেছে লাল সন্ত্রাসে। তার নাম দিয়েছে পবিত্র সন্ত্রাস। এই করেই নাকি পুঁজিবাদের দুর্গ ধসিয়ে দেবে! ভেবেছে কি ওরা? আমরা রুখে দাঁড়াব।

সকালবেলার বাতাসে পরিষ্কার আলো। বুলু বলল, দেখি। তারপর বলল, অফিস বেরব মহেন্দ্রদা—উঠি আজ।

আজ বিকেলেই চলে আয়।

পারি তো আসব।—বলে বাড়ি ফিরল বুলু। শহরে যে যার কাজে। কারও যেন নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। কেউ কাউকে ফিরে দেখে না। এর ভেতর টুলু দিন দিন ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে। তিন চারদিন অন্তর বাড়ি ফেরে।

পি কে-র ডেজার্ট অ্যাড্ভার্টাইজিং অফিসে যাওয়ার সময়ও বুলুর মনটা টুলুকে নিয়ে ভাবছিল। অফিস রওনা হবার ঠিক আগে আনমনা মা পথ আটকাল। হ্যাঁরে বুলু—একবার গুরুদেবের আশ্রমে যাবি। তিনি বলেন—তোর তো নবজন্ম হয়ে গেছে—

একটা রূঢ় গালাগালি মুখে এসেও বেরল না বুলুর। মায়ের মুখ দেখে। নবজন্ম কথাটা এমন করেই বলল—যেন—এইমাত্র নতুন গোলাপ গাছে কুঁড়ি এসেছে। বড় মায়া হল মায়ের জন্য। বলল, পথ ছাড়—অফিসে দেরি হয়ে যাবে।

তুই যাবি একবার গুরুদেবের আশ্রমে?

না।

তোদের সেই অনসূয়া মেয়েটিও আসে তার মায়ের সঙ্গে। আমায় দেখিয়ে দিলেন গুরুদেব চোখের ইশারায়। তা মুখখানা তো এখনও ভালই।

চুপ করবে মা—

ওমা! চুপ করব কেন? ওকে তোর পছন্দ ছিল। এখনও তো সব শেষ হয়ে যায়নি বাবা। গুরুদেব বলছিলেন, তোর গ্রহের ফের কেটে গেছে। এখন সুসময়। তুই রাজি থাকিস তো গুরুদেবকে দিয়ে কথাটা পাড়াই—

একদম নয়। আমি এবার তাহলে অ্যাসিড ছুঁড়ে গুরুদেবের মুখ পুড়িয়ে দেব।

ও কি কথা—

ডেজার্ট অ্যাড্ভার্টইজিংয়ের অফিস অল্প জায়গা নিয়ে। কিন্তু

কাঁচের দরজা, পেলমেটে ভারি পর্দা, দড়ির কার্পেট আর পেতলের ঘড়া সাজিয়ে অফিসটাকে করা হয়েছে ওরই ভেতর কিছু আলাদা।

যার কোম্পানি—সেই পি কে লোকটি বসে আলাদা একখানা ঘরে। লাটু বোস যাকে বলে ভুখোড় ব্যাপারি। নামে ডিরেক্টর। আসলে মিডিয়া এগজিকিউটিভ। পগিয়ে-পটিয়ে পার্টি আনে।

কোম্পানি জোড়াতালি দিয়ে সবই রেখেছে। লেআউট ম্যান, আর্টিস্ট। কপিরাইটার। বুলুর কাজ একদম আলাদা।

প্রথমদিনেই সে তা টের পেয়েছে। টের পেয়েছে—সমীরের হাতে এত কাঁচা পয়সা কোথা থেকে। সমীরই এই অফিসের প্রাণ। বড় বড় কোম্পানির প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপনের ভার সে যোগাড় করে। তার কথাতেই ব্যবসা পায় কোম্পানি। তারপর কমিশনের একটা ভাল ভাগ সে পায়। প্রোডাক্টের ছবি আঁকা হয়। আবার মডেল দিয়ে ছবিও তোলানো হয়।

বিকেলের দিকে কী কাজে আর্টিস্টের ঘরে গিয়েছিল বুলু। তার কাজ তো এ-ঘর ও-ঘর করা। অথবা সমীরের প্রতিনিধি হয়ে সারাদিন অফিসে থাকা। সন্ধ্যের দিকে হন্তদন্ত সমীর তার কাছ থেকে দিনের খবর পায়।

আর্টিস্টের ঘর থেকে বের হতে যাবে বুলু—কী মনে হল—লে আউটের ঘরে ঢুকল। ঘরটা বিশেষ বড় নয়। ওয়াল টু ওয়াল ম্যাজেণ্টা রংয়ের ভেলভেট চাপানো। তাতে বিখ্যাত ক্যামপেনের আর্ট ওয়ার্ক লটকানো। ঘরের ঠিক মাঝখানে ফ্লাড লাইটের কড়া আলোর নিচে নীলিমা দাঁড়ানো। কায়দা করে। বুলুর তো চক্ষুস্থির!

পেডেস্ট্রাল ফ্যানের হাওয়ায় নীলিমার খোলা চুল উড়ছে। খোলা কাঁধে ঘামাচি মারার পাউডার ব্যবহারের ছবি তোলা হচ্ছে।

খোলা কাঁধের জায়গায় ব্লাউজটি একটু ছিঁড়ে দেওয়া। ফোটো-গ্রাফারের পেছনে দাঁড়িয়ে সমীর নীলিমাকে ভাবভঙ্গির নির্দেশ দিচ্ছে। কড়া আলোয় ঘর গরম। তার ভেতর দাঁড়ানো পাখা চালু করে নীলিমাকে আলুলায়িত করা হচ্ছিল। সমীর এগিয়ে

গিয়ে মেক-আপ চেক-আপ করছিল নীলিমার—আবার পছন্দমত শট নেবার জন্যে ফটোগ্রাফারের পেছনে চলে আসছিল।

মাথা ঠিক রাখতে পারল না বুলু। বাজ পড়ার মত তার গলা ছোট্ট ঘরখানার ভেতরে ফেটে পড়ল। উঠে আয় নীলি। উঠে আয়—

সবাই চমকে ফিরে তাকাল। বিশেষ করে নীলিমা যেন নিভে গেল।

ব্যাপারটা হালকা করতেই যেন সমীর বলল, কি হচ্ছে বুলু। গোয়ার্তুমির জায়গা নয় এটা।

কিন্তু বুলুর মুঠো করা হাত আর দাঁতে চাপা ঠোঁট দেখে ফটোগ্রাফার প্রথমেই কাঁচের দরজা ঠেলে পাশের ঘরে চলে গেল। চলে গেল লাটু বোস। আলোর উল্টোদিকে একটা রাংতার বোর্ড ধরে থাকা ছেলেটিও গুটিয়ে গেল।

মডেল তো হয় মেয়েরা। এটা কত বড় প্রফেশন তা তোকে বুঝিয়ে বলতে হবে না আশা করি।

সমীরের গোছানো কথাগুলোর কোন জবাব দিল না বুলু তেমনি জোরে চেঁচিয়ে বলল, উঠে আয় নীলি—

গায়ে ভাল করে কাপড় জড়িয়ে নীলিমা উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, না—আমি যাব না। আমি একটা মেয়ে—আমার কি করে চলে তার একটা খোঁজ নিয়েছিস কোনদিন?

তবে থাক!—বলে রাগ পায়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল বুলু। রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল—এই যে এত বড় শহর—তার ভেতর ক্যাডলাইটের নিচে আদুল গায়ে নীলি থেকে গেল—সে জন্যে শহরটার কোন হ্যাং ক্যাং নেই—নেই কোন উনিশ বিশ। যেমন চলছিল—তেমনিই চলছে। এর নাম লোকালয়। শহর। কোন মন নেই। শুধু মানুষজন—ঘরবাড়ি—আর বাস ট্রাম ট্যাক্সি প্রাইভেটে ঠাসা।

নীলিমা এক সময় সমীরকে ভালবাসত। সেই ভালবাসা

আলারাখার ঘরে খানিকক্ষণ বন্দী হয় রোজ সন্ধ্যেবেলা। সমীর নিয়ম করে ফোন করে। নিয়ম করে নীলিমাদের হোল ফ্যামিলির জন্যে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, সহানুভূতি জানায়। এখন সমীরের সহানুভূতি নীলিকে মডেল করে তুলছে। নীলি বড় পেডেস্ট্রাল পাখার সামনে এলোচুলে ছেঁড়া কাঁধে ঘামাচি মারার নতুন পাউডার ঢালছে—হাসি মুখে, চোখে কাজল—ঠোঁটে লিপস্টিক—দামী প্রসাধনে মুখখানা তেলতেলে।

ঘোর বর্ষায় যখন চারদিক থেকে জল ঢোকে ঘরে—তখন কোথায় পুলটিস দিয়ে জল আটকাব। ছাদের নিচে গামলা পেতে—জানলায় ভিজে বস্তা গুঁজে—ঘরের মাঝখানে ছাতা মেলে দিয়ে আটকাতে যাই। ভিজে পায়েই ঘরময় জলছাপ খেলি।

॥ ১৭ ॥

বুলু যখন লড়াকু ক্যাডার—তখন সমীর রীতিমত তোয়াজ করে কথা বলত। কথায় কথায় বলত—কেমন চলছে বুলুদা? কোথায় যাচ্ছো গো বুলুদা। তোমাদের নিঃস্বার্থ কাজের দাম একদিন পাবেই। তখন সমীর ছোটখাটো একজন অর্ডার সাপ্লায়ার। প্রেসের জব কাজ ধরে এনে ছাপিয়ে ডেলিভারি দিত। প্যাড, আইডেনটিটি কার্ড—এইসব ছাপাত। সে সময় নীলি সবে প্রথমবার হায়ার সেকেণ্ডারি ফেল করেছে।

ফেল্টু হলেও উঁচু ক্লাসের নীলির জন্যে শাড়ি আনত বুলু। তখন আমদানি ছিল। বিশেষ করে বাড়িওয়ালা ভাড়াটে কাজিয়ায় দু পক্ষই তাকে হাত করতে চাইত। তাই বুলুর হাতে কিছু আসতও।

পেটো বাঁধতে বসে কোনদিন হাতের ভেতর ফাটায়নি। যেখানে যেটি মারার—যেটি ফাটানোর সেখানে সেটি মারা বা ফাটানোয় বুলুর কোনদিন কোন গাফিলতি হয়নি।

সেই বুলু আস্তে আস্তে বসে গেল।

পার্টি গেল। ফ্যামিলি গেল। থাকল শুধু মোম। মোম তাকে তুক্ করেছিল বোধহয়! নইলে নীলি, টুলু—ওদের কথা একবারও ভাবেনি সে।

মোমের বড্ড চাপাচুপি ছিল। অন্য কারও দিকে তাকানো বুলুর মানা ছিল। মানে বুলু আর কাউকে চোখ তুলে দেখতে পারবে না। এইসব ভাবতে ভাবতেই গঙ্গার ঘাটে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। এখন আলো আর জলের বিখ্যাত খেলা। গাদাবোট সরে সরে গভীর জলে চলে যাচ্ছিল। বুলু বাড়ির পথ ধরল।

বাড়ি ফিরে দেখল, মা আর বাবা অনেকদিন পরে একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছে। এ দৃশ্য সেই কোন্ ছোটবেলায় দেখেছে বুলু। পরে আর দেখেনি। কাছাকাছি যেতে সেও এক কাপ পেল। কেটলিতে মা সব সময় দু'কাপ জল বেশি নেবে।

টিউটোরিয়াল থেকে ফিরে বাবা এ সময়টায় অনেকদিন চুপ করে ইজিচেয়ারে শুয়ে আকাশ দেখে। আজ কী হয়েছে কে জানে অনেকদিন পর বাবা মায়ের কাছাকাছি বসে পেয়ালা হাতে চা খাচ্ছে।

টুলুটা সারাদিন কোথায় কোথায় টো টো করে বাবা—

বুলুর এ কথায় ভাবলেশহীন চোখে তাকাল তার বাবা। তারপর বলল, সংসারের কথা বলছ? ফ্যামিলির কথা? আমি কিছু জানি না। জানতেও চাই না।

টুলু যদি বয়ে যায়—

যাবে। আমি আমার কাজ তো করে যাচ্ছি। তোমাদের দোবেলা খাওয়াবার টাকা তোমাদের গর্ভধারিণীর হাতে দিয়েই আমি খালাস!

বুলুর মা ঝাঝিয়ে উঠল। ও কি কথা। বুলু তো উচিত কথাই বলছে—

বুলুর বাবা বলল, 'বাড়ি ফিরছিলাম—দেখলাম কেডস্ পায়ে

ক'জনায় হনহন করে চলেছে। আমি কি তার ভেতর থেকে টুলুকে ডেকে থামাব ?

বুলু বলল, আজ আমি সমীরদের অফিসের কাজটা ছেড়ে দিলাম বাবা।

তার বাবা মুখ টিপে হাসল। হেসে বলল, সুখের কথা! এ বাজারে তো লোকে চাকরি পায় না। তুমি ছেড়েছ—তোমার বুকের পাটা আছে।

বুলু মায়ের নিরাশ মুখ দেখে বুঝল, তার চাকরি ছাড়ায় বড্ড লেগেছে। বুলু বলল, বাবা—তুমি তো কোনদিন চাকরি করনি। টিম্বার ওয়ার্কসেও যাওনি।

সেজন্যে মুখের ফকো তুলে রোজ টিউটোরিয়ালে পড়াই।

এমন [illegible] নীলিমা রাস্তা থেকে মাছের মত বারান্দায় উঠে এল। ওঠা মাত্র বুলু বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল : এই তাহলে ফিরলি ?

বুলুর মা বলল, কোত্থেকে ফিরলি ? আজ সকাল সকাল বেরলি যে—

ঘরের ভেতর চলে গিয়ে নীলিমা বলল, কাজ ছিল মা—

বুলু চেঁচিয়ে উঠল, কাজ মানে মা ক্যামেরার সামনে মডেলগিরি—

কি ?

বুলুর বাবা শান্ত গলায় বলল, বুঝলে না—ওই যে কাগজে কাগজে ছবি থাকে—এটা কিনুন—ওটা ভাল—একটা মেয়ে বলছে—আমাদের নীলি তাই হচ্ছে!

ও মা!—বলে বুলুর মা নিজের কপালে চড় মারল, এ মেয়ের বিয়ে হবে কি করে ?

অন্ধকার ঘর থেকে ছুরির ফলার মত নীলিমা বেরিয়ে এল, তোমরা তো আমার বিয়ের জন্যে অনেক করেছ! এবার আমায় কিছু করতে দাও।

বুলুর মা বলল, সমীর জানে ?

বুলু বলল, সমীরই তো নাটের গুরু। আজ অফিসে গিয়ে দেখি নীলি এলোচুলে খোলা পাখার সামনে বসে পাউডারের মডেল হয়েছে—।

নীলিমার কাপড় ছাড়া হল না। সিধে বুলুর মুখোমুখি হয়ে বলল, তুই তো আমার জন্যে অনেক করেছিস ! দেনা একটা কাজ। তাহলে সমীরের ও সব আমি ছেড়ে দিই। নিজে নষ্ট। আরেকটা মেয়েকেও নষ্ট করলি।

বুলু বোবা হয়ে গেল। তার কি করার আছে। সে পাঁচ বছর জেল খেটেছে। প্রায় বছর খানেক হল নিজের মহলায় ফিরেও একরকম অচ্ছুৎ হয়ে আছে। যে ছেলে মেয়েদের মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ে তার সঙ্গে কেউ মেশে না। সেও এগিয়ে গিয়ে মিশবার মত সাহস জড়ো করতে পারে না।

মৃত্যুপথযাত্রী দাতুকে দেখতে গিয়ে ট্যাক্সির ভেতর কেন যে বুলুর কোলে হাতখানা রেখেছিল মোম। এমনিতে কিছু হয় না। কিন্তু এক এক সময় বোবা তেজ, অন্ধ ভালবাসা—উত্তেজনা হয়ে দেখা দেয়। তখন ট্যাক্সির দরজা খুলেও নামা যায় না। সে এক অকোয়ার্ড পজিশন। তার একটু আগে—কোনদিন যা করে না বুলু—মোমকে নিজের কোলে পেতে চেয়েছিল। পাওয়ার মত খানিকটা হয়েও ছিল তাদের। ট্যাক্সির ভেতরই। শহরের রাস্তায়। ড্রাইভার স্টিয়ারিংয়ে।, সামনের দিকে তাকিয়ে।

বুলু জানে—এবার নীলিমা সারা বাড়ির জন্যে নিজের মত করে চা করবে। এটাই ওর সংসারকে আঁকড়ে ধরার একটা রাস্তা বা প্রক্রিয়া। চা একটু বেশি সময় ভিজিয়ে লিকারটা কড়া করে। দুধ আগে গরম করে নেয়। চিনি মেপে মেশায়। তারপর নিজের হাতে সবাইকে কাপ এগিয়ে দেয়।

আঃ ! সেদিন মোমের সঙ্গে যদি ট্যাক্সিতে না থাকতাম। তাহলে ? তাহলে দুনিয়াটা এত জটিল হওয়ার সুযোগই পেত না।

॥ ১৮ ॥

রাত দশটা নাগাদ বাবার একটা কথা পটাং করে মনে পড়ল বুলুর। সবাই কেডস্ পায়ে হনহন করে চলেছে কোথায়। সর্বনাশ! টুলু তো তাহলে অ্যাকশনে বেরিয়েছে। অ্যাকশনের সময় কেডস্ পরলে চলাফেরা নিঃশব্দ। ফিরে এসে সন্তার কেডস্ দূরে কোথাও পুঁতে ফেল। প্রমাণ হাফিস।

ওঃ! বলে বুকের ভেতব একটা কষ্ট টের পেল বুলু। টুলু তাহলে কোথায় গেল? নীলি শোবার আগে মুখ ধুয়ে ক্রিম মাখছে। বাবা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় সাজেশন তৈরি করছে নিশ্চয়।

বুলু ট্রাউজারটা গলিয়ে নিজেও তার এক সময়কাব দৌড়োদৌড়ির কেডস্ পরে নিল। তাবপর নি:শব্দে সদর দরজা খুলে রাস্তায় এসে নামল।

কোথায় যেতে পারে টুলু? কাদের সঙ্গে মেশে?

ময়লা ফেলার আইল্যাণ্ডটা পেরলে একটা ছোট পার্ক। সেই পার্কের গাযে ক্লাবঘর। যাদের সঙ্গে টুলু ওঠে বসে তারা এই ক্লাবঘরের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গজালি করে।

সেখানে গিয়ে কাউকে পেল না। ওদের অ্যাকশন মানে তো খতম। একদম খতম। তার মানে পাইপ, রড, সাইকেলের চেন নয়ত কয়লা ভাঙার হাতুড়ি নিয়েছে। আর নিয়েছে ভোজালি। ফেরার সময় কেউ যাতে তাড়া কবে ফলো না করতে পারে সেজন্য গোটা কয়েক কৌটো বোমাও সঙ্গে নিয়েছে নিশ্চয়। টুলু দিনকে দিন কেমন রুক্ষ হয়ে উঠেছে। দাড়ি রেখেছে। সেদিন নীলি চা নিয়ে এলে দরজা খুলতে দেরি হওয়ায় টুলু কয়লা ভাঙার হাতুড়িটা নিয়ে কেমন তৈরি হয়েই দরজায় দাঁড়িয়েছিল। অথচ নীলি, টুলু আর আমাকে নিয়ে মা বাবার সংসারটা আমাদের ছোটবেলায় কত সুন্দর ছিল।

পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে দুটো বড় রাস্তা ক্রস করে মোমদের সেই

বাড়ির সামনে এসে পড়ল বুলু। দোতলার একঘরে বোধহয় দশ পাওয়ারের ডুম ঝুলছে। অন্য সব ঘরের জানলা বন্ধ। বাড়িটার পেছন দিকে একটা বাড়ি তৈরি হতে গিয়ে অনেকদিন আগে থেমে গেছে। সেদিকটায আলো নেই।

আজকাল সন্ধ্যে হতেই পাড়া কে পাড়া খা খা করে। রাস্তায় লোকজন বেরনো কমে গেছে। মোমদের বাড়ির ভেতর বারান্দা দিয়ে বাড়ির মানুষজন মাঝে মাঝে চলাফেরা করছে। পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালে যদি মোমকেও দেখা যায়—এই আশায় সেই ভাঙা বাড়ির গায়ে গজানো কচুবনে ঢুকে পড়ল বুলু।

আর অমনি কে সরে গিয়ে পেছন থেকে তার মুখ গামছায় বেঁধে ফেলল। ফেলেই তাকে টানতে টানতে একদম বাড়িটার বড় ঘরের চাতালে।

এখানে কি হচ্ছিল?

যে বলল, তার গলা বুলুর চেনা। সে গামছার ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বলতে গেল—আমি রে টুলু। আমি—কিন্তু শব্দ বেরল অন্যরকম। তাতে ঘাবড়ে গিয়ে আশপাশের ভাঙাঘর থেকে তিন-চারজন বেরিয়ে এল। বুলু দেখল—সবার পায়েই কেডস্। তাহলে এখানে ওরা কার জন্যে এসেছে? ওদের সবাইকে চেনে বুলু। ওরাও বুলুকে চেনে। আলো বলতে আকাশের আলোর আভা। মাঝে মাঝে টর্চ। নাহলে এখুনি ওরা বুলুকে চিনত।

পিছমোড়া বাঁধনটা এক ঝটকায় খুলে ফেলল বুলু। সঙ্গে সঙ্গে টুলু দাঁড়ানো অবস্থায় এক লাথি কষিয়ে তাকে ফেলে দিল। সবটাই অন্ধকারে। দাঁতে দাঁত চেপে।

মুখ ঘুরিয়ে তাকাল বুলু। গামছা সরে গেছে। পড়ে যাওয়ায় উঠতে পারছে না। টিনের ঘরের নন্টুবাবুর ছেলে স্বপন বলল, আরে! বুলুদা যে—

কে?—বলে এগিয়ে এল টুলু। তার হাতের ভোজালিটা থর-থর করে কাঁপছে। আবার জানতে চাইল টুলু, কে?

স্বপন বলে উঠল, যন্তর নামা। তোর দাদা।

দাদা—বলে হাত গুটিয়ে নিল টুলু। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে জানতে চাইল, টিকটিকিগিরি কতদিন ধরে? লজ্জাও করে না। মহেন্দ্রদা পাঠিয়েছে?

টুলুদের দলে বেপাড়ার একটা খেড়ে লম্বা ছেলে ছিল। সে এসে পেছনে থেকে বুলুর মাথার চুল ধরতেই টুলু এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে দিল। দিলেও ছেলেটা বলতে থাকল, এসব শোধনবাদী ষড়যন্ত্রী শেষ রাখবেন কমরেড— ?

বুলু আর থাকতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, আমি কোলাবরেটর নই। শোধনবাদী নই। আমি টুলুর দাদা বুলু—

টুলু বলল, বাড়ি চলে যাও।

তোকে নিয়ে ফিরব।

উঁহু। আমার কাজ আছে। ফিরতে দেরি হবে—

আজ আর কাজ নয়। বাড়ি চল টুলু।

আঃ।—বলে এমনই ধমকে উঠল টুলু—যার একটাই মানে দাঁড়ায়—বড় ভাই হলেও টিকটিকি বলেই বুলুকে ওভাবে বিরক্তি জানিয়ে হটিয়ে দেওয়া যায়।

আশপাশের বাড়িতে এখনও ঘর গেরস্থালি। মৃদু আলো। জল ছাড়ার ছড়ছড় শব্দ। অন্ধকার মাঠ দিয়ে একটা বেড়াল পাশ করল। এই আধখানা ভাঙা বাড়িটার ভেতরটাও অন্ধকার। শুধু ছাদের জায়গাটা ফাঁকা বলে সেখান থেকে আকাশের আলোর আভা।

এমন সময় পাশের ঘরের গাঁথুনি ঘেঁষে একটা গোঙানি উঠল। কে যেন নিঃশ্বাস ফেলতে চাইছে। ফটাং করে একটা কাঠের বাড়ি দিল যেন কে। অমনি আবার সব চুপচাপ।

বুলু সোজা অন্ধকারে গিয়ে টুলুর দুই কাঁধ ধরল: বল কে ওখানে?

তুমি বাড়ি চলে যাও দাদা। অনেক হয়েছে। এরপর কিন্তু ভাল হবে না।

কাকে ধরে এনেছিস? আমায় বলতেই হবে তোর। আমি তোর ভাই। এরা তোর কেউ নয়—

কথা শেষ হল না বুলুর। তার আগেই টুলু বেদম এক রদ্দায়

তাকে ফেলে দিল। দিয়ে বলল, ভালয় ভালয় বাড়ি চলে যা দাদা—নয়ত বিপদ ডেকে আনবি।।

টুলু কথা বলছে দাঁতের ফাঁক দিয়ে। চেপে চেপে। চার পাঁচ-জনের একটা দলের দলপতি হয়ে। হাতে অস্ত্র। পেশিতে রাগ। সে রাগ কথার সঙ্গে মিশে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে—।

বুলু মাটিতে পড়ে গিয়েও সেই গোঙানিটা আবার শুনতে পেল। শুনে তার ভেতর অবধি চমকে গেল। কে জানে—কাকে তুলে এনেছে। পাশের ঘরের গাঁথুনি ধরে উঠে দাঁড়াল। জানলার জায়গায় বড় গর্ত। হলহল করছে। এক লাফে পাশের ঘরে পড়েই বুলু বুঝল তার পায়ের পাশেই বস্তার মত একটা লোক বাঁধাছাদা অবস্থায় গোঙাচ্ছে। টুলুরা ভাবল—বুলু বোধহয় চলে যাচ্ছে। যেতে গিয়ে দম নিচ্ছে।

আর বুলু গোড়াতেই লোকটার মুখের ভেতর থেকে গাদানো তোয়ালে টেনে বের করল। অমনি অন্ধকারে প্রাণভয়ে কাবু একটা মানুষ কেঁদে উঠল—আমি তোদের অন্তুদা—অন্তু—

আর কথা বলতে পারল না অন্তু। তার পিঠের ওপর বেধড়ক মুগুরের বাড়ি কষাল কে। কোন শব্দ নেই। স্রেফ—ধুপ। আর সঙ্গে সঙ্গে—আ—মরে গেলাম—মরে গেলাম—

টুলু ছুটে এসে বুলুর হাত থেকে তোয়ালেটা কাড়তে গেল। দে· বলছি—

না।

ভাল কথায় দে দাদা। এই লোকটাই মোমের সেই দাদা।

জানি। সে জন্যেই তো আরও দেব না।

আমরা কোন সাক্ষী রাখি না। তুইও তাহলে আর ফিরতে পাবি না দাদা।

বেশ তো। আয়—বলে হাফ অন্ধকারে বুলু পোজিশন নিল। দুই পা ফাঁক করে। মাথাটা তুলে। তার হাতে কোন অস্ত্র নেই। শুধু তোয়ালে। সেই তোয়ালেই সই। হাতের মুঠোর ওপর পেঁচিয়ে নেওয়ায় ঠিক যেন বক্সিংয়ের গ্লাভস্। সে এখনও জানে না –মোম টুলুর সঙ্গে কতটা এগিয়েছে। কিংবা টুলু মোমের সঙ্গে কতটা এগিয়েছে।

টুলুর হাতের সাইকেলের চেন তার গলায়—কাঁধে এসে হ্যাঁচকা টানে বসে গেল।

সংযোজন

অবশিষ্টাংশ দাহ—২

কঙ্কাবতী দত্ত

॥ ১৯ ॥

রুণু চোখ ফিরিয়ে বুলুর দিকে একবার তাকাল। দৃষ্টি অর্ধ-নিমীলিত ; তবে এই আধবোজা, ঘোর লাগা ভাবের কারণ যেন ঠিক স্পষ্ট হল না বুলুর কাছে। হয়ত রুণু এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এ ধরনের একটা লাস্যময় কটাক্ষ ছুঁড়ে দিচ্ছে তার দিকে। আবার এও হতে পারে জিনের নেশায় তার চোখে বেশ রঙ ধরেছে, কিংবা সে ভান করছে যে তার নেশা হয়েছে। বুলুর চোখ দুটোও কেমন ঝাপসা হয়ে এসেছে। যেন অনেক দূরের কিছু দেখছে, এইরকম একটা ভঙ্গিতে চোখ দুটো সামান্য কুঁচকে সে তাকিয়ে রইল। রুণুর চোখের মণি কুচকুচে কালো নয়, গাঢ় বাদামী। সেই জন্যই বোধহয়, নেশা নেশা লালচে ভাবটা আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দু-চোখে। কাজল ধেবড়ে গিয়ে চোখটা ক্যাকাসে লাগছে। বুলুর পচা মাছের কথা মনে পড়ে গেল সেই দিকে তাকিয়ে। সেইসঙ্গে গা গুলিয়ে ওঠা আকর্ষণ তার দুই উরু বেয়ে লি . লিকিয়ে উঠে এল পুরুষাঙ্গে।

সে রুণুর ওপর ঝুঁকে পড়ে তার দুই কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরে সামান্য ঝাঁকাল। "তোমার কে হয় সমীর ?"

রুণু হাল ছেড়ে দেওয়া ভঙ্গিতে পা দুটো সামান্য ফাঁক করে, হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে অভদ্রের মতো পড়ে রইল। "আমাকে এসব জিগ্যেস করবেন না···"

বুলু বলল, "কি ব্যাপার, হঠাৎ 'আপনি, আপনি' করতে লেগে গেলে···অ্যাঁ ?"

রুণু তেমনিই পড়ে রইল। অনারীসুলভ, বিচ্ছিরি ভঙ্গি। কিন্তু তার মধ্যে একধরনের অসহায়তা যেন ফুটে উঠল।. বুলুর এও মনে হল, রুণু যেন ভেতরে ভেতরে অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। তার বুকের ভেতর শুধু নয়, অস্তিত্বের গভীর থেকে উঠে আসছে এই নাভিশ্বাস। রুণু জড়ানো গলায় বলল, "খাতির তো তোমায় করতেই হবে ওস্তাদ, তুমি কিনা সমীরবাবুর বন্ধু" বলতে বলতে খিলখিল করে হেসে উঠল হাসিটার মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য নেই, এরকম মনে হল বুলুর। প্রায় পাগলের হাসির মতো অকারণ, যন্ত্রণার প্রকাশ। বুলু তার হাতের মুঠো দুটো আস্তে আস্তে আলগা করল। হাতের পেশীগুলো টনটন করছে। এমনকি কব্জির হাড়েও চোট লেগেছে। কেউ তাকে চাবকায়নি, এমনিই ধোলাই দিয়েছে, তবু সপাসপ চাবুকের শব্দ তার কানে বাজছে। কেউ যেন এখনও তাকে মেরে চলেছে, ডাইনে বাঁয়ে, বুকে, পাছায়, চোখের ওপর। চাবুকের তীব্র আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে : অথচ হাত দিয়ে যে নিজেকে আগলাবে, আত্মরক্ষা করবে, সে ক্ষমতাও নেই। রুণুর মতোই পড়ে আছে সে পচা মাছের মতো উদ্দেশ্যহীন, পরিত্যক্ত একটা প্রাণী, কারো কাছে কোনও মূল্যই যার নেই। মহেন্দ্রদার কাছে নেই, মোমের কাছে নেই, বাড়ির লোকের কাছে নেই, আর সমীর? সে রুণুর কাঁধ থেকে ধীরে হাত সরাল। সমীরকে ছকা দুঃসাধ্য। সমীরের কাছে সে আসতে চায়নি। দেখতেই চাইছে না। অথচ এও ঠিক যে সমীরকে সে জানতে চায়, যদিও, এতদিন এমনকি নিজের কাছেও সেটা মানেনি, বা ঘটনাচক্রের এই দিকটার সঙ্গে মনে মনে মোকাবিলা করা বা এর মুখোমুখি হওয়া, এটা হয়ত এড়িয়েই গেছে। কোনও কঠিন দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মত। নিজের প্রতি দায়িত্ব। সে আস্তে আস্তে উঠে বসল। মুহূর্তের জন্য একেবারে ফাঁকা হয়ে যেতে অনুভব করল নিজেকে, তারপর হঠাৎ তার মাথার ভেতরটাতে বন্ধ খাঁচায় পাখীদের ঝটপটানির মত এক ঝাঁক উত্তেজিত, চঞ্চল চিন্তা উড়ে বেড়াতে লাগল, ঠোঁট ঠুকতে লাগল বেরোবার

জন্য। মনে আছে, অনেককাল আগে, সে আর মোম গড়িয়াহাটের কাছে একটা রেস্তোরাঁয় বসেছিল, তাদের টেবিলের ঠিক পেছনেই দেয়ালজোড়া একটা আয়না। কথা বলতে বলতে মোমের দৃষ্টি বার বার সেদিকে চলে যাচ্ছিল, একেক সময় মনে হচ্ছিল, বুলুর কথা সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না, দেখতেও পাচ্ছে না তাকে। বুলুকে পাশ কাটিয়ে সে অন্য কিছু দেখছে। কিন্তু সে যা দেখছে, তার দর্শন বুলু কোনওদিন পাবে না, খানিকটা যেন অভিমান ভরে মনে হচ্ছিল বুলুর। তবে, সেই দৃশ্য খুব বেশি দূরে বলে দেখতে পাবে না, তা যেন নয়, ঘাড় ঘোরালেই চোখে পড়তে পারে। কিন্তু সেই দেখা মোমের দেখার সঙ্গে মিলবে না। অবশেষে থাকতে না পেরে বুলু বলেছিল, "মোম তুমি কী দেখো?"

"নিজেকে" চোখ তুলে বলেছিল মোম। খাটে উঠে বসে মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে বুলু মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল। বেদনার তীব্রতার জন্য যে মুখ ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল তার চেতনায়, তা যেন আবার চোখের ভেতরের অন্ধকারে ফিরে আসছে, যেমনভাবে আর কখনও আসেনি। এমনকি মোম যখন তার সামনে বসে থেকেছে, তখনও বোধহয় সে এতো স্পষ্ট দেখতে পায়নি তার মুখের অনুপুঙ্খগুলো: চোখের ওপরে চওড়া হয়ে আসা ঘন ভুরু, কাজল টানা কালো চোখের ভাসা ভাসা দৃষ্টির অর্থ, ছোট্ট টিকোলো নাকের পাটায় বসানো নাকছাবিটা, কানের বাঁপাশের সেই তিল, এমনকি প্রত্যেকটা রোমকূপ যেন জ্বলজ্বল করছে তার সামনে। একটা গলা কানে ভেসে এল। "কি, কিছু ভুল বললাম?"

ঝুণুর এই প্রশ্নে বুলু মুখ ফিরিয়ে কয়েক পলক তার দিকে তাকিয়ে বলল, "অ্যাঁ? কি? না…"

"তাহলে ওরকম চুপ মেরে গেলে যে…"

বিছানার পাশের ছোটো টেবিলটার দিকে বুলুর চোখ পড়ে গেল। সে লক্ষ্য করল, সমীর সিগারেট দেশলাই ফেলে গেছে। অবশ্য ফেলে গেছে না রেখে গেছে বলা কঠিন। দ্বিতীয়টারই

সম্ভাবনা বেশি। হঠাৎ খেয়াল করল, সিগারেটের জন্য অনেকক্ষণ ধরেই শকশক করছে জিভ। নিজের প্যাকেট থেকে না খেয়ে সে হাত বাড়িয়ে সমীরের দামী বিলিতি প্যাকেটটা তুলে নিল। ফাইভ ফিফটি ফাইভ। একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর রুণুর দিকে জ্বলন্ত সিগারেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও এই ব্র্যাণ্ড বোধহয় চলবে তোমার..."

রুণু আবার খিলখিল করে সেই অদ্ভুত উদ্দেশ্যহীন ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। বুলুর কানে ভুতুড়ে ঠেকে হাসিটা।

"হাসছো যে?"

রুণু বলল, "কদিন আগে কোনও ব্র্যাণ্ডই চলতো না তো..."

"কদিন মানে?" বলতে বলতে বুলুর দৃষ্টি রুণুর বুকের দিকে চলে গেল। জামাটা তুলে দেওয়ায় খানিকটা অংশ বেরিয়ে আছে। মাংসপিণ্ড থলথল করছে। আবার সেই শয়তানের হাসিটা যেন বিকৃত উল্লাসে বাজছে বুলুব মধ্যে। যেন তাকে হিংস্রভাবে কিছু কেড়ে নিতে উস্কোচ্ছে। খানিকটা সুখ খাবলে নেয়ার জন্য খোঁচাচ্ছে। সে তার বাঁ হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে রুণুব একটা বুক থাবাল। অন্য হাতের দু আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেটটা ঝুলছে।

"কি হচ্ছে কি।" বলে রুণু গলার কাছে উঠিয়ে দেওয়া ব্লাউজ টেনে নামিয়ে নিল। "আমি বাপু পারবো না তোমার সঙ্গে..."

ব্লাউজ দিয়ে রুণুর বুক ঢাকার দৃশ্যটা বুলু নিস্পন্দ হয়ে দেখল। কোথায় যেন অস্পষ্ট রহস্যের ইঙ্গিত বা প্রতীক জড়িয়ে আছে এই ভঙ্গিমার মধ্যে। রুণুর মধ্যে যদি এতোই সঙ্কোচ তাহলে সে এতক্ষণ তার চোখের সামনে এরকম উন্মুক্তভাবে শুয়ে রইল কি করে? অনেক আগেই বুক দুটো ঢেকে নেওয়া স্বাভাবিক ছিল না কি?

আবার এও ঠিক, যে যখন সে ব্লাউজটা টেনে নামাল, ভীষণ জেনুইন, স্বাভাবিক ছিল তার বাধা দেওয়ার ভঙ্গি, এতটুকু নকল ভাব বা কৃত্রিমতা ছিল না তার মধ্যে।

রুণু হাত বাড়িয়ে বুলুর হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে ঠোঁটে দিল। লিপস্টিক উঠে গেছে, কিন্তু আংটি পরা আঙুলে নোখগুলো নিখুঁতভাবে রাঙানো। নেল পালিশের রঙটা ঠিক লাল নয়, গোলাপী, কিন্তু কোনও ক্যাটক্যাটে ভাব তাতে নেই। হাতের নরম সুডৌল ভাব দেখে বোঝাই যায়, রুণু বাসন মাজে না বা ঘর মোছে না, হাতের শ্রী ক্ষুণ্ণ হওয়ার মত কোনও কায়িক শ্রমের কাজ করে না বা করতে হয় না। অথচ তার সাজ, গলার সোনার চেন ও হাতের আংটি, দামী ব্যাগ জুতো সত্ত্বেও তাকে বড়ো ঘরের মেয়ে মনে হওয়া কঠিন। সেইসঙ্গে বলা চলে, তার অমার্জিত কথাবার্তা, শ্রীহীন শোওয়ার ভঙ্গি দেখেশুনেও এ কথা মনে হয় না, যে সে একেবারে নিম্নশ্রেণীর মেয়ে। এমনও হতে পারে, বুলু বা নীলিমার মতই মধ্যবিত্ত ঘর থেকে আসছে।

বুলু জিগ্যেস করল, “কী কী ঘরের কাজ জানো বল তো ?”

রুণু সিগারেটটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসল। “তুমি কি পাত্রী দেখতে এসেছো নাকি ? চল চল, রাত বেড়েছে, ঘুমিয়ে নাও। যা পেয়েছো, ঢের…”

বুলু খপ করে তার হাতটা ধরে কব্জির কাছটা মুচড়ে দিল। আবার সেই ক্রুদ্ধ সুখের বাসনা তার মধ্যে ফেনিয়ে উঠছে। দপদপ করছে কপালের শিরা। রুণুর শরীরটা খামচে, খাবলে রক্তাক্ত করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, যতোক্ষণ না সেটা সত্যি সত্যি যা, তাতে পরিণত হয় ; একটা ক্ষতবিক্ষত মাংসপিণ্ড।

রুণুর ঠোঁট দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ বেরলো “আঃ আহ্, আহ্, ছাড়ো ছাড়ো…”

বুলু হাত না ছেড়েই তার চোখের দিকে তাকাল, “তুমি সমীরকে কী করে চিনলে ?”

রুণু তার চোখে চোখ রাখল। "তুমি চিনলে কী করে?"

দুজনের চোখাচোখি হয়ে গেল। কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বুলু আস্তে আস্তে রুণুর হাত ছেড়ে দিল। দৃষ্টি বিনিময়ের মুহূর্তে কী একটা অকথিত অদৃশ্য বোঝাপড়া যেন হতে চলেছিল, যদিও সেটা কী ধরনের, সে ঠিক বুঝল না। হয়ত অস্পষ্টভাবে তার মনে পড়ে গেল, সমাজের চোখে সে হল ওয়ার্ড নম্বর পনেরোর প্রাক্তন বাসিন্দা। রুণুকে ঘেন্না করার তার অধিকার কোথায়? তবে এরকম অনুভূতি হতে রুণুর প্রতি সদয় হওয়ার বদলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হল। একটা অন্ধ, ক্রুদ্ধ আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে হাতের এক ঝটকায় রুণুর ব্লাউজে টান দিল। ফ্যাঁচ করে ছিঁড়ে গেল সেটা। বুকের একটা দিক বেরিয়ে পড়ে প্যাট প্যাট করে বুলুর দিকে যেন চেয়ে রইল। এবার মনে হল, রুণু সত্যিই রেগে গেছে। ধড়মড় করে উঠে বসে তাড়াতাড়ি গায়ে আঁচল জড়িয়ে নিল। নাকের পাটা আর ঠোঁট অল্প অল্প কাঁপছে। চোখ দুটো জ্বলছে। আরেকটু হলেই যেন জল এসে যাবে রাগে। তবে বুলুর মনে হল, এই রাগের কারণ শুধুমাত্র সে নয়। আরও কিছু আছে। বুলু উপলক্ষ মাত্র, কারণ এতোক্ষণ বুলু যা কিছু করেছে, মুখে রাগ দেখালেও রুণু যেন ভেতরে ভেতরে মেনে নিচ্ছিল। এমনকি, যখন সে তার হাত মুচড়ে দিয়েছিল, তখনও। হয়ত বুলু রুণুর ভেতরের কোনও গোপন ক্ষত খুঁচিয়ে ফেলেছে।

রুণু আঁচলটা আরও ভাল করে জড়িয়ে খাট থেকে সরে উঠে দাঁড়াল। "তোমার মত অসভ্য রাস্কেল আর দুটো দেখিনি। আমি চললাম, সমীরবাবুকে বলে দিচ্ছি আর কোনওদিন যদি এ তল্লাটে পা দিয়েছি, নাম ফিরিয়ে নাম রাখব।" বলতে বলতে সামান্য নিচু হয়ে ব্যাগ খুঁজতে লাগল। "আমি তোমায় দেখে নিয়ে ছাড়ব, জংলী কোথাকার।"

খোলা চুল দু হাতে জড়িয়ে হাতখোঁপা করে নিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে রুণু আপন মনেই যেন

বিড়বিড় করতে লাগল "কী একটা মাল। বাইরে নিশ্চয়ই ভদ্রলোক কাউকে পাবো, আমায় হেল্প করবে…"

বুলু এক পা এগিয়ে এল। আবার সেই শয়তানের হাসিটা তার ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছে। ক্রুদ্ধ সুখের আকাঙ্ক্ষা নোখহীন থাবার মত আঁচড়াচ্ছে। চোখেমুখে হিংস্র আক্রোশ। রুণু ভাবল, বুলু বোধহয় তার গলা টিপে দিতে আসছে। সে সামান্য পিছিয়ে চ্যাচাল। "গায়ে হাত দেবে না বলছি।"

"আহা, ন্যাকামি। এতোক্ষণ কি করছিলাম…" দাঁতে দাঁত চেপে বলল বুলু।

রুণু চুপ করে রইল। ভেতরে ভেতরে তার কী অনুভূতি হচ্ছে, বা কী মনে হচ্ছে কিছুই বোঝা গেল না। হয়ত সে সত্যি সত্যিই ভয় পেয়েছে, অথবা উত্তর দেওয়ার মুখ নেই। তার নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে বুলুর ইচ্ছে হল, তাকে ঝাঁকিয়ে কিংবা গলায় আঙুল দিয়ে দিয়ে কথা বের করে নেয়, যেমনভাবে বমি করায় লোককে। কিন্তু সে এসব কিছুই করতে গেল না, নিজেও কেমন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে আছে। রুণু দরজার দিকে পা বাড়াতে বুলু দু পা ফাঁক করে পথ আটকে দাঁড়াল।

রুণু ক্লান্তভাবে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। "তুমি কি চাও কী?"

বুলু মাথা চুলকোল। সে জানে না সে কি চায়। মুখখানা লালচে হয়ে আছে নাম না জানা আক্রোশে। সে সরছে না, দরজার সামনে দাঁড়িয়েই আছে, নিজের জটিল মিশ্র অনুভূতিরাজির জালে নিজেই বন্দী হয়ে। সে কী চেয়েছিল সে জানে না। হয়ত সে চেয়েছিল রুণু একবার, আলতো করে তার কপালে হাত বুলিয়ে দেবে…।

হঠাৎ ড্রেসিং টেবিলটা বুলুর চোখে পড়ে গেল। আয়নায় দুটো অসহায় ছায়ামূর্তির ছবি। চোখ সরিয়ে নিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর সে বলল, "চটিটা পরে নাও। তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।"

॥ ২০ ॥

ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস দিয়ে খানিকটা এগোলে বাঁ দিকে একটা সরু গলি লক্ষ্য করা যায়। দুপাশে পুরনো বাড়ি, এখন সেগুলো অসংখ্য ছোটো ছোটো কামরায় ভাগ করে অফিস হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়। খুব নামী বা বড়ো কোনও কোম্পানীর অফিস এইসব কামরায় বসে না, অধিকাংশই এমন সব ব্যবসার ঘাঁটি, যেখানে অফিসিয়াল কাজকর্ম বা পেপার ওয়ার্ক যথাসম্ভব কম। যেমন, চা ইত্যাদির এজেন্সি, ট্রান্সপোর্ট, লিয়াঁজো, নানান রকম ব্রোকারি, এইসব। আজ থেকে বছর দশেক আগে এসব দিকে মেয়েরা আসতো না বললেই চলে ; এই জগতে তাদের কোনও ভূমিকা ছিল না। এখন সবরকম চাকরিই করছে মেয়েরা, তবু এখনও, এইরকম গলি দিয়ে কোনও সুশ্রী, সুসজ্জিত মহিলা হেঁটে গেলে লোকেরা তাকিয়ে দেখে।

যদিও রুণুকে প্রায় কখনই হেঁটে যেতে হয়নি এখান দিয়ে, অধিকাংশ দিনই ট্যাক্সিতে এসেছে, তবু তার ভাবতে ভাল লাগল, এমন একটা দিন আসবে, যখন সে আর এখানে আসবে না, আসতে হবে না। ট্যাক্সিটা বাঁক নিতে হাতল ঘুরিয়ে জানলার কাঁচটা সামান্য নামাল। বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। মেঘলা আকাশ। রাস্তাগুলো ভেজা, কাদা প্যাচপ্যাচে হয়ে আছে। রুণুর মনটাও আজ আকাশের মতোই থমথমে, ছায়াচ্ছন্ন। তবে, তার পেছনে যে নির্দিষ্ট কোনও কারণ আছে, তা নয়। কারণ নেই, আবার আছেও, অনেক কারণ, যা একেক দিন তার ভেতরটা এরকম ভারি করে তোলে। তখন সে মনে মনে ঠিক করে নাহ্, আর নয়। কিন্তু যা ঠিক করে তা করে উঠতে পারে না। কিন্তু কেন পারে না ? কোনও পথই কি তার সামনে নেই ? সমীরবাবুর সূত্রে কত লোকের সঙ্গেই তো জানাশোনা হয়েছে তার, তাদের মধ্যে কেউ কি সামান্য একটা

কাজ যোগাড় করে দিত না? অন্তত মহেন্দ্রবাবু তো দিতেনই। কতবার আলবামার ঘরে বসে সৎ সুস্থ সমাজ সম্পর্কে কী সব বক্তৃতা দিয়ে কান ঝালাপালা করেছেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে বসার কথা ভাবতেই গায়ে জ্বর আসে। মদ-টদ অবশ্য খান না. একের পর এক সিগারেট টানবেন, আর প্রচুর বকে যাবেন। অন্য কারও কথা শোনায় মন নেই। কিন্তু ঘরে যখন অন্য কেউ থাকে না, একসময় তার চোখের সাবধানী চালাক-চালাক চাওয়া সরে গিয়ে একটা অন্যরকম ভাব ফুটে ওঠে। তিনি স্থির দৃষ্টিতে রুণুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। "আমার কথা তোমার মনে হয়, কখনও?" জিগ্যেস করেন তিনি। রুণুর যেন কেমন ভয় ভয় করে। কী বলবে বুঝতে না পেরে সে উসখুস করে, তারপর এক সময় "হুঁ" এর মত একটা শব্দ করে। তখন মহেন্দ্রবাবুর হিমশীতল দৃষ্টি একটু যেন কেঁপে ওঠে। তিনি বলেন, "কখন কখন মনে হয়?" তখন রুণু ফ্যাসাদে পড়ে। চোখে মুখে যাতে কোনমতে বিরক্তির ভাব ফুটে না ওঠে, সেদিকে নজর রাখতে হয়।

বৃষ্টির ছাঁট গায়ে লাগতে রুণু আবার কাঁচ তুলে দিল। ঘন সবুজ ছোপ ছোপ সিন্‌থেটিক শাড়ি পরেছে, সামান্য ভিজে গেলেও ক্ষতি নেই। আজকাল সে দিন বুঝে শাড়ি পরে কিনা···। যেমন, বাদলার দিনে সিন্‌থেটিক, শীতে সিল্ক-টিল্ক, গরমে ভাল ভাল ছাপা শাড়ি। শাড়ির দিকে তার বড্ড নজর। পছন্দসই শাড়ি দেখলে মন ছুকছুক করে, কেনার জন্য। একবার হাতে পেলে সঙ্গে ব্লাউজ পেটিকোট চাই-ই। এসবের তো খরচ আছে। বেশি ভাল কিছু পরে আবার বাসে-ট্রামে ওঠা দায় হয়ে ওঠে। প্রতিদিন ট্যাক্সি ভাড়াই বেশ কিছু যায়। ট্যাক্সি বা এর ওর গাড়িতে যাতায়াত করে করে এমন হয়ে গেছে, বাসে উঠতে কেমন অস্বস্তি হয়। মনে হয় সবাই হাঁ করে দেখছে। আপাদমস্তক যেন বিচার করছে। এর মধ্যে কিছুটা হয়ত তার মনের ভুল বা কল্পনা, আবার কিছুটা সত্যিই হতে পারে। সুন্দরী না হোক, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী' লোকের চোখ টানে।

এখন আর সে আগের মত হাল্কাপায়ে হাঁটতে পারবে কিনা কে জানে, আগের মত বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে, অকারণ হাসিতে মশগুল হয়ে দোতলা বাসের প্রথম সিটে চেপে বেড়ানো, সে সব সে কবে হারিয়েছে।

সেই রুণু কি আর আছে? যে রুণু মায়ের বেঁধে দেওয়া দুবেণী গরমের জন্য কানের দু'পাশে শিঙের মত তুলে পেছন থেকে এসে বাবার চোখ টিপে ধরত। দশমীর দিন দিদুর মুখে জোর করে মিষ্টি ঠুসে দিত। পাড়ার পুজোমণ্ডপে সে, শিখা, বীণা ঠাকুর দেখতে বেরত, ছেলেরা তাদের পিছু নিত, আর তারা, ইচ্ছে ঝিকিমিকি ভাব সত্ত্বেও ভান করত বিরক্ত হচ্ছে। সেই রুণু আর বেঁচে নেই··· সেই রুণু···। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। আজকাল বাড়ি গেলে বাপের চোখের দিকে তাকাতে কেমন কেমন লাগে। প্রায় যেন প্রায়শ্চিত্তের মত, হাতে করে দামী উপহার নিয়ে যায়। মিষ্টির বাক্স কিংবা বাবার জন্য ধুতি, মায়ের গায়ের চাদরই শুধু নয়, আরও নানান ধরনের টুকিটাকি জিনিস, যেমন দামী চুরুট বা সেণ্ট যা হয়ত তার নবলব্ধ শৌখিনতার প্রতীক, যদিও সে সচেতনভাবে কখনও এভাবে ভেবে দেখেনি এসব উপহারের মানে বা তাৎপর্য। বাবার দিকে ভাল করে না তাকিয়েই সোজা রান্নাঘরে ঢুকে যায়। মা বা বিল্টু মোটেও অখুশি হয় না। তারা জানে, সে বড় চাকরি করছে; যদিও তার আলাদা বাসায় থাকা নিয়ে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয় বাড়ির লোককে। আরও একটা নিঃশ্বাস ফেলে রুণু ট্যাক্সির মিটারের দিকে তাকাল। মহেন্দ্রবাবু নয় কোনও মতে চাকরি-বাকরি কিছু একটা জুটিয়ে দিলেন তাকে। সে চাকরিতে কি তার খরচ উঠবে? এমন কি চলা-ফেরার খরচটুকুও? টিকবে মন? খাটনিতে পোষাবে? মিটার থেকে চোখ ফিরিয়ে উইণ্ডস্ক্রীনের দিকে চোখ ফেরাল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি প্রশ্ন চিহ্নের মত ধীরে গড়িয়ে পড়ছে কাঁচ বেয়ে। প্রশ্ন চিহ্ন, নাকি কোনও অজানা শক্তির চোখের জল? নিজেকে মনে মনে তার ছেলেবেলার সেই পুতুলটার সঙ্গে

তুলনা করল সে। অনেক বছর যত্ন করে কাঁচের আলমারিতে তোলা ছিল, একদিন বিল্টু পুতুলটাকে টেনে হিঁচড়ে মাটিতে ঘষটে ছিন্নভিন্ন করে দিল। হাত পায়ের স্প্রিং, স্ক্রু, ভেতরে ঠুসে দেওয়া স্পঞ্জ ও কাপড়ের টুকরো, বেরিয়ে পড়ায় 'এ কী রকম খেলা তোর।' বলে রুণু ছুটে এসে দেখে, পুতুলটার ভেতর ছোট্ট দলার মত কী একটা আটকে আছে: স্প্রিংগুলোতে গোঙানির মত মৃদু ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ, কিন্তু মুখখানা? তখনও যেইকে সেই। নকল হাসি টানা ফুলো ফুলো গোলাপী ঠোঁট, লম্বা পলকের চোখ, যা কোনদিন জলে ভরে আসবে না।

সাপের মত এঁকেবেঁকে হর্ন দিতে দিতে এগোচ্ছে ট্যাক্সিটা মিটুকো ট্র্যাভেলস-এর সামনে এসে দাঁড়াতে রুণু শাড়িটা সামান্য তুলে কাদা চ্যাপচ্যাপে ফুটপাথে সাবধানে পা দিল। তার পায়ে সবুজ রঙের স্ট্র্যাপ দেওয়া হিল তোলা চটি খুব বেশি পুরনো নয়, আবার আনকোরা নতুনও বলা চলে না। বাঁচিয়ে ব্যবহার করে, যদিও প্রত্যেক শাড়ির সঙ্গে "ম্যাচ" করে পরার মত এরকম চারখানা চটি আছে তার আলনার নিচে; কালো, লাল, বাদামী ঘেঁষা মেরুন। হিল তোলা সাদা স্লিপারটা গেছে ছিঁড়ে। এসব ছাড়াও সবুজ চটি কেনার কারণ হল, তার অনেকগুলো শাড়িতেই কোনও না কোনও-ভাবে সবুজ রংটা আছে, কোথাও পাড়ে, কোথাও বা বুটিতে বা প্রিন্টে। তার মানে যে সবুজ তার প্রিয় রং তা কিন্তু নয়, নেহাত-ই কাকতালীয় এটা, কারণ তার প্রিয় রং হল লাল বা লালের কাছাকাছি রংগুলো, যা তাকে রক্তের কথা, আগুনের কথা, সিঁদুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। সিঁদুরের অনুষঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তপনের হাত কাটার ছবিটা চোখে ভাসে। যতই চেষ্টা করুক এটা সে এড়াতে পারে না। ব্লেড দিয়ে নিজের আঙুলের ডগা চিরে তার সিঁথেয় রক্তের রেখা টেনে দিয়েছিল তপন। তখন কি রুণু বুঝেছিল সবই নাটক? নিজেকে এমন কষ্ট দিয়ে কি নাটক করা যায়? কেনই বা করেছিল? শ্বাস টানার মত করে একটা নিঃশ্বাস নিতে নিতে রুণু মিটকো

ট্র্যাভেল্‌স-এর প্রবেশ পথের দিকে এক পা এক পা করে, যথাসম্ভব কাদার ছিটে এড়িয়ে এগোতে লাগল। অনেককাল আগে এরকম বৃষ্টির দিনে মাসির বাড়ি থেকে তাকে পৌঁছে দিয়েছিল তপন। পথে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। বৃষ্টি আর হাওয়ার তেজে গাছটা এদিক ওদিক মাথা ঝাঁকাচ্ছিল। যতদূর চোখ যায়. কেউ কোথাও নেই, বৃষ্টির ঝাপটায় ধোঁওয়া ধোঁওয়া হয়ে আছে চারদিক। তারা পরস্পরের ঠোঁটের দিকে লুব্ধভাবে তাকিয়েছিল। কয়েক পলক মাত্র পরক্ষণেই হাওয়ায় সরে আসা আঁচলটা নিজের হাতে রুণুর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল তপন। একটা খালি ট্যাক্সি ধীরে হর্ন দিতে দিতে যাচ্ছিল, সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই তপন ছুটে গিয়ে সেটা থামাল। "তুমি যা ভিজেছ—জ্বর-জ্বালা না বেধে বসে" ট্যাক্সিতে উঠে রুণুর দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলেছিল তপন। "এই নাও মাথাটা মোছো", বলে রুমাল এগিয়ে দিল। বৃষ্টির মধ্যে তপনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ভিজতে তীব্রভাবে ভাল লাগছিল রুণুর। এত তাড়াতাড়ি সেই প্রবল সুখের মুহূর্তটা তপন শেষ করে দিল? বেশ অভিমান ভরেই সে চোখ তুলে তাকিয়েছিল। "আহা তুমিও তো ভিজেছ··"

মুখে পুরুষালি গাম্ভীর্যের ভাব ফুটিয়ে তপন বলেছিল "ছেলেদের কথা আলাদা," তারপর সিগারেটে টান দিতে দিতে ঠোঁটের কোণে অর্থপূর্ণ হাসি নিয়ে চোখ বুলিয়েছিল ভেজা শাড়ির নিচে রুণুর শরীরের স্পষ্ট হয়ে ওঠা রেখাগুলোয়। তাকে জাপটে ধরেনি, গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করেনি, ঠোঁটে চুমু পর্যন্ত খায়নি ট্যাক্সিতে যেতে যেতে, শুধু হাতে সামান্য চাপ দিয়েছিল। এতে রুণু নিরাশ হয়েছিল ঠিকই, কারণ তপনের পাতলা ঠোঁট দুটো পাগলের মত টান ছিল তাকে, প্রায় যেন মনে হচ্ছিল তেষ্টা পেয়েছে ওই ঠোঁটদুটোর জন্য, আবার সেই সঙ্গে সে ইম্‌প্রেসড না হয়ে পারল না। তার প্রতি কি রকম একটা সৌজন্যের ভাব অনুভব করল তপনের মধ্যে, যেন তপন তাকে শ্রদ্ধা করে। ধীরে ধীরে, স্বেচ্ছায়, নিজের কিছুই

বাকি না রেখে তপনের কাছে 'আত্মসমর্পণ করেছিল রুণু। তপনকে তার উঁচু মনে হত, আদর্শ মনে হত। তখনও বোঝেনি প্রেম হচ্ছে সেই রঙিন আয়না যাতে জানোয়ারকেও দেবতা মনে হয়। তখনও বোঝেনি, এই প্রতিটি ব্যবহার তপন তার বিশ্বাস অর্জন করার জন্য করেছে মেপে-জুপে, সচেতন ও ইচ্ছাকৃতভাবে। তপনের কাছে এটা ছিল একটা খেলা। এসব বোঝেনি বলেই, তপন যখন তাকে অমন ভয়ানক বিপদে ফেলে তাকে অস্বীকার করল, পৃথিবীর প্রতি শুধু নয়, নিজের জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল সে। মিটকো ট্র্যাভেল্‌স-এর দরজা ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে সে আপন মনে মাথা ঝাঁকাল। তখনও সারল্য ছিল, বিস্ময় ছিল, ছিল প্রথম যৌবন। যা কিছু উঁচু, মহৎ, পবিত্র, তা-ই তার ভেতরটাকে পাতার মত তির-তির করে কাঁপাত। মমতা, সহানুভূতি, পারিবারিক স্নেহ মমতা বিশ্বাসের আভাস মাত্র পেলেও এত তীব্র প্রতিক্রিয়া হত যে জল এসে যেত চোখে।

ঠোঁটের কোণে কৃত্রিম হাসির ভাব ফুটিয়ে রুণু অফিসে পা দিল। অফিস বলতে একটা ন্যাড়া ঘর, কোণের টেবিলে ব্রজবাবু খটাখট শব্দে আপন মনে কী যে টাইপ করে চলেছেন! সামনে রিসেপশন কাউণ্টারের মত একটা জায়গা সেখানে একটা সোফা, আর কিছু ঢপের স্লিপ রাখা আছে। কেউ যদি জিগ্যেস করে, এই অফিসে ঠিক কী ধরনের কাজ হয়, রুণু উত্তর দিতে পারবে না। কোনও অবচেতন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সে বুঝে গেছে, এসব জানার বিশেষ দরকার নেই, বস্তুত, না জানাই ভাল। অবশ্য, জানতে চাইলে যে সমীর-বাবু রাগ করবেন, কি বিরক্ত হবেন, তাও নয়। হয় ত হেসে উল্টে তাকেই প্রশ্ন করবেন, "বাহ্, এত দেখে শুনেও তুমি কাজ বুঝে নিতে পারলে না, আমাকে ইচ অ্যাণ্ড এভরি স্টেপে গাইড করতে হবে?" প্রধান অফিস, ঘরে ঢুকেই একটা শৌখিন দরজা চোখে পড়ে। দরজার কাঠের ফ্রেমের উপরের দিকে পুরু কালো কাঁচ বসানো হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, একটা 'এল' শেপের ঘর পার্টিশন করে নেওয়া

হয়েছে; রেনোভেটও করা হয়েছে খরচ করে। দরজার ওপিঠে কি আছে বোঝা না গেলেও দরজাটা নিজেই কেমন বেখাপ্পা আর দৃষ্টিকটু। রুণু অবশ্য এসব লক্ষ্য করেনি কোনদিন, আজই প্রথম মনে হল ঘরের চেহারার সঙ্গে ওটা বেমানান। সে হিল তোলা জুতোয় খটখট শব্দ তুলে দ্বিতীয় দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। ব্রজবাবু ছাড়াও এখানে আরও তিনজন কর্মচারী আছে। তাদের মধ্যে খোকন তালুকদারের বাইরে বাইরে কাজ; সমীরবাবুর সেক্রেটারি রমেন অধিকাংশ সময়ই তার হাতের কাছে থাকলেও তাকেও প্রায়ই বাইরে যেতে হয় জরুরী দরকারে যদিও 'দরকার'টা কী সে ব্যাপারেও রুণুর ধারণা নেই। ব্রজ ছাড়া অফিসে আরও একজন বসে বাইশ তেইশ বছরের মুসলমান ছেলে, সুলেমান, সে এখনও আসেনি। এদের মধ্যে কে ঠিক কী কাজ করে না জানালেও রুণুর আন্দাজ যে রমেন মণ্ডলই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। তার সঙ্গে সমীরবাবুর 'কনফিডেনশিয়াল' মিটিঙের বহর দেখে এই রকম ধারণা হয়েছে। আর রুণুর প্রিয় পাত্র কে যদি বলতে হয়, তাহলে সুলেমানের নামটাই আগে আসে। রুণুকে 'দিদি' 'দিদি' করে ডাকে, দারুণ ভক্ত তার, ছুটে ছুটে ট্যাক্সি ডেকে দেয়, তার অনুপস্থিতিতে কিছু ঘটলে তাকে আড়ালে ডেকে কী হয়েছে না হয়েছে সে সম্পর্কে তাকে ওয়াকিবহাল করে দেয়। এ ছাড়া, রুণুর মুখ থেকে কথা পড়লেই হল, সুলেমান তার হয়ে কিছু করার জন্য সদাই ব্যস্ত, হাসিমুখে। এমনকি, রুণু যেসব দিন একটানা বেশ কিছুক্ষণ অফিসে থাকে, সুলেমান একগাল হেসে তার জন্য শালপাতা করে আলুকাবলি এনে দেয়; সে জানে অফিসে লাঞ্চ হিসেবে যেসব বিরিয়ানী, মাংসের চাঁপ ইত্যাদি আনানো হয়, তার চেয়ে ওই আলুকাবলিটার প্রতিই রুণুর লোভ, যদিও খেতে খেতে ঝালে জিভ টানে আর লঙ্কার জন্য চোখে জল আসা সত্ত্বেও হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকে। এই সব মুহূর্তে তার মুখে এক ধরনের সারল্য লেগে থাকে, এখনও···। একদিন সুলেমান টিফিন

বাক্স করে আটার রুটি আর আলুভাজা নিয়ে এসেছিল, সমীরবাবুর আনানো, চাউমিন, চিলি চিকেন ফেলে রুণু তাই খেল তৃপ্তি করে। তাবপর নিজে হাতে টিফিন কৌটোটা ধুয়ে রাখতে রাখতে বলল, "তোর মায়ের হাতের তার আছে রে ঠিক যেন আমার মা-র করা আলুভাজা, শুধু মা করে কী, সঙ্গে দুটো কাঁচা লঙ্কা আর এক মুঠো পেঁয়াজ কুঁচি ছেড়ে দেয়।" রেস্তোরাঁর খাবার যাদের জন্য আনানো হয়, তারা বাইরের লোক। অর্থাৎ এই অফিসের পরিভাষায় 'ক্লায়েন্ট' যাদের বলা হয় তাদের অভিরুচি অনুযায়ী। রুণু আর রমেনবাবু ভোজ থেকে বাদ পড়ে না, সঙ্গে বোতলও চলে। সত্যি বলতে কী, যেদিন ক্লায়েন্ট আসে, সেইসব দিনই রুণুকে আসতে হয় এখানে। আব পাঁচটা লোকের মত দশটা পাঁচটার কাজ নয় তার।

বলা বোধহয় বাহুল্য, সামনের এই ন্যাড়া অফিস ঘরটায় 'ক্লায়েন্ট' বসানো হয় না। ব্যবসায় তাঁরাই লক্ষ্মী, একটু যত্নআত্তি একটু খাতির, হাতে ধরে এসব করতে হয় বইকি। সেইজন্যই কাচ আর কাঠের দরজার ওপিঠে একটি চেম্বার রয়েছে, রুণু দরজা ঠেলে এখানে ঢুকল। তার মাথায় অল্প অল্প বৃষ্টির ছিটে লেগেছে, কয়েক গাছা চুল এসে পড়েছে কপালে। মনটা খারাপ থাকায় মুখে একটা ছায়া পড়েছে যেন; কিন্তু তাতে মন্দ দেখাচ্ছে না তাকে। শ্যামলা ত্বকে গাঢ় বাদামী চোখের চাওয়ায় বরং বেশ মানিয়েই গেছে বিষাদের ভাবটা। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পড়ে কপালে এসে পড়া চুলগুলো কানের পিঠে সরাল। আজ সে মন ঠিক করে এসেছে। আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নেবে এখান থেকে। সমীরবাবুর এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি আছে, অন্তত তার ব্যাপারে, এটা রুণু মনে মনে টের পায়। কী করতে তার ঠিক ভাল লাগছে না, বা মন সায় দিচ্ছে না, এটা যেন তিনি ধরতে পারেন; আব বুঝে ফেলা মাত্র নানান রকম টুকিটাকি সুবিধে দেন। যেমন, একদিন হয়ত একটা ডব্লিউ বি ওয়াই গাড়ি তাকে সারাদিনের জন্য ছেড়ে দিলেন—সেদিনের মত যা ইচ্ছে করতে পারে গাড়ি নিয়ে, ইচ্ছে করলে নিজের মায়ের ব্যবহারেও লাগাতে পারে, কিংবা কিশ

মাইল ঠেঙিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারে। রুণু আজকাল বিউটি পার্লার যাওয়া ধরেছে, সমীরবাবুর বন্ধুর পার্লার, তাকে সেখানে পয়সা দিতে হয় না, মাসের শেষে সমীরবাবুর লোক বিল মিটিয়ে দেয়। এইরকম নানারকম সুবিধে, যাতে রুণু অভ্যস্ত হয়ে গেছে। যেমন মদ খাওয়ার অভ্যেসটা। এটা সে আজও এড়াতে চেষ্টা করে, কারণ সে বোঝে ড্রিঙ্ক করলেই সে কীরকম যেন হয়ে যায়। সমীরবাবু এবং এমন কি তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের হাতের মধ্যে চলে যায়। এ ব্যাপারে সমীরবাবু তাকে কোন দিন জোর করেছেন সে কথা বলা যায় না। কিন্তু 'সাজেস্ট' করার এমন একটা পরোক্ষ ধরন আছে তাঁর যে এড়িয়ে যাওয়া যায় না, কিংবা কঠিন হয় এড়ানো। আগে রুণুর বিশ্রী লাগত এই সব পানীয়, সে জিনই হোক, বা হুইস্কি। ফলের রস, শরবত, কোকোকোলা, মদের পাত্রে যাই-ই মিশিয়ে দিক না কেন, বিষ বিষই থেকে যায়, তেতো ভাবই জিভে লেগে থাকত, মুখ বিকৃত করে কোনমতে চোঁ করে একটা চুমুক দিয়েই পোটেটো চিপস চিবোতো। আজকাল লক্ষ্য করেছে, নিজে থেকেই ড্রিঙ্ক করতে ইচ্ছে হয় তার। বেশ লাগে, সারা শরীরে একটা আলগা আলগা ভাব, পৃথিবীটাকে ঝাপসা, কিন্তু সহজ মনে হয়।

বস্তুত, এখন এমন দাঁড়িয়ে গেছে, মদ ছাড়া ফাঁকা ফাঁকা লাগে, রাতে ঘুম আসতে চায় না, ছায়ার মতো কতোগুলো চরিত্র চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে, ছিটকিনি তুলে দেওয়া সত্ত্বেও মনে হয়, এটাই আশ্চর্য যে কেউ পেছন থেকে এসে গলা চেপে ধরছে না। মাথার ওপর, অর্থাৎ ওপরতলার মেঝেতে ইঁদুর ঘুর ঘুর করছে, সেই শব্দ কানে আসে। এছাড়া গভীর রাতে কোন আওয়াজ নেই। চারদিক এতো নিশ্চুপ যে সেই স্তব্ধতা জলপ্রপাতের মত কানে বাজতে থাকে।

কার্পেটের ওপর দিয়ে জুতো পায়ে এগিয়ে এল। কামরাটা খুব বড় না, হলেও এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে প্রতিটি ইঞ্চি ব্যবহার

করা যায় ফল্স্ সিলিং করে, দোতলা প্ল্যাটফর্ম করা হয়েছে। দেওয়ালের সঙ্গে, লাগান টেবিল, যা রেলের বাঙ্কের মত। তুলে দেওয়া যায়। এ মাথা ও মাথা কার্পেট, ডিভান, সোফা ইত্যাদির জন্য ঠিক অফিস ঘরের চেহারা নয় কামরাটার। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এয়ার কণ্ডিশনারের মৃদু শব্দ কানে আসে। ঘরে কোনও জানালা নেই বলে ওপরে একজাস্ট ফ্যান ঘুরছে। সমীরবাবু রমেন মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, "কী হল, রমেন, থেমে গেলে?" বলে রুণু এগিয়ে আসতে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরে বৃষ্টি পড়ছে বুঝি?" রুণু ব্যাগটা সোফার ওপর রাখতে রাখতে বলল, "কেন, আপনি কখন এসেছেন?"

সে চুলগুলো হাতে জড়িয়ে হাতখোঁপা করল। ভোর রাত থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে আজ। সমীরবাবু যখনই বেরিয়ে থাকুন, নিশ্চয়ই দেখেছেন বৃষ্টি পড়ছে। আসলে খেজুরে আলাপ করে করে অভ্যেস হয়ে গেছে লোকটার। যাই হোক, মালিকসুলভ ভাব দেখাবার চেয়ে তো ভাল। রুণু ব্যাগ থেকে চিরুনি আর কমপ্যাক্ট বের করল। "আমি একটু টয়লেট থেকে আসছি, কেমন? আপনারা বলুন না, কথা বলুন" রমেন মণ্ডল মুখ খোলার আগেই সমীরবাবু বললেন, "আমাদের কাজ শেষ, আজকের মত।"

চুল আঁচড়ে, মুখে আলতো করে পাউডারের পাফ বুলিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে রুণু দেখল, ঘরে কেউ নেই। সে সোফায় এসে বসল। অ্যাশট্রেতে একটা জলন্ত সিগারেট কোনাকুনি রাখা আছে। তার মানে সমীরবাবু নিশ্চয়ই এক্ষুনি আসবেন, হয়ত পাশের ঘরে গেছেন। দেওয়াল ঘড়ির টিক টিক শব্দ কানে আসছে। পাশেই টিপয়ে কিছু কাগজপত্র ছড়ান। এর মধ্যে থেকে রুণু অন্যমনস্কভাবে একটা বই তুলে নিল। প্রথম পাতা খুলেই বুঝল, বই নয়, ডায়েরী। সমীরবাবুর হাতের লেখায় হিসেবপত্র করা আছে। এটা দেখা যে ঠিক নয়, সে ভালই জানে, তবু সমীরবাবুর স্বাক্ষরিত একটি মেয়ের নাম, এবং তার পাশে লিখে রাখা মোটা টাকার অঙ্কে তার চোখ

আটকে গেল। নামটা চেনা চেনা লাগছিল, যদিও, কখন, কোথায় শুনেছে, তক্ষুনি মনে করতে পারল না। কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল মনে না করতে পেরে। ডায়েরীটা যেখানে ছিল, সেখানেই রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি খবরের কাগজটা তুলে মুখের সামনে মেলে ধরেছে, এই সময় সমীরবাবু দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। সমীরের চেহারা দেখে তার সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা কঠিন। তার জামা-কাপড় অতি সাধারণ, চোখে কম পাওয়ারের কালো ফ্রেমের চশমা, বেশ লম্বা, পেটানো শরীর। সে কলেজের অধ্যাপকও হতে পারে, আবার পুলিসে কাজ বা কোন ধরনের দালালি করলেও, আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সবই ওই চেহারায় মানিয়ে যায়। শুধু একটা জায়গায় খটকা। সে যখন হাসে, মুখে এক ধরনের নিষ্ঠুর স্থূলতা ফুটে ওঠে যা তার শক্তপোক্ত অথচ রোগা চেহারার সঙ্গে খানিকটা বেমানান। ফাঁকা ফাঁকা দাঁতে সিগারেট আর দোক্তার ছোপ। ঠোঁট খুললেই মাড়ি দেখা যায় বলে কেমন যেন মনে হয় হাসির বদলে জিভ বের করে হ্যা হ্যা করে হাঁপাচ্ছে। অথচ কেন যে এরকম মনে হয়, ঠিক বোঝা যায় না, কারণ, কারণে অকারণে হেসে ওঠার লোক সে নয়, কমই হাসে তাও উচ্চস্বরে প্রায় কখনই না, বেশ সংযত ব্যবহার। একটা সিগারেট ঠোঁটে দিয়ে সেটা লাইটার দিয়ে ধরাতে না ধরাতেই অ্যাশট্রেতে রেখে যাওয়া জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে চোখ পড়ে গেল সমীরের। সেটার দিকে তাকিয়ে সে আক্ষেপসূচক 'ওহ্ হো' শব্দ করল। আক্ষেপটা ফেলে যাওয়া সিগারেটের চেয়ে নিজের অন্যমনস্কতার জন্য। আর যাই হোক খামখেয়ালী বা আলাভোলা তাকে বলা যায় না। সাধারণত ছোটখাট ব্যাপারে সমীর প্রখর নজর রাখে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খানিকটা জন্মগত হলেও সে সচেতনভাবে বাড়িয়েছে, অর্থাৎ. নিজেকে এভাবে তৈরি করেছে।

সিগারেট ঠোঁটে ধরা অবস্থায়ই সমীর দাঁতের ফাঁকে চেপে চেপে বলল, "কী ব্যাপার, রুণু?"

"কেন ?"

"বুলু রাতে বাড়ি ফিরে গেল ..." বলতে বলতে সমীর দাঁতের ফাঁকে চেপে চেপে সিগারেটে টান দিতে লাগল "তোমাকে কী বলেছিলাম, কি ?"

সমীরের গলায় চাপা উত্তেজনা আর টেনশন অনুভব করল রুণু। এমনটা সাধারণত হয় না। যাই ঘটুক সাধারণত তাঁর সংযত ভাবটা টলে না। এমনকি, দু-একবার যখন এমন হয়েছে, যে রুণু কাজ ছেড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত করেছে, তখনও সমীর সেটা বজায় রেখেছে। রুণু নোখ খুঁটতে লাগল। মুখে অন্যমনস্ক, অথচ চিন্তান্বিত ভাব। শুধু শুধু যে সমীরবাবু তাকে এত সুযোগ-সুবিধে দেন না, তা সে জানে। তার জায়গায় অন্য যে কোনও সুশ্রী স্মার্ট মেয়েকে দিয়ে যদি কাজ চলত, তাহলে এত তোয়াজে তাকে রাখা হতো কি ? মহেন্দ্রবাবুর যদি তার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা না থাকত ···রুণু মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল। মহেন্দ্রবাবুর বিবর্ণ পাথুরে মুখটা মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠল। লোকে বলে, কোনও কিছু দিয়েই দু-নম্বরি করানো যায় না মহেন্দ্র বর্মণকে দিয়ে। মদ সিগারেট ছোন না, বিয়ে পর্যন্ত করেননি। ইলেকশনে দাঁড়িয়ে হোম মিনিস্টার হয়েছেন ঠিকই, কূটনীতিতে পটু, সাবধানী, সতর্ক, কিন্তু তাঁর সততায় বা আদর্শবাদে কেউ নাকি ফাটল ধরাতে পারেনি। এখনও ঘন ঘন রাস্তার ধারে মিটিং ডাকেন, পার্টির ছেলেদের সঙ্গে একেবারে ভাইএর মত ব্যবহার করেন, গায়ে সবসময় খদ্দর, কতো মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী বিপদে পড়ে গেছে তাঁকে ভেট পাঠাতে গিয়ে। অথচ এক সামান্য সমীর ঘোষকে তিনি পারমিট দিচ্ছেন : হংকং সিঙ্গাপুর ব্যাঙ্কক থেকে মিটকোর যাই আসুক না কেন, পুলিস বা কাস্টমস তাতে হাত দেয় না।

রুণু বলল, "চলে গেলেন বাড়ি ··আমি তার কী করব ?"

সমীর দেওয়ালের ক্যাবিনেট খুলে একটা বোতল বের করছিল, অধৈর্যভাবে বলল, "কী বলছে কি, ও ?"

"উনি আর কী বলবেন ?"

"কী চাল চেলেচে বলো তো, ছোকরাকে হঠাৎ 'উনি' 'উনি' করতে লেগেছো, অ্যাঁ ?" বলতে বলতে সমীর বোতল হাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। চোখ দিয়ে যেন সোফার সঙ্গে বিঁধিয়ে দিচ্ছে রুণুকে। ক্যাবিনেট থেকে দুটো গেলাস বার করে স্কচ হুইস্কি ঢালতে লাগল।

রুণু হাত তুলল, "আমি আজ খাবো না ··"

সমীর তার দিকে একবার তাকিয়ে দুটো গেলাসেই হুইস্কি ঢালল। একটায় জল দিয়ে গেলাস ঠোঁটে দিল, অন্যটা যেমন ছিল, পড়ে রইল। সে জানে রুণু এক সময় ওটা চাইবে, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

রুণু কপালের দু-পাশের শিরায় দু-আঙুল দিয়ে সামান্য চাপ দিল। সমস্ত মাথাটা ভারি হয়ে আছে। শিরাগুলো টিপটিপ করছে। অফিসের দেওয়ালগুলো চারপাশ থেকে যেন চেপে বসছে তার শরীরে। তার চিৎকার করতে ইচ্ছে হল। প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হল, যদিও, কিসের বিরুদ্ধে সে নিজে জানে না। তরল সোনার মত গেলাসে টলটল করছে হুইস্কিটা, খানিকটা ঢক করে গিলে নিলেই হল, ব্যাস কিছুক্ষণের জন্য শান্তি···। গেলাসটার থেকে সে চোখ সরিয়ে নিয়েছে, এই সময়, হঠাৎ অদ্ভুতভাবে মনে পড়ে গেল ডায়েরীতে দেখা নামটা কার মুখে শুনেছে। বিচারবুদ্ধি খাটাবার আগেই, নিজের অজান্তে, তার মুখ দিয়ে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে এল : "মোম কে ?"

সমীর ঝট করে চোখ তুলে তাকাল। চোখ দুটো লালচে দেখাল, নেশায় নয়, রাগে। চোখ সরু করে রাগে প্রায় কাঁপছে এরকম গলায় বলল, "বালিগঞ্জে ফ্ল্যাটে থাকো, যেতে পারবে আবার সেই দর্জিপাড়ার ঘরে ?" কথাটা শেষ হতে না হতেই এক চুমুকে গেলাস খালি করল। "আমার একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। তোমার আজ কাজ নেই। চলে যাও।"

অফিস থেকে বেরিয়ে সমীর হু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে লাগল। মেজাজটা একেবারে বিগড়ে গেছে। পেটে বেশ খিদে, এক পেগ হুইস্কি খেয়েই মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সেই অবস্থায়, কাদা প্যাচপ্যাচে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মোমের মুখখানা চোখে ভেসে উঠল। সে শিউরে উঠল। কি কুৎসিত, বিকৃত হয়ে গেছে মুখখানা, প্রায় যেন গলিত। এমনকি প্লাস্টিক সার্জারি করেও ঠিক হল না। এখন কেউ বিশ্বাস করবে না, এই মুখই এক সময় কতো বুক ভেঙেছে। অন্তত নীলিদের পাড়ায় অতো সুন্দরী মেয়ে আর হুটো ছিল না। মানুষের মন কী বিচিত্র! নীলি তো তেমন সুন্দরী নয় তবু সমীর তারই প্রেমে পড়ে গেল, আর মোমের ক্ষেত্রে হল মোমকে ব্যবহার করার প্রবণতা। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু মহেন্দ্রদা সম্পর্কে, তার নিজের কাজের অপারেশন সম্পর্কে এতো কথা বলা, সেটা ভয়ঙ্কর ভুল হয়ে গেল। এত বড় ভুল, যা জীবনেও শোধরানো যাবে না। এখনও হুঃস্বপ্নের মত মনে পড়ে যায় কানা খোকনের মুখটা, যখন সে শার্টের হাতা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, "লাশ ফেলা হয়ে গেছে···" অন্ধকারেই থরথর করে কাঁপতে লেগেছিল সমীর। সেই মুহূর্ত থেকে তার কী যে হল, স্পষ্ট দেখত, মোম তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, বড় বড় চোখ হুটো মেলে। একেক সময়, এমন হতো, শুধু ওই চোখ হুটো দেখতো, ভাসমান, যেন তাকে তাড়া করছে···। পরে যখন শুনল, মোম মরেনি, সে-ই প্রথম হাসপাতালে ছুটেছিল। মোমের দাদার হাত ধরে বলেছিল, "আপনি ভাববেন না, আমি ঠিক খোঁজ নেবো, কে বোমা ছুঁড়েছে। বোমা জিনিসটা খুব হয়েছে না, আজকাল! আমি ঠিক প্রতিশোধ নেব···আমি···।" এর কিছুদিনের মধ্যে বুলু অ্যারেস্টেড হল অ্যাটেমটেড মারডারের চার্জে। আর মোমের প্লাস্টিক সার্জারি বাবদ সাতাশ হাজার টাকা সমীরের খরচ হয়েছিল।

একটু দূরে একটা শেডের নিচে নীলিমা দাঁড়িয়ে আছে। মাথাটা

পেছন দিকে সামান্য ছুঁড়ে দিয়েছে সে, চুল বিনুনি করে বাঁধা, গায়ে গাঢ় বেগুনি নাইলনের শাড়ি। থুতনিটা সামান্য তুলে সে এক দৃষ্টে একটা মালবোঝাই ম্যাটাডোর ভ্যানের দিকে তাকিয়ে আছে। সমীর ধীরে ধীরে তার পেছনে এসে দাঁড়াল। "কী দেখছো ?" মৃদু গলায় জিগ্যেস করল সে। "হুঁ" বলে নীলিমা ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল। চমকে ওঠেনি। আসলে সে অনেক আগেই দূর থেকে সমীরকে আসতে দেখেছে। চোখ ফিরিয়ে নীলিমা আবার উদাস দৃষ্টিতে ম্যাটাডোর ভ্যান থেকে একে একে মালগুলো নামানোর দৃশ্য দেখতে লাগল। আজকাল প্রায়ই সমীর বাইরে তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে। আগে ময়দানে বা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে, বা রাস্তা-ঘাটে, বাসস্ট্যাণ্ডে দেখা করত দুপুর রোদ অথবা বৃষ্টিতে, কি ব্যাকুলতা, কী চাঞ্চল্য নিয়ে দেখা হতো, কথা ফুরোতো না : এখন কোন না কোন দামী রেস্তোরাঁর কাছাকাছি মাঝেসাঝে তার সঙ্গে লাঞ্চ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে সমীর। কাঁটা-চামচ দিয়ে তারা প্রায় নীরবে লাঞ্চ খায়, নিজের ব্যাপার নিয়ে এত ব্যাপৃত থাকে যে, তার সঙ্গে সমীর ভাল করে কথা পর্যন্ত বলে না। সমীর কি তাকে ভালবাসে ? নাকি শুধুই কর্তব্য করে তার প্রতি ? কেন দেখা করে যদি কথাই বলবে না ? আবার একেকদিন, মেঘ কেটে গিয়ে ঝকমকে রোদ্দুর ওঠার মত নীলিমার দ্বিধা সরে যায়, যখন মুহূর্তের জন্য হলেও সমীরের ঠোঁটে সেই পুরনো স্নেহমিশ্রিত আবেগের হাসি দেখতে পায়, চোখে সেই নেশা নেশা ঈষৎ লালচে দৃষ্টি নিয়ে সে তার নীলির দিকে তাকায়। তখন নীলিমার মন বলে সমীরের পৃথিবী আজ আলাদা হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু মনে মনে সে ঠিকই জানে এই এত মানুষের মধ্যে একমাত্র নীলিমাই তাকে সত্যি ভালবাসে—তার দোষ, ত্রুটি, অপমান সব কিছু নিয়ে তাকে সর্বান্তঃকরণে একমাত্র নীলিমাই গ্রহণ করবে। হয়ত কর্তব্যের খাতিরে নয়, সেই গভীর নিরাপত্তাবোধের কারণেই সমীর তাকে ছেড়ে যায়নি এই দীর্ঘ আট বছর। নীলিমা সামনের রাস্তার থেকে চোখ সরাচ্ছে

না। তাকিয়েই আছে। আট-দশতলা উঁচু বাড়ির সামনে একটা লরি আর একটা ম্যাটাডোর ভ্যান। একে একে সংসারের কতো চিহ্ন, প্রয়োজনীয় সামগ্রী, টুকিটাকি জিনিস নামানো হচ্ছে : ড্রেসিং টেবিল, ল্যাম্প শেড, স্টিলের আলমারি, বই-এর র‍্যাক, আরও কতো কি ; যাঁরা এখানে থাকবেন, মোটামুটি সচ্ছল বলেই মনে হচ্ছে, জিনিসপত্র দেখে। কেমন হবে এদের সংসার কে জানে! মায়া তো আছেই, প্রেম থাকবে কি? স্নেহ, মমতা? তাকিয়ে থাকতে থাকতে নানান কার্যকারণহীন কল্পনা নীলিমার মাথায় খেলে যায়। তখন সে ফিরে যায় পুতুলখেলা বালিকা বয়েসে। নীলিমার পেছনে দাঁড়িয়ে সমীরও মাথাটা পেছন দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হাই রাইজ বাড়িটার ওপরের দিকটা লক্ষ্য করল। নতুন কনস্ট্রাকশন। ক্রেতাদের থেকে মোটা অ্যাডভান্স নিয়ে শুরু করেছে. যেমন তেমন করে শেষ করেছে পাইপ লাইনগুলো। সমীর এক চোখ বন্ধ করে. অন্য ভুরুটা তুলে একটা সিগারেট ধরাল। কনস্ট্রাকশনের ব্যবসা এখন দারুণ প্রফিটেবল। সোর্স থাকলেই হল। এবার আস্তে আস্তে রিয়েল এস্টেটের দিকে সরে গেলে কেমন হয়। ভাবতে হবে। মহেন্দ্রদাকে ইনভল্‌ভ করে ফেলতে পারলেই হল।

সে সিগারেটটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে আঙুল তুলে বলল, "বিল্ডিংটার ওপর দিকটা নোটিস করেছো নীলি, একটু যেন হেলে পড়েছে না? লোকগুলো বোকার মতো টাকা ঢেলেছে। এখানে ফ্ল্যাট কেনার কোনও মানেই হয় না।"

"কেন?"

"যে কোনও মুহূর্তে বাড়িটা ধসে পড়তে পারে. যেমন স্ট্রাকচার ·"

নীলিমা বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু যেমনই হোক, নিজের বাড়ি· তুমি এটা বোঝো না. না?"

"না।"

"একটা বয়েসের পর নিজের বাড়িতে মরেও সুখ।" বলল

নীলিমা। সমীর হাসতে লাগল। নীলিমা একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল তাতে। আজকাল কেমন যেন একটা জড়তা এসে গেছে, সমীর হাসলেই তার মনে হয়, তাকে নিয়ে হাসছে, ঠাট্টা করছে। অবশ্য গভীর অবচেতন দিয়ে সে ঠিকই জানে, এই হাসি হয়তো নিষ্ঠুরতার লক্ষণ নয়। তবু ভয়, তবু সন্দেহ।

সে ঘাড় ঘুরিয়ে থুতনি সামান্য তুলে বাঁকা চোখে সমীরের দিকে তাকিয়ে বলল, "হাসছো যে?"

"হাসবো না! তুমি কেমন থুথুরি মত, কথা বলছ, যেন না কতো বয়স হয়ে গেছে।"

নীলিমা দুঃখিতভাবে বলল, "হবে তো, একদিন···।"

সমীর একটু চুপ করে থেকে বলল, "নীলি, তুমি চিরকাল ভাড়া বাড়িতেই···। কোনোদিন নিজের বাড়িতে থাকোনি, না?"

নীলিমা বিষণ্ণভাবে বলল, "না···।"

সমীর নীলিমার হাতটা নিজের হাতে নিল, হাতের পাতায় যেখানে রেখাগুলো কাটাকুটি করেছে, সেখানে আলতো করে চুমু খেল। নীলিমার গালে একটা লালচে আভা ফুটে উঠল। সে চোখ নামিয়ে নিল। বৃষ্টিতে ধোঁয়া-ধোঁয়া, ঝাপসা হয়ে রইল সামনের রাস্তাটা।

বুলু অন্ধকারে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, একা সঙ্গী শুধু এক ফাঁকা আর্তি আর নাম না জানা ভীতি! তার চিন্তার রাজ্য হিসেবে অন্ধকার ঘরটা পড়ে আছে। সে, তার ভাবনা, অনিশ্চয়তা আর ভয়গুলো ছাড়া আসলে আর কিছু নেই। খাট, আয়না, আলনা এগুলো মিথ্যে, ফাঁকা কতগুলো আকার। অন্ধকার ঘরের এই শূন্যতায় যা ইচ্ছে ভাবার বা করার স্বাধীনতা আছে। যেমন সে মনে মনে মোমের বিকৃতি দূর করে আগের মুখখানা দেখতে পারে, স্বীকার করতে পারে সে সমীরকে ঘেন্না করে, কাউকেই আসলে ভালবাসে না, থুথু ফেলতে পারে, নিজেকে ভ্যাংচাতে পারে, নাচতে পারে, যাচ্ছেতাই গালা-গালি দিতে পারে, নেঙাতে পারে, কেউ

জানবে না, কেউ শুনবে না। ওদের পৃথিবী থেকে সে ছিন্ন। বিচ্ছিন্ন, নগ্ন, একা, হাতে আছে সময়। প্রত্যেকটা মুহূর্ত পাথরের মতো ভারি হয়ে তার ওপর এমনভাবে চেপে বসেছে, যে সে হাঁপাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে এই সময়ের ভারেই ডুবে যাবে অতলে। মরুভূমি, সমুদ্র, ঢেউ-এর পর ঢেউ। মাংস কোপানো ভোজালির মত সময় কোপ মারছে। শূন্যতায়। সে তার হাতের মুঠো আলগা করল। একটা ছোট্ট চিরকুট ধরা আছে সেখানে। মোম পাঠিয়েছে। তাদের সেই পুরনো বুড়ো রিকশওয়ালাকে দিয়ে। মোম তার সঙ্গে দেখা করবে, গভীর রাতে, এত বড়ো ঝুঁকি সে তার জন্য নেবে! তবু কেন বুলুর বুকের ভার গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে, কে জানে? বুলু জানালার সামনে এসে কয়েদীর কত গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু আগেই লোড-শেডিং হয়ে গেছে, গোটা পাড়াটা এখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আলোগুলো নিভে যাওয়া মাত্র পাতাল থেকে উঠে আসা ধোঁয়ার মত মানুষের কলস্বর কানে আসতে শুরু করছে। বাচ্চারা পড়তে পড়তে ছাদে, বারান্দায়, রাস্তার ধারে উঠে এসেছে, মহিলারা টিভি দেখা থামিয়ে মোমবাতি বা কুপির জন্য ব্যস্ত হয়ে হাঁকাহাঁকি করছেন। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে যদি বা দু-একজন বাড়ি বা ক্লাব ঘরের আড়ালে ছিল, লুঙ্গি বা পাজামার ওপর শার্ট চাপিয়ে রকে এসে বসেছে। একটু আগে নীলিমা এসে বুলুকে মোমবাতি দিয়ে গেছে। আবছা অন্ধকারেও নীলিমার চোখের কৌতুহল সারা গা দিয়ে সে অনুভব করেছে, যদিও, তার চোখের দিকে সে তাকায়নি, তাকাতে পারেনি। কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও সমীরের আতিথ্য নেয়ার অপমান বুলুকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। জ্বলন্ত সিগারেট জুতো দিয়ে পিশে ফেলার মত্ত করে, নিজের অস্তিত্বটাও থ্যাঁতলাতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু তার আগে, তার নিজের সরে যাওয়ার আগে, ওদের প্রত্যেককে কুকুরের মত মরতে দেখার সাধ জ্বলছে তার মধ্যে। সমীর মহেন্দ্রদা, অন্তুদা, সন্তুদা···অন্ধকারেও বুলুর চোখ দুটো ধিকিধিক জ্বলছে।

তার শরীরে যেন রক্ত, শিরা, উপশিরা কিছু নেই, শুধু ঘৃণা বয়ে চলেছে বিষের মত। মাঝে মাঝে নিজেই বুঝতে পারছে, তার চোখ মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। চোয়ালের কাছে লেগে আছে শয়তানের হাসি। একসময় বুলু টেবিলের কাছে সরে এসে দেশলাই দিয়ে নীলিমার রেখে যাওয়া মোমবাতিটা ধরিয়ে ফেলল। দেওয়ালে লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে। ছায়াগুলো কাঁপছে। ঘড়ির টিকটিক শব্দ কানে বাজছে সাবধান বাণীর মত। বুলু একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে গভীরভাবে টান দিল। আরেকটু পরেই মোমের সঙ্গে তার দেখা হবে। এত বছর পর···অবশ্য বলা যায় না, ফাঁদও হতে পারে এটা। তবে, চিরকুটের ভাষা এবং হাতের লেখা মোমেরই। অনেক কাল আগে, তাদের মধ্যে যখন চিঠি চালাচালি হতো, কী অধীরভাবে এই হাতের লেখার জন্য সে অপেক্ষা করেছে। আজ সব কিছু কতো অন্যরকম। সেই একই হাতের লেখা, তার মধ্যে সন্দেহ, দ্বিধা, শঙ্কার ভাব জাগাচ্ছে। সে জানে না কে বা কারা মোমের গায়ে বোমা আর অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়েছিল, যদিও একটা আবছা সন্দেহ সুতোর মত ঘুরে ঘুরে তার মধ্যে পাক খায়। এই পৃথিবীতে কাউকেই কি সে বিশ্বাস করে না? সেদিন আলবামা হোটেলে সমীর তাকে বলেছিল, "তুই আমায় বললি না কেন, অন্তুদাদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছিল...." স্পষ্টতই সমীরের সঙ্গে মোমের বাড়ির লোকের ঘনিষ্ঠতা আছে। এমনও হতে পারে, সমীর টাকার জোর খাটিয়েছে। হয়ত মোমের বাড়ির লোককে এমন জায়গায় ফেলে দিয়েছে যে তারা 'না' বলতে পারবে না তার কথায়। হয়ত মোম নিজেও এখন বিশ্বাস করে ফেলেছে যে বুলুই তাকে মারতে চেয়েছিল। পাঁচ বছর বুলুকে না দেখে মোম আর স্বাভাবিক মেয়ে নেই, এটা সে আন্দাজ করেছে। নয়তো কেউ তার সামনে মোমের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে না কেন? শুধুই কি তাকে আঘাত দেবার ভয়ে? নাকি পুরনো অনুষঙ্গগুলোকে তারাও ভয় পায়? দাদু মারা যাওয়ায় যে মোম মৃত্যুকে এত গভীরভাবে অনুভব করেছিল যে মোম রাস্তার

একটা কুকুরকে কেউ ঢিল ছুঁড়লেও ছুটে এসে প্রাণীটাকে আগলাতো, সেই পবিত্র, সুন্দর মেয়েটির মনে কি কোনও প্রতি-ক্রিয়াই হল না সেদিন, যখন তাকে নৃশংসভাবে মারল। সে আবার জানালার কাছে ফিরে গেল। বন্দী জানোয়ারের মত ছটফট করছে সে, প্রশ্নের তাড়নায়। কে বা কারা মোমকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিল? তাকেই বা এভাবে দায়ী করা হল কেন? যেখানে স্পষ্টতই সে দোষী হতে পারে না, যেহেতু সে মোমকে ভালবাসে, এবং দুর্ঘটনার মুহূর্তে সে মোমের পাশাপাশি হাঁটছিল। সে জানালার গরাদে কপাল ঠেকাল। আস্তে আস্তে তার মাথার ভেতরের গভীর কুয়াশা যেন মুছে যাচ্ছে। স্মৃতি ফিরে আসছে। কোনও রহস্যময়, অদৃশ্য হাত যেন আস্তে আস্তে মাথার সিঁধগুলো আলগা করছে। মা হয়ত বলত এটা গুরুদেবের অবদান। গুরুদেব কেমন সে জানে না, তাঁকে মনে মনে বিচারও করতে চায় না, যেহেতু এই মুহূর্তে কাউকেই বিচার করাব প্রবণতা হচ্ছে না। অপমান আর যন্ত্রণার দিনগুলোর মধ্যে দিয়ে ক্রমশ নিজের নিঃসঙ্গতাকেই সে ভালবাসতে শিখেছে। আর সে বাইরের জগতের সাহায্য খোঁজে না, কারও বুকের তাপ বা হার্তের পাতার উষ্ণতা হাতড়ায় না। কেউ দরজায় কড়া নাড়লে সাড়া দিতে অনীহা বোধ কবে। তবু এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে, এই মানসিকতাই সব নয়, ঠিক মত তাকে ডাকেনি কেউ, একদিন নিশ্চয়ই ডাকবে। তার রক্তের গভীরে স্বর্গের টান, অজানার টান অনুভব করছে। যদিও এই টানের সূত্রপাত সে জানে না। হয়ত নাড়ি থেকে, নাভি থেকেই এর আরম্ভ। যা কিছু শুরু হয়েছিল এই বুকেব ধকধকানি, এই শরীরের চাহিদা ও মনের জ্বালা, নাড়ি থেকেই তো তার সূত্রপাত। নাড়িটা ছিন্ন করে, পাছায় একটা চাপড় মারল, ব্যস, টুপ করে এসে পড়া গেল পৃথিবীতে ভাসমান, হাল ছাড়া একটা নৌকো যেন। সর্বত্র যেন চোখ গজাতে লাগল: বগলে, দু-ঠোঁটের ফাঁকে, পায়ের তলায়, যা সুদূর তা কাছে এল যা কাছের তা দূরে চলে গেল।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল বুলু নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গরাদে কপাল ঠেকিয়ে। দুপাশের গরাদ দুটো শক্ত করে আঁকড়ে সে মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল। এখন স্পষ্ট ভাসছে সেই দৃশ্যটা, সে আর মোম বেলেঘাটা লেকের ধার দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে, অন্ধকার হয়ে এসেছে, দূর থেকে কেউ লক্ষ্য করলে শুধু তাদের কালচে অবয়ব দুটিই দেখতে পাবে। হাওয়ায় মোমের আঁচল যেন উতলা হয়ে উড়ছে, বুলুর দু-আঙুলের ফাঁকে আলতো করে ধরা একটা জ্বলন্ত সিগারেট। মোম তাকে মহেন্দ্রর সম্পর্কে কী যেন বলছিল। সমীর মোমকে মিটকোতে চাকরি দিতে চায়, খুব দরকার থাকা সত্ত্বেও মোম সে চাকরি নেবে না, এ সব ব্যাপারে কথাবার্তা হচ্ছিল মনে আছে। তারা যখন একটা চক্কর দিয়ে দ্বিতীয়বার জলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বুলু হঠাৎ কানা খোকনকে দেখতে পেল। আবছা অন্ধকারে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। পার্টির ফুট ফরমাশ খাটার সময় থেকেই কানা খোকনের অ্যাকটিভিটি সে জানত। কম খরচে যে কোনও কাজ হাসিল করার লোক। মোমকে নিয়ে নির্জন জায়গায় হাঁটছে, একটু নার্ভাস লাগলেও গা ছমছম করা বা ভয় করা, এ সব প্রতিক্রিয়া হয়নি।

কারণ, সে কল্পনাও করেনি তার বা মোমের কোন শত্রু আছে। কী ঘটতে চলেছে, কিছুই সন্দেহ করেনি, সন্দেহ যা'র প্রশ্ন বা সম্ভাবনাও ছিল না। যদি থাকত, নিশ্চয়ই ওভাবে ঘোরাফেরা করত না, মোমকে নিয়ে তক্ষুনি ফিরে যেত। কানা খোকনকে দেখে সে বড় জোর ভেবেছে, মোমের ওপর চোখ আছে দামড়াটার। তারা ঘাসের ওপর বসতে যাবে, এই সময় ঘটনাটা ঘটল। বীভৎস শব্দ তাদের ঝাঁকিয়ে দিল। সে ছিটকে পড়ে গেল। মোমের কান ফাটা চিৎকার কানে এল। কোথা থেকে কতগুলো ছায়ামূর্তি বুলুকে হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল, তারপর 'ধর ধর' বলে মারতে লাগল। তারপর লক-আপ, কোর্ট, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। প্রায় পাঁচ বছর সে মোমের থেকে বিচ্ছিন্ন। আবছাভাবে শুনেছে,

মোম বেঁচে আছে, যদিও সেই সুন্দর নিটোল মুখখানা নাকি নেই…।

নিজের দুঃসহ মুহূর্তগুলো থেকে হাতড়ে বের করা একটা মালার মত মোমের টুকরো টুকরো স্মৃতি সে জড়ো করেছিল, কি করে ধীরে তা হারিয়েও গিয়েছিল খেয়াল নেই। অন্তরে বাইরে মুহুর্মুহুঃ সে বদলাচ্ছে, ছাল খসিয়ে নতুন চামড়া গজাবার মত ··

॥ ২১ ॥

বুলু চোখ মেলে বাইবের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। সেখানে, আকাশের গায়ে গায়ে হাওয়ায়, অস্পষ্ট অন্ধকারে মোমকে দেখতে পেল সে, যেমনভাবে আগে, কখনও দেখেনি, অনেককাল আগে, মোমের দাদুব মৃত্যুব সময় মোমেব শারীরিক সৌন্দর্য তাদেব মধ্যে একটা ব্যবধান তৈবি কবেছিল। মোমেব রূপেব প্রতি কামার্ত হয়ে সে ভুলে গিয়েছিল তার দুঃখে দুঃখ পেতে, তাব সঙ্গে একাত্ম হয়ে অনুভব করতে। আজ কোনও শারীবিক চাঞ্চল্য তাকে উস্কোচ্ছে না। কোনও উত্তেজনা অন্ধ করে দিচ্ছে না অন্তর্দৃষ্টি। অনেক তুচ্ছ ঘটনা পেরিয়ে প্রকৃত সত্যকে সে যেন ধীরে ধীরে অনুভব করতে পারছে।

মোমের অদৃশ্য উপস্থিতির স্থির, শীতল, আরামদায়ক প্রশান্তি গভীর স্থৈর্যেব মত তার মধ্যে নেমে আসছে। এই শান্তি চাদরের মত জড়িয়ে আসছে তার গায়ে। সমীরের সঙ্গে, মাহেন্দ্রদার সঙ্গে, টুলু বা অন্তুদা, সন্তুদার সঙ্গে যে সব ফয়সালার তাব বাকি ছিল, তার প্রয়োজন যেন বোধ করছে না আর। না, কোনও ক্লান্তি বা অবসাদ এর পেছনে কাজ করছে না, জটিলতার মুখোমুখি হওয়ার ভীতি বা এমনকি অনীহাও নয। এ এক অন্য অনুভূতি। তার দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু জেনেছে তার থেকে এ যেন ভিন্ন। এই প্রশান্তি ও স্থৈর্যের কথা মোমকে বলতে ইচ্ছে হল তার; বলতে

ইচ্ছে হল, "আমার বুকের মধ্যে কী যেন হচ্ছে। অথচ আমি নিজেই বুঝতে পারছি না !"

তার মনে হল, মোম যেন অনেক দূর থেকে উত্তর দিচ্ছে, "পারছ না? আমার তো তা মনে হয় না। তুমিই তো বোঝ। আসলে হয়ত আমরা দুজনে একই জিনিস খুঁজছিলাম।"

"কী ?"

"এই যে, এই বোঝার ক্ষমতাটা ··"

বুলু জানালা থেকে সরে এল। বুকের মধ্যে যে প্রশান্তি এতক্ষণ অনুভব করছিল, তা এত তীব্র হয়ে উঠল যে প্রায় ভয় ঝরতে থাকল তার।

গায়ে একটা জামা চাপিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল মোমবাতি।

অন্ধকারে হাঁটতে লাগল। ঝড়ো হাওয়া দিচ্ছে। এদিক ওদিক মাথা ঝাঁকাচ্ছে গাছগুলো। অথচ আকাশ পরিষ্কার। লক্ষ লক্ষ তারা দেখা যাচ্ছে সেখানে। সে মাথাটা পেছন দিকে ছুঁড়ে দিল। বহুকাল এত অসংখ্য তারা চোখে পড়েনি। কলকাতার ধোঁয়া আর ধুলো ভেদ করেও বুক ভরে আকাশ দেখা যায় তাহলে।

সে ধীরে এগতে লাগল। অনেকক্ষণ হল অন্ধকার হয়ে গেছে তবু মোমের আসতে আরও অনেক দেরি। মধ্যরাতের পরে সে আসবে ইংরেজী মতে যাকে বলে নতুন দিনের প্রাক্কালে। এই এতক্ষণ সময় বুলু কীভাবে কাটায়? হাঁটতে সে পারে ঠিকই, কিন্তু তাকে ঠিক করতে হবে সে কোথায় যেতে চায়। একটা উদ্দেশ্য তো থাকা চাই। নিজের মধ্যেই নানান রকম প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে। সে কোথায় চলেছে? সে কী করতে চায়? সে কি চাকরি চায়? সে কি নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়? সে কি বিশ্রাম চায়? ছুটি?

সে দূরের দিকে তাকাল। রাস্তার শিরা-উপশিরাগুলো নানান দিকে চলে গেছে। পথ ছাড়া পৃথিবীটা কেমন জায়গা হত? দিগ্বিদিক

হীন সাগর। জঙ্গল। কারণ রাস্তা মানে দিক নির্ণয় ক্ষমতা, যোগাযোগ ক্ষমতা। কেমন ছিল মানুষের তৈরি প্রথম রাস্তা? মনে মনে কল্পনা করে বুলু। নিশ্চয়ই বিপুল এক কীর্তি হিসেবে মানুষের সামনে দেখা দিয়েছিল। তারপর ক্রমশ তৈরি হল দ্বিতীয়, তৃতীয়-চতুর্থ, বহু পথ···যা ক্রমশ লক্ষ লক্ষ রাস্তায় পরিণত হল, মাঝখানে মানুষ, সকল পথের স্রষ্টা, মাছির মত নিজের জটে নিজেই দ্বিধান্বিত। হাঁটতে হাঁটতে বুলু একটা বাঁক নিল। যে রাস্তাটা সে বেছে নিয়েছে, সেটা বেশ নির্জন; যদিও, এমনকি এখানেও কিছু কিছু নতুন মুখের দেখা পাওয়া যেতে পারে। এই পথ দিয়ে সোজা এগলে নদীতে পৌছনো যায়, হয়ত বা এখানে ছিনিয়ে নেওয়ার মত কিছু নেই, জমিয়ে রাখার কিছু নেই, শুধু ফাঁকা প্রান্তর, যা হৃদয়কেও উন্মুক্ত করে। নিসর্গটা চোখের সামনে দিয়ে সবে সরে যায় না, বরং হৃদয়ের খোলা জমিতে আস্তানা গাড়ে। সে আগের চেয়ে একটু জোরে পা চালাতে লাগল। হাওয়ায় চুল উড়ে যাচ্ছে। সারা শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডা হাওয়ায়। এগতে গিয়ে তার মনে হচ্ছে, অনেক কিছু সে ফেলে এসেছে, আরও অনেক কিছু আসবে তার সামনে, অনেকের সঙ্গে দেখা হবে, অনেকের সঙ্গে হবে না, অধিকাংশ হিসেবেই অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে···। সে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিল। এখন শুধু যে প্রকৃতি উপভোগ করছে তাই নয়, সে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়ার এক বিশাল উৎসবে অংশগ্রহণ করছে: ধুলোর মত উড়ে যাচ্ছে লোভ, ঈর্ষা, ঔদ্ধত্য, চালাকি, মিথ্যাচরণ, স্বার্থপরতা আরও কত কি···। চলতে চলতে সে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকাল। সে জানে, সে যে রাস্তা বেছে নিয়েছে, সেটাই সঠিক পথ।
